কবির একথাটি একটু অনুধাবন করিয়া বুঝা উচিত ছিল। বিলাতী অস্ত্র অস্মদ্দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে না। আর যেখানে তাহা থাকে, তখন তাহা তৎ দেহকে দুর্ব্বল করিতেই থাকে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, কীর্ত্তনাদি বাউল সঙ্গীত শাস্ত্র-ছাড়া ব্যাপার নহে। তৎসমুদয়ই সংকীর্ণ রাগিণীরই অন্তর্ভূত এবং তাহার তাল তত্বও তন্নিয়মে নিয়মিত।

ভারতীয় সঙ্গীত সুস্বরানুক্রমণ প্রধান (melody) প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, স্বরানুক্রমণের পুষ্টি সাধনজন্য স্বরসংগতি (Harmony) ব্যবহার হইয়া থাকে; ভারতে কিন্তু এই স্বরানুক্রমণের পুষ্টিসাধনরূপে বিবাদী (Dissonent) স্বর বর্জ্জন করিয়া বাদী, সমবাদী অনুবাদী স্বরসমূহের ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন বেহাগ উপরাগে ঋষভ ও ধৈবত বিবাদীবর্জ্জন করিয়া গান্ধার বাদী, নিষাদ গ্রহ এবং বক্রী সমুদায়গুলি অনুবাদী স্বরূপে ব্যবহার নিবন্ধনই রাগটির সুস্বরানুক্রমনটি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যজগতের স্বর সংগতিজনিত পুষ্টিসাধন বিধিটি যদি ভারতের সুস্বরানু-ক্রমিকপ্রধান সঙ্গীতের স্বরূপ বিনাশ করে, তাহা হইলে সরল ভাষায় বলিতে হইবে, তৎবিজাতীয় স্বর সঙ্গীত প্রথাবলম্বনে ভারতীয় সংগীতের পুষ্টিসাধন প্রয়াস পুত্রকামনায় পতির মস্তক চর্ব্বণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এবম্বিধ সংস্কারসাধনে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না, বরং আত্মবিলোপই ঘটিয়া থাকে। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, ভোগায়াতন শরীর ছিন্নভিন্ন করিলে যদি মুক্তি করতলগত হইত, তাহা হইলে শৃগালেরাও দেহপাতে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই বলিতেছি, রবীন্দ্রবাবু কথিত সংস্কার সঙ্গীতের মুক্তি নহে তাহার মহানির্ব্বাণ প্রাপ্তি। Stangways সাহেবও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন। And the first thing that harmony would do, if now applied even tentatively would be to get rid of that feeling and those functions and with them of the grace notes and all that makes Rag worth having * * * To add harmony to it is to kill it. *

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি।

---

* সঙ্গীত-পরিষদের সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী যাদুমণি দাসী ও গুণী মার্দ্দঙ্গী শ্রীযুত রামব্রহ্ম শর্ম্মার সাহায্য ব্যতীত আমি এ প্রবন্ধ বুঝাইতে ও গুছাইয়া লিখিতে পারিতাম না, এজন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ।

লেখক।

গান

তোমায় আমায় হবে দেখা-শোনা,
এ কথা অন্যে যে মানা।
শুধু তুমি আমি দুজন রব
আর সেথা কেউ রবে না—
হবে দেখা-শোনা!
লাজের আঁচল খুলে দিয়ে মোর,
এ যৌবন-ফুল মধু পিয়ে,
হবে তুমি ভোর,
তোমার আমার মিলন হ'লে,
মিট্‌বে বাসনা—
হবে দেখা শোনা!
ভোমরা রে মোর ভোমরা,
হৃদ্-কমলের পাপড়ি মাঝে—
রবে তুমি ধরা,
তোমায় আমায় মিলে যাব—
চেনা যাবে না,—
আর তফাৎ হবে না—
আর সবারে ফেলে দিয়ে,
কর্‌ব তোমার সাধনা—
কবে হবে দেখা-শোনা!

শ্রীঃ—

নারায়ণ

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩২৪ সাল।

ধর্ম্মতত্ত্ব-মীমাংসা

বেদে বৈতানিক অগ্নির উল্লেখ আছে। সে সমস্ত কর্ম্ম বৈতানিক অগ্নিতে সম্পাদন করা হয়, তাহা শ্রৌত ও যে সমস্ত কর্ম্ম লৌকিক অগ্নিতে সম্পাদন করা হয়, তাহাকে স্মার্ত্ত কর্ম্ম বলা হয়। যথা চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি।

এই সমস্ত কর্ম্মের পুরাতন সংজ্ঞা গৃহ্যকর্ম্ম। যে সমস্ত সূত্রে এই সমস্ত কর্ম্মের বিধান লিখিত আছে, তাহাকে গৃহ্যসূত্র বলা হয়। বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত ধর্ম্ম স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম নামে অভিহিত, তাহার অল্প অংশ এই সমস্ত সূত্র হইতে সংগৃহীত এবং অধিকাংশ পরে পরে সংগৃহীত। সূত্রোক্ত স্মার্ত্ত কর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান স্মার্ত্তধর্ম্মের স্বল্প সম্বন্ধ। এই শ্রৌত সময়ের পরেই স্মৃতি সকলের সময়। কিন্তু বর্ত্তমান স্মার্ত্তধর্ম্মে এই স্মৃতি সকলের অধিক সংস্রব নাই। ইহাতে যে অনেক নির্ম্মূল ও মনঃকল্পিত বিষয় মিশ্রিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

স্মৃতি সকলকে স্মার্ত্তধর্ম্মের আধার বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু স্মার্ত্তধর্ম্মের সংগ্রহ গ্রন্থ সমুদয়ে যে সমস্ত প্রমাণ বচন উল্লিখিত হয়, তাহা মূল স্মৃতি সংহিতাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার নিদর্শন আমরা পরে দিব। প্রথমে মূল সংহিতা সকলের সম্বন্ধেই আলোচনা করা হউক।

স্মৃতিশাস্ত্রের মীমাংসার একটী পরিভাষা আছে—

মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে

অর্থ—মনুস্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি হইবে, তাহা অপ্রমাণ এবং সমস্ত স্মৃতি

সংহিতাতে মনুর আদর করা হইয়াছে। কোনও অর্থকে বিশেষ রূপে প্রমাণিত করিতে গিয়া সকল স্মৃতিকারই বলিয়া থাকেন, "ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ"—এই কথা মনু বলিয়াছেন। এতদ্বারা নিশ্চয় অনুমান হয় যে, মনুস্মৃতি সমস্ত স্মৃতিমণ্ডলের চূড়ামণি। মনুস্মৃতির আলোচনা হইলেই সমস্ত স্মৃতির আলোচনা হইতে পারে।

বর্ত্তমানে প্রচলিত মনুস্মৃতি সেই বাস্তবিক প্রাচীন মনুস্মৃতি কিংবা অর্ব্বাচীন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত মনুসংহিতা এই একটি সংশয়ের বিষয়। এইরূপ সংশয়ের কারণও আছে। বর্ত্তমান মনুস্মৃতির মেধাতিথি ভট্টের টীকায় একটি শ্লোক পাওয়া যায়।

মান্যা কাপি মনুস্মৃতিস্তদুচিতা টীকাহি মেধাতিথেঃ
সা লুপ্তৈব বিধেবর্শাৎ ক্বচিদপি প্রাপ্তং ন যৎ পুস্তকং
ক্ষৌণীন্দ্রো মদনঃ সহারণসুতো দেশান্তরোদাহৃতৈঃ
জীর্ণোদ্ধার মচীকরৎ তত ইতঃ তৎ পুস্তকৈর্লেখিতৈঃ।

মনুঃ অঃ ৩ শ্লোঃ ২৮৬

অর্থ—মান্যা কোন একটি মনুস্মৃতি ছিল ও তাহারই উচিত মেধাতিথির যে টীকা ছিল, তাহা বিধিবশে লুপ্ত হইয়া যায়। এমন কি, যে পুস্তক কোথাও প্রাপ্ত হয় নাই। তখন সাহারণের পুত্র মদনরাজা দেশ বিদেশ হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ও এদিক সেদিক হইতে লিখিত বচনের সংগ্রহ করিয়া মনুস্মৃতির জীর্ণোদ্ধার করিলেন।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, বর্ত্তমান মনুস্মৃতি প্রাচীন মনুস্মৃতি নহে। ইহা মদন রাজা কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ সংগৃহীত একটি সংগ্রহ মাত্র। মনুস্মৃতি সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ে এরূপ একটি অন্ধবিশ্বাস জটিল হইয়া রহিয়াছে যে, মনুস্মৃতি সম্বন্ধে ওষ্ঠস্পন্দন করিলেই চতুর্দ্দিক হইতে সমাজ খড়্গহস্ত হয়। কিন্তু সত্যের অপলাপ করাও মহাপাপ, তজ্জন্য এই আলোচনা করা হইতেছে।

বর্ত্তমান মনুস্মৃতি যে অর্ব্বাচীন তৎসম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্মরন্তি চ

ব্রহ্মসূত্র অঃ ১ পাঃ ১ সূঃ ১৪

শঙ্করভাষ্য—

অপিচ মনুব্যাস প্রভৃতয়ঃ শিষ্টাঃ সংযমনে পুরে যমা-
য়ত্তং কপুয়কর্ম্ম—বিপাকং স্মরন্তি নাচিকেতোপাখ্যানাদিষু।

অর্থ—মনু ও ব্যাস আদি শিষ্টজন সংযমনপুরে যমের আয়ত্ত পাপকর্ম্মের ফল নাচিকেত উপাখ্যানাদিতে স্মরণ করিয়াছেন। ইহাতে প্রতীত হয় যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সময়ে প্রচলিত মনুস্মৃতিতে নাচিকেতের উপাখ্যান ছিল। বর্ত্তমান মনুস্মৃতিতে নাচিকেত উপাখ্যান নাই, অতএব ইহা অর্ব্বাচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নির্ণয়সিন্ধুনির্ণয়ামৃত আদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত প্রমাণ বচন মনুস্মৃতির নাম দিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সে সমস্ত বচন বর্ত্তমান মনুস্মৃতিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন মনুস্মৃতিতে সেই সমস্ত বচন ছিল, পরে মদনরাজার সংগৃহীত বর্ত্তমান মনুস্মৃতিতে সেই বচন সংগ্রহ করা যাইতে পারিল না। অতএব বর্ত্তমান মনুস্মৃতিতে সেই সমস্ত বচন নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা মনুস্মৃতিতে অপ্রাপ্ত বচন সকলকে মনুস্মৃতির নাম দিয়া প্রমাণ-রূপে উদ্ধৃত করা ধর্ম্মজগতে একটি প্রবল প্রতারণার কার্য্য বলিতে পারা যায়। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের সংগ্রহকর্ত্তা সকলকে এই দোষে দূষিত করিতে হয়। এস্থানে মনুস্মৃতির অর্ব্বাচীনতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র-সংগ্রহকর্ত্তাগণের প্রতারকতা, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য।

এই ত গেল বর্ত্তমান মনুস্মৃতির অবস্থা। প্রাচীন মনুস্মৃতি সম্বন্ধেও বৈদিক সময়ের প্রাজ্ঞগণের কিরূপ মত ছিল, তাহাও নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের নিজকৃত ভাষ্যে এই মীমাংসা করিয়াছেন যে, মনুস্মৃতির সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ।

ইতরেষাম্ চানুপলব্ধেঃ।

ব্রহ্মসূত্র অঃ ২ পাঃ ১ সূঃ ২

শঙ্কর ভাষ্য—প্রধানাদিতরাণি যানি প্রধান
পরিনামিত্বেন স্মৃতৌ বিকল্পিতানি মহদাদিনি,
নতানি বেদে লোকে বোপলভ্যংতে ভূতেন্দ্রিয়ানি
তাবৎ লোক বেদ পসিদ্ধত্বাৎ শক্যংতে স্মর্তুং অলোক
বেদ প্রসিদ্ধত্বাৎ তুমহদাদিনাম্ ষষ্ঠস্যে বেন্দ্রিয়ার্থস্যন্
স্মৃতি রব কল্পতে।

অর্থ—প্রধান হইতে ইতর প্রধানের পরিণামরূপে যে মহাদাদি তত্ত্ব স্মৃতি শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে, তাহা বেদে ও লোকে পাওয়া যায় না। ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে স্মরণ করিতে পারা যায়, কিন্তু লোকে ও বেদে অপ্রসিদ্ধ মহাদাদি তত্ত্বের স্মৃতি কল্পনা করিতে পারা যায় না। যেরূপ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ার্থের ভিন্ন, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ নাই।

এই শঙ্কর ভাষ্যে মনুস্মৃতিতে কথিত

মহান্তমেব চাত্মানং

১ অধ্যায় ১৫ শ্লোকের উক্ত মহতত্ত্বের কল্পনাকে খণ্ডন করা হইয়াছে ও মহতত্ত্বের কল্পনাকে বেদবিরুদ্ধ বলা হইয়াছে।

এ স্থানে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, শ্রৌতমত ও স্মার্ত্তমতে প্রভেদ কি ? যে মতে চৈতন্য পুরুষ ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই মত "শ্রৌত-মত" অর্থাৎ বৈদিক মত। যে মতে জড় প্রকৃতিকে জগৎ কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই মত "স্মার্ত্তমত"। স্মার্ত্তমতের এই লক্ষণ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্যে মনুস্মৃতির প্রমাণ উদ্ধার করিয়া স্মার্ত্তমতের খণ্ডন করিয়াছেন।

স্যাদেতৎ অদৃষ্টত্বাদয়ো ধর্ম্মা সাংখ্য স্মৃতি-
কল্পিতস্য প্রধানস্যাপ্যুপপদ্যংতে রূপাদি-হীন তয়া
তস্য তৈ বড্যুপগমাৎ অপ্রতর্ক্য মবিজ্ঞেয়ং
প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ইতি হি স্মরন্তি।

অর্থ। সাংখ্যশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র কল্পিত প্রধানের ও অদৃষ্টত্ব আদি ধর্ম্ম হইতে পারে। কেন না, তাহারা (স্মার্ত্তগণ) তাহাকে (জড়-প্রকৃতিকে) রূপাদিহীন বলিয়া থাকেন। যেরূপ মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে 'যে সেই জগৎ কারণ অপ্রতর্ক্য (তর্ক করিতে পারা যায় না) অবিজ্ঞেয় (জানিতে পারা যায় না) ও সর্ব্বত প্রসুপ্তের ন্যায় ছিল'।

মনুস্মৃতির কোন কোন টীকাকার ও কয়েক জন গোঁড়া ভক্ত এই শ্লোকে অপ্র-তর্ক্য, অবিজ্ঞেয় আদি শব্দকে ব্রহ্মপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাহাদের ভাব এই যে মনু স্মৃতিতে উক্ত শ্লোকে যে জগৎ কারণের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেটি প্রধা-নের নয়, কিন্তু ব্রহ্মের। যেহেতু ব্রহ্মই অপ্রতর্ক্য ও অবিজ্ঞেয়।

কিন্তু শঙ্কর ভাষ্যের টীকাকার গোবিন্দানন্দ স্বামী এ স্থানের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় প্রধান-কেই নিরূপণ করিয়াছেন।

প্রধানম্ মহদাদি ক্রমেণ কথম্ প্রবর্ত্তত
ইতি তর্কস্য অবিষয় ইত্যাহ অপ্রতর্ক্যমিতি,
রূপাদি হীনত্বাদবিজ্ঞেয়ং, সর্ব্বতোদিক্ষু
প্রসুপ্ত মিব তিষ্ঠতি জড়ত্বাদিত্যর্থঃ।

অর্থ—প্রধান মহদাদি ক্রমে কিরূপে প্রবর্ত্ত হয়, ইহা তর্কের বিষয় নয় বলিয়া প্রধা-নকে অপ্রতর্ক্য বলা হয়। আর রূপাদি হীন বলিয়া অবিজ্ঞেয় এবম্ সর্ব্বদিকেই প্রসু-প্তের সমান স্থিত থাকে, যেহেতু জড়।

এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে মনুস্মৃতির এই বাক্যকে ব্রহ্ম পর ব্যাখ্যা না করিয়া প্রধান পর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, শঙ্করভাষ্যে যে 'অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং, প্রসুপ্তমিব, সর্ব্বতঃ' বচন উদ্ধার করা হইয়াছে, ইহা মনুস্মৃতির নহে, কিন্তু আর কোন সাংখ্যশাস্ত্রের বচন।

কিন্তু একথা একেবারে অসঙ্গত। যেহেতু এই বচনটি আর কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্মৃতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যে বেদবিরুদ্ধ, ইহা প্রাচীন কালের অনেক দর্শনশাস্ত্রেও প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ—

জৈমিনি সূত্র অঃ পাঃ সূঃ

অর্থ।—যথায় শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হয়, তথায় স্মৃতিবাক্য অনপেক্ষ অর্থাৎ অনাদরণীয় ও অপ্রমাণ।

এইরূপ মীমাংসা স্মৃতি শাস্ত্রে দেখা যায়।

জাবাল বলিতেছেন,—

'শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী'

অর্থ।—শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই বলবতী।

ব্রহ্ম সূত্র ২য় অধ্যায় ১ম পাদ ১ম সূত্র ভাষ্যে, ভগবান শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

তস্মাৎ বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্য নবকাশ প্রসঙ্গো ন দোষঃ।

অতএব বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতির অনবকাশ প্রসঙ্গ দোষ নাই। উপরি-লিখিত এই সকল প্রমাণে প্রতিপন্ন হয় যে, স্মৃতি-শাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত ও মত বেদবিরুদ্ধ।

স্মার্ত্ত-পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে স্মৃতি সকল বেদের অর্থ স্মরণ করিয়া ঋষিগণ প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব বেদের মতই স্মৃতির আদর করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, স্মৃতি-শাস্ত্রে অনেক বিষয় আছে, যাহা বেদবিরুদ্ধ। কেহই বলিতে পারেন না যে, স্মৃতি যদি বেদার্থ হয়, তবে তাহাতে বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও মত কিরূপে সংগৃহীত হইল। মূলগ্রন্থের অর্থ যদি মূলগ্রন্থ হইতে বিরুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে অর্থ না বলিয়া খণ্ডন বলা উচিত।

অনেক বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে যে বেদ ও স্মৃতির বিরোধ, তাহার সমন্বয় করিবার চেষ্টা স্মার্ত্ত-পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন। কিন্তু মূল সিদ্ধান্তে যে বিরোধ তাহা কেহ মিটাইতে পারেন না। অর্থাৎ চেতন ঈশ্বরকে জগৎ কারণ বলিয়া স্থাপন করা "শ্রৌত-সিদ্ধান্ত" ও জড়-প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলিয়া স্থাপন করা "স্মার্ত্ত-সিদ্ধান্ত"।

যখন মূলেই গুরুতর বিরোধ, তখন পত্র-পুষ্প ফলে যে বিভেদ হইবে না; তাহা কে বলিতে পারে?

পূর্ব্ব-মীমাংসার বার্ত্তিককার মনুস্মৃতির নাম উল্লেখ করিয়া তাহার বেদ বিরুদ্ধতা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

তেন যগুপি লভ্যেত স্মৃতি কাচিৎ বিরোধিনা
মন্বাছ্যুক্তা তথা প্যস্মিন্নে তদেবোপ যুজ্যতে
ত্রয়ী মার্গস্য সিদ্ধস্য যে হৃত্যং তবিরোধিনঃ
অনিরাকৃত্য তান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্ম শুদ্ধির্ন লভ্যাত। মীমাংসা বার্ত্তিক ১।৩।১০

অর্থ।—এই হেতুতে যদ্যপি মন্বাদ্যুক্ত কোনও স্মৃতিতে বেদবিরুদ্ধ ভাব পাওয়া যায়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে ইহাই করা উচিত যে, স্বতঃসিদ্ধ বেদ-মার্গের যে কেহ অত্যন্ত বিরোধী হয়, তাহাকে নিরাকরণ করিলে ধর্ম্ম শুদ্ধি হয় না।

ইহাতে স্মৃতি সকল যে বেদ-বিরুদ্ধ, তাহা সিদ্ধ হয়। শুধু বিরুদ্ধ মাত্র নয়, বার্ত্তিক-কার বলেন, অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সেই সকল বিরোধী স্মৃতিশাস্ত্রকে নিরাকরণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে বৈদিক ধর্ম্মের শুদ্ধি হইতে পারে না।

স্মৃতি-শাস্ত্রের যে মূল সিদ্ধান্তই বেদ-বিরুদ্ধ, তাহার নিদর্শন আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। উত্তর-মীমাংসার সূত্রকার ভগবান ব্যাসদেবও এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপনা করিয়াছেন।

নচ স্মার্ত্ত মতাদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ শারীরশ্চ। ব্রহ্মসূত্র ১।২।২০

অর্থ।—স্মার্ত্ত (স্মৃতিশাস্ত্রে জগতের কারণরূপে প্রতিপাদিত) প্রধান (জড়-প্রকৃতি) জগতের কারণ নহে! কেন না, অতদ্ধর্ম্ম অভিলাপ (জগৎ-কারণে চেতনের ধর্ম্ম ঈক্ষণের কথন) হেতুক। বেদে দেখা যায় যে, যিনি জগতের কারণ, তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে মনে ভাবিলেন—

(একোহং বহু) এক আমি বহুরূপ হই। জড় প্রকৃতির জ্ঞান নাই। সে কোনও বিষয় ভাবনা করিতে পারে না। অতএব স্মৃতিশাস্ত্রে যে জড়-প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা বেদ-বিরুদ্ধ।

যে সমস্ত শাস্ত্রে জড়-প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রের নাম স্মৃতি-শাস্ত্র। এই বিষয়টি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সর্ব্বসমবাদিনীতে বিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

নমু 'নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাদিত্যত্র প্রধানং
স্মৃত্যুক্তমেব, নচ শ্রৌতমিতি প্রতিপাদয়তা
শ্রীবাদরায়নেন পুরাণানামপি প্রাধানিক প্রক্রিয়ত্বাৎ
স্মৃতি ত্বং বোধ্যতে, ন তত্র স্বতন্ত্রং যৎপ্রধানং
তদেব নিষেধয়তা তেন প্রধান স্বাতন্ত্র্য প্রতি-
পাদকং সাঙ্খ্য দর্শনমেব স্মৃতিঃ তেন মন্যতে,
'তদধীনত্বা দর্থব' দিতি সূত্রান্তরেণ হি পরমেশ্বরাধীন
তয়া—বিশ্রুত মধ্যা কৃতাদ্য পর পর্য্যায়ং মন্যতে

এব প্রধানম্। তথাচ পুরাণে দৃষ্টমিতি ন স্মৃতি-
সাধারণ্যং তম্ভেতি বেদত্বমেব স্থিতম্।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পুরাণ সকল স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে গণ্য। যে হেতু "স্মার্ত্তমতং ধর্ম্মাভিলাপাৎ" সূত্রে ভগবান ব্যাসদেব এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, প্রধানের জগৎ-কারণতা স্মৃতি প্রতিপাদিত। শ্রুতি প্রতিপাদিত নহে। যে সমস্ত শাস্ত্রে প্রধানকে কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাই স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতি-শাস্ত্রের যখন এই লক্ষণ, তখন পুরাণ সকলকেও স্মৃতিশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। কেন না, পুরাণ সকলেও প্রধান ক্রমেতেই সৃষ্টির বর্ণনা করা হইয়াছে। (ইহা হইল পূর্ব্বপক্ষ) ইহার সিদ্ধান্ত শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন যে, স্বতন্ত্ররূপে প্রধানকে যে শাস্ত্রে জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে, তাহাই স্মৃতিশাস্ত্র। অর্থাৎ সাংখ্য স্মৃতির অনুগত।

বেদে ঈশ্বর-প্রেরিত ও ঈশ্বরাধীন প্রধানকে জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। পুরাণ সকলেও এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। অতএব পুরাণ পঞ্চম বেদ। পুরাণ স্মৃতি নহে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জগৎ-কারণ-বাদ 'স্মার্ত্ত সিদ্ধান্ত' আর চিৎ-কারণ বাদ 'বৈদিক-সিদ্ধান্ত'।

স্মার্ত্ত-সিদ্ধান্তের জড়-কারণ-বাদত্বের আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহাতে পঞ্চদেব উপাসনা দেখা যায়। যদ্যপি মনুস্মৃতিতে পঞ্চদেব উপাসনার উল্লেখ নাই, তথাপি বর্ত্তমান স্মার্ত্তধর্ম্মে পঞ্চদেব উপাসনাই প্রধান। অতএব ইহার বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। পঞ্চদেব উপাসনার এই প্রথা—দুর্গা, শিব, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণুর পূজা হয়। তন্মধ্যে একটি দেবতাকে মধ্যে স্থাপন করা হয় এবং অপর চারিটি দেবতাকে চারি দিকে স্থাপন করা হয়। যে দেবতাকে মধ্যে স্থাপন করা হয়, সেইটি প্রধান; অপর চারিটি তাহার অঙ্গ। বোধ হয় ইহা যেন পাঁচটি দেবতার একটি কমিটী। যিনি মধ্যে বসিবেন, তিনি চেয়ারম্যান, অপরগুলি অর্ডিনারী মেম্বর। কিন্তু চেয়ার-ম্যান পারমানেন্ট নহেন। কখনও দুর্গা মধ্যে বসেন। কখনও বা শিব এবং কখনও বা অন্য দেবতাকেও মধ্যস্থানে দৃষ্ট হয়। যে দিন যাহার জন্য ভোট সংগ্রহ হয়, সেইদিন তিনিই চেয়ারম্যান। স্মার্ত্তমতপোষকগণ আমার স্মার্ত্তবান্ধবগণ বলিয়া থাকেন যে, স্মার্ত্তধর্ম্মে সাম্যবাদ নিহিত আছে। এ কথা শুনিতে বড় সুন্দর। আহা! স্মার্ত্ত-ধর্ম্মে কাহারও সঙ্গে কোনও বিদ্বেষ ভাব নাই—সকলই সমান। এই সাম্যবাদটি জড়োপাসনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু স্মার্ত্ত-সিদ্ধান্তে এই পঞ্চ দেবতার এইরূপে স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। দুর্গা (পৃথিবী) তিনি সর্ব্বাধার স্বরূপা। শিব (জলতত্ত্ব) এইজন্য তাহার মস্তকে সর্ব্বদা গঙ্গাজলধারা দেখা যায়। গণেশ (বায়ুতত্ত্ব) বায়ুতেই

শরীর পুষ্ট হয়। সূর্য্য (তেজসতত্ত্ব) প্রত্যক্ষে তেজরূপ। ও বিষ্ণু (আকাশতত্ত্ব)। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

নানাকার মনাকারং গগনাকারং
প্রণমত গোবিন্দম্ পরমানন্দম্।

এইরূপে পৃথিবী জল বায়ু তেজ আকাশের উপাসনা করা হয়। পৃথিবী জল বায়ু তেজ ও আকাশ এই পাঁচটি বস্তু জড় ও প্রকৃতির বিভিন্ন বিকার মাত্র। একটি প্রকৃতির যখন পাঁচটি প্রভেদ, কাজেই সাম্য। পাঁচটি তত্ত্ব পৃথকরূপে হইলেও জড়ত্বে তাহারা সকলেই সমান।

চিৎ-তত্ত্বের উপাসনায় সাম্যবাদ আসিতে পারে না। যেহেতু সে একতত্ত্ব। এক বস্তু কাহারও সমান হইতে পারে না। এইজন্য তাহাকে বলা হইয়াছে—

ন তৎ সমশ্চাভ্যধিক শ্চ দৃশ্যতে

সুতরাং বৈদিকধর্ম্মে একটি পর তত্ত্বই উপাস্য। আর সেটি অদ্বিতীয় হওয়ায় অসমান। সুতরাং বৈদিক ধর্ম্মে সাম্যবাদ আসিতে পারে না। বিশেষতঃ সাম্যবাদ একটি লোক ভুলাইবার কথা। কেহই পঞ্চ দেবতাকে সাম্যভাবে উপাসনা করেন না। যিনি যাহাকে মধ্যে স্থাপন করেন, তিনি তাহাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। অপর চারিটিকে তাহার অঙ্গ বলিয়া গণনা করেন। অঙ্গাঙ্গীভাব স্থাপন করিলে কি সাম্যভাব থাকিতে পারে? আর বাস্তবিক জগতে সাম্যভাব কেহই করিতে পারে না। একটি পতি দুইটি পত্নীকে সমানভাবে প্রীতি করিতে পারে না। একটি পিতা দুইটি পুত্রকে সমানভাবে স্নেহ করিতে পারে না। এমন কি, একটি পুরুষ দুইটি হাতে সমান ভাবে কাজ করিতে পারে না। তবে পঞ্চদেবতার উপাসনায় কিরূপে সাম্য থাকিতে পারে?

যদি বা পাঁচটি দেবতাকে সাম্যভাবে উপাসনা করা যায়, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে সাধকের কি গতি হয়। সে কৈলাসে যাইবে না বৈকুণ্ঠে যাইবে? দুর্গালোকে যাইবে না গণেশ লোকে? যদি পাঁচটিই তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করেন, তবে তাহার মহা বিপদ। আর সাধক বলিতে পারেন না যে, আমি অমুক দেবতার লোকেই যাইব। কারণ তাহা হইলেই বৈষম্য হইয়া উঠে ও অপরটি দেবতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। আর তিনি যখন জীবদ্দশায় পাঁচটিকেই সমানভাবে সেবা করিয়াছিলেন, তখন মৃত্যুর পরে একটি দেবতার লোকে গিয়া কি অপর চারিটি দেবতার প্রতি ভক্তি তাহার মনে থাকিবে না ও তাহাদের জন্য কি তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইবে না? আর এই ব্যাকুলতা যদি থাকিল, তবে তাহার প্রাণে শান্তি কোথায়?

এই পঞ্চ দেবোপাসনাকেও বাস্তবিক স্মার্ত্তধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না। কারণ

মনু ও যাজ্ঞবল্ক আদি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই। বরং মনুস্মৃতিতে গণেশাদি পূজনকারী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ ব্রাহ্মণমধ্যে গণ্য করা হইয়াছে—

শ্বক্রীড়ী শ্যেনজীবিচ কন্যাদূষক এবচ
হিংস্রো বৃষল বৃত্তিশ্চ গণানাংশ্চৈব যাজকঃ।

ইহাতে গণানাংশ্চৈব যাজক পদের ব্যাখ্যায় কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন, বিনয়কাদি গণ যাগ কৃৎ।

বিনায়ক শব্দে গণেশ
লম্বোদরশ্চ বিকট বিঘ্ন নাশো বিনায়ক।

অনেক বহুদর্শী পণ্ডিতগণের ইহাই বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান স্মার্ত্তধর্ম্ম শাক্তধর্ম্মের রূপান্তর। যেহেতু শাক্তধর্ম্মেই মদ্য, মাংস, ও পরস্ত্রী-সংসর্গের বাহুল্য দেখা যায়। এই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও বিরক্তিকর কার্য্যের দ্বারা সমাজ যখন উপদ্রুত হইল, তখনই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য শাক্তধর্ম্ম স্মার্ত্তধর্ম্মরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ও মদ্য মাংস স্ত্রীসহবাসের বিধানের পরিবর্ত্তে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। কিন্তু এ সকল কুবিধানের নিষেধ করিতে পারিলেন না।

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা।

(মনু অঃ ৫ শ্লোঃ ৫৬)

মাংস ভক্ষণে কোন দোষ নাই। মদ্য পানে কোন দোষ নাই। মৈথুনে কোন দোষ নাই। কারণ ইহা জীব মাত্রের প্রবৃত্তি। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে দোষ হয় না। নিবৃত্তিতে মহাফল। শাক্তধর্ম্ম রূপে যে মদ্য মাংস ও স্ত্রীসহবাসকে ধর্ম্মরূপে বিধান করা হইয়াছিল, স্মার্ত্তধর্ম্ম রূপে আসিয়া এই মাত্র পরিবর্ত্তন হইল যে, এই সকল কার্য্যে নিবৃত্তিতে মহাফল; কিন্তু ইহা করিলে কোন দোষ নাই।

মদ্যপান উন্মাদকর ও সমাজে নিতান্ত ঘৃণিত বলিয়া, স্মার্ত্তধর্ম্ম তাহাকে বিধান রূপে প্রচার করিতে পারিলেন না। কিন্তু মাংসের লোভ ছাড়া হইল না। অতএব মাংস ভক্ষণের যে কেবল বিধান মাত্র করা হইয়াছে তাহা নয়। কিন্তু বলাৎকারে মাংস ভক্ষণের অনুরোধ করা হইয়াছে! মাংস ভক্ষণ না করিলে যে অত্যন্ত দোষ হইবে, তাহাও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

নিযুক্তস্তু যথা ন্যায়ম্ যো মাংসম্ নাত্তি পুরুষঃ
সপ্রেত্য পশুতাম যাতি সম্ভবানেক বিংশতিম্।

(মনু অঃ ৫ শ্লোঃ ৩৫।)

অর্থ—শ্রাদ্ধ বা মধুপর্কে নিযুক্ত হইয়া যে মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করে না, সে মৃত্যুর পর এক বিংশতি জন্ম পর্য্যন্ত পশু হইবে।

মনে করুন, কত বলাৎকারে মাংস ভক্ষণের বিধান! একজন ব্রাহ্মণ, সে যদি সন্ধ্যা বন্দন ও অগ্নিহোত্রাদি না করে, তবে সে পতিত, কিংবা শূদ্র প্রায়। কিন্তু শ্রাদ্ধে মাংস না খাইলে একবিংশতি জন্ম পর্য্যন্ত পশু হইতে হইবে। মনে করুন, একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা বন্দন অগ্নিহোত্রাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু দৈবাৎ একদিন কোন স্মার্ত্ত বান্ধবের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া যদি অন্নাদি ব্যঞ্জনের সহিত পরিবেশিত মাংসকে ত্যাগ করেন। তাহার সমস্ত জীবনের মধ্যে একদিন মাংস ভক্ষণ না করায় তাঁহাকে একবিংশতি জন্ম পর্য্যন্ত পশু যোনি প্রাপ্ত হইতে হইল। সন্ধ্যা বন্দন গায়ত্রী জপ ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম তাহাকে কিছুই রক্ষা করিতে পারিল না। মাংস ভক্ষণ কি পরম ধর্ম্ম! যদি বলেন এই বিধানটি যে, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা বন্দন ও অগ্নি হোত্রাদি করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে নয়, কিন্তু যাহারা কোনই সৎকর্ম্ম করে না, তাহাদের পক্ষে ইহা প্রযুজ্য; আহা! কি প্রমাদ! যাহারা সর্ব্বতোভাবে সৎকর্ম্ম ও বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন, তাহাদেরই এই দুর্দ্দশা। তাহাদিগকেই সমস্ত জীবনের মধ্যে এক-দিন মাংস না খাইলেই একুশ জন্ম পশু হইতে হইবে। কেন না, শ্রাদ্ধে এইরূপ ব্রাহ্মণেরই নিমন্ত্রণ বিধান। ঋত্বিক্ বরণে মধু পর্কের বিধান। সমস্ত সৎকর্ম্ম সম্পন্ন ও বেদ-বিজ্ঞা না হইলে ঋত্বিক হইতে পারে না। শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মে একবারে মাংস ত দূরের কথা, আমিষ অন্ন ও আমিষ ফল মূলাদি ভক্ষণ পর্য্যন্ত নিষেধ। কিন্তু স্মার্ত্তধর্ম্মে মাংস না খাইলে একুশ জন্ম পর্য্যন্ত পশু হইতে হইবে। ইহাতেই উভয় ধর্ম্মের মহত্ত্ব বুঝিয়া লউন। কেনই বা মাংস ভক্ষণের জন্য এতদূর আগ্রহ, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। এতদ্ভিন্ন মনুস্মৃতিতে আরও একটি সিদ্ধান্তের ঘৃণিত বিধান আছে। তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাহাতে হিন্দু মাত্রের বড়ই কষ্ট হইবে।

বোধ হয় সাহরণ রাজার পুত্র মদন রাজা বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ব্রাহ্মণগণের নিকটে মনুর নামে সংগৃহীত বচন সকল একত্র করিয়া এই বর্ত্তমান মনুস্মৃতি সংগ্রহ করেন, ও পরে নানা রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাহার সংশোধন করিতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন গোস্বামী স্মৃতিরত্ন।
বৃন্দাবন।

আর একখানি পত্র

(বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও সিদ্ধদেহের কথা।)

প্রণয়াস্পদেষু,

তোমার চিঠি পাইলাম। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সকল কথা যে আমার পূর্ব্ব পত্রে ভাল করিয়া বলা হয় নাই, ইহা বুঝি। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, আমাদের সকলেরই যে একটা স্বরূপ দেহ বা সিদ্ধ দেহ আছে, এই কথাটা সকলের আগে ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। আমাদের প্রত্যক্ষ রক্তমাংসের পার্থিব দেহটা এই স্বরূপ দেহ বা সিদ্ধ দেহ হইতেই জন্মিয়া, ঐ স্বরূপকেই বিশ্বের বিকাশ ধারাতে ফুটাইতেছে। তোমাদের আধুনিক ইভোলিউষণ-বাদে রেগুলেটিভ আইডিয়া (Regulative idea) বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছি। যে আইডিয়া বা আদর্শ ধরিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ইভোলিউষণ বা ক্রমাভিব্যক্তি হয়, যে আদর্শের দ্বারা এসকলের ক্রমবিকাশ নিয়মিত বা রেগুলেটেড (Regulated) হয়, তাহাকেই রেগুলেটিভ আইডিয়া কহে। আধুনিকেরা যাহাকে ইভোলিউষণ-বাদ বা ক্রমাভিব্যক্তি-বাদ কহেন, বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাধনায় তাহাকেই পরিণাম-বাদ কহিয়াছেন। আধুনিক ক্রমাভিব্যক্তিবাদে যাহাকে বস্তুর বিকাশের রেগুলেটিভ আইডিয়া কহে; আমাদের বৈষ্ণবপরিণামবাদে তাহাকেই সিদ্ধ দেহ কহিয়াছেন।

একদিন এসকল কথার কিছুই জানিতাম না ও বুঝিতাম না। এখনই যে নিঃশেষ বুঝিয়া ফেলিয়াছি, এমন স্পর্দ্ধা করি না। তবে কোন্ সূত্রে, কি অনুভব ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধদেহ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তার কিছুটা আভাস পাইয়াছি। সেটুকুই তোমাকে বলিতে পারি।

যৌবনের প্রথমে যখন বিশ্বজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, এই জগৎটা কোথা হইতে, কি করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া, একটা মনগড়া দ্বৈত-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষ অনুভবে আমরা দুইটি বিজাতীয় বস্তু দেখিতে পাই, একটিকে চৈতন্য আর অপরটিকে জড় কহে। চৈতন্য আর জড় পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মসম্পন্ন। যাহা জড় তাহা চৈতন্য নহে, যাহা চৈতন্য তাহা জড় নহে। সুতরাং জড় হইতে চৈতন্যের কিম্বা চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি অসম্ভব। এই জন্য তখন বিশ্বের মূলে একটা অনাদি ও অনন্ত জড়ত্বে আর একটা অনাদি ও অনন্ত চেতনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রথম যৌবনের বিশ্বজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়াছিলাম।

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বেশি দিন টিঁকিল না। জড় আর চৈতন্য যেমন পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মসম্পন্ন বস্তু, সেইরূপ আবার ইহাদের মধ্যে নিত্যই একটা সম্বন্ধও ত দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য জড়কে চালায়। চৈতন্য চালক, জড় চালিত। জড় ও চৈতন্য যদি একান্তই বিরোধী বস্তু হয়, তবে জড় চেতনের এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ সম্ভব হয় কিসে? এই নূতন জিজ্ঞাসার উদয়ে প্রথম যৌবনের দ্বৈত-সিদ্ধান্তের মূল চলিয়া গেল। চৈতন্যই জড়কে চালাইয়া নেয়, জড় ত তেমন করিয়া চৈতন্যকে চালাইতে পারে না। ইহা দেখিয়া ক্রমে চৈতন্যই যে বড়, চৈতন্যই যে কর্ত্তা, চৈতন্যই যে জড়ের অধিনায়ক ও অধিকারী, এই ধারণা জন্মিতে লাগিল। এই পথ ধরিয়া, ক্রমে বিশ্বের মূলে এক অনাদ্যনন্ত চেতনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিলাম। ইহাই যৌবনের নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর-তত্ত্ব!

কিন্তু ইহাতেও ত সকল সমস্যার মীমাংসা, সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল না। ক্রমে ক্রমে আবার নূতন প্রশ্ন উঠিল। জড় হইতে যেমন চৈতন্যের সম্ভব হয় না, হইতে পারে না, চৈতন্য হইতেই তবে জড় উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া? এই প্রশ্নের এক মাত্র উত্তর সম্ভব—যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহা বাস্তবিক জড় নহে, তাহাও চিদ্-বস্তু জড় চৈতন্যেরই বিকার। তখন ইংরাজিতেই এসকল কথার বেশি আলোচনা করিতাম। তাই বলিলাম, matter is the thonght of god concretised man is the spirit of god incarnated—ভাগবতী চিন্তাই ঘনীভূত হইয়া জড়রূপ ধারণ করিয়াছে; ঈশ্বরের প্রাণ বা আত্মাই দেহধারণ করিয়া মানুষ হইয়াছে। এইরূপেই জড় ও জীব সকলই ব্রহ্মময় হইয়া উঠে।

কিন্তু ক্রমে আবার প্রশ্ন হইল, বিশ্বের প্রত্যক্ষ ভেদাভেদের মীমাংসা কোথায়? চৈতন্য হইতে যে জড়ের প্রকাশ হইল, ব্রহ্ম হইতে যে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা কি কালবিশেষে ঘটিয়াছে, না অনাদিকাল হইতেই আছে? অর্থাৎ আদিতে কেবল নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর মাত্র বিদ্যমান ছিলেন। তখন—

না ছিল এসব কিছু, আঁধার ছিল অতি
ঘোর দিগন্ত প্রসারী

এই কি সত্য? আর সেই একাধার আধার হইতে বিশ্বের বিচিত্র পদার্থসমূহের ক্রমাভিব্যক্তি হইয়াছে, একথা মানিতে পারিলাম না। সৃষ্টিব্যাপার যদি কালবিশেষের সংঘটিত হয়, তবে সৃষ্টির সূচনার পূর্ব্বে স্রষ্টার যে অবস্থা ছিল, তবে পরে সে অবস্থাও থাকিতে পারে না। কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তাতে পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। কিন্তু ঈশ্বরে পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। অতএব সৃষ্টিকেও অনাদি বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, না করিলে স্রষ্টার বা ঈশ্বরের নিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মে।

কিন্তু সৃষ্টি যদি অনাদি হয়, তবে সৃষ্ট পদার্থেরও অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয় না কি? যদি বল চন্দ্র সূর্য্যাদি সৃষ্ট পদার্থ অনাদি নহে, একদিন এ সকল ছিল না, ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে; এ কথা অস্বীকার করিতে পারিব না। প্রত্যক্ষ জড়বিজ্ঞানও এ কথা প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু আবার সেই একই প্রশ্ন উঠে; চন্দ্রসূর্য্যাদি কি অবস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? অবস্তু হইতে বা অসৎ হইতে বস্তুর বা সতের উৎপত্তি অসাধ্য। সুতরাং হয়, বল যে চন্দ্রসূর্য্যাদি সত্য নহে, বস্তু নহে; অবিদ্যাবশতঃ রজ্জুবৎ সর্পভ্রম মাত্র; নিরাকারে বা একাকারেতে আকার ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে; এ একটা উত্তর সম্ভব। কিন্তু যদি জগতের বিচিত্র পদার্থ সকলের সত্যতা ও বস্তুত্ব মানিতে হয়, তাহা হইলে, অনাদিকাল হইতে এ সকলের একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ eternally realised form ভগবানের স্বরূপের অন্তর্গত হইয়া আছে, এই একথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যেক পদার্থের এই অনাদিসিদ্ধ স্বরূপ বা eternally realised বা ideaকেই আমাদের বৈষ্ণব পরিভাষাতে সিদ্ধদেহ কহিয়াছেন।

মৃত্যুর আঘাত খাইয়া, সর্ব্বপ্রথমে এই তত্ত্বের আভাষ পাই। জীবনের আশ্রয় যেদিন ভাঙ্গিয়া যায়, সংসারের আলো যেদিন দমকা বাতাসের মুখে পড়িয়া সহসা নিভিয়া যায়, সেদিনই মানুষ প্রথম অমৃতেরও সন্ধান পায়। সেদিন মৃত্যুটা কঠোরতম নিষ্ঠুরতার সত্য হইয়া উঠে। সেদিন মরণটাই জীবনের সকল কথার চাইতে বড় কথা হইয়া পড়ে। অথচ তখনই আবার এই অতিবড় মৃত্যুটাকেও সত্য বলিয়া ধরিতে প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠে। মানুষ মরে, তখন একথা ভাবিতে বুক শুকাইয়া যায়, কথাটা বলিতেও মুখে আটকাইয়া আসে। এই মরণ আঁধারের মাঝে যে দিন শুনিলাম কোনও মানুষই বাস্তবিক মরে না; সাধু মহাজনেরা মৃত্যুতে সিদ্ধদেহ লাভ করেন, সাধারণ লোকে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, সেদিন মানসচক্ষে একটা অভূতপূর্ব্ব নূতন জগৎ খুলিয়া গেল।

মৃত্যুতে সাধুমহাজনেরাই নিজ নিজ সিদ্ধদেহ লাভ করেন, সকলে করে না বলিয়া, কেবল সাধুদিগেরই যে সিদ্ধদেহ আছে, সাধারণ লোকের নাই, তাহা নহে। জীব মাত্রেরই একটা সিদ্ধদেহ আছে। সাধারণ লোকে মৃত্যুতে যে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, আর জীবদ্দশায় তাহারা যে দেহেতে এ সংসারে বিচরণ করে, এই দুই দেহই তাহাদের সিদ্ধদেহের দ্বারা নিয়মিত হয়। এই মর দেহ, আর ঐ সূক্ষ্মদেহ, যাহা জীব মৃত্যুতে গ্রহণ করে, এই উভয়ের মধ্য দিয়াই প্রত্যেক জীবের জীবত্বের ক্রমাভিব্যক্তি বা ইভোলিউষণ হয়। আর এই অভিব্যক্তি ধারাতে তার ঐ সিদ্ধদেহই তার বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ও ধারণ করিয়া, এই অভিব্যক্তির বা ইভোলিউষণের রেগুলেটিভ্ আইডিয়া (regulative idea) বা নিয়ামক হইয়া রহে।

আমাদের সকলেরই এক একটা সিদ্ধদেহ আছে। কিন্তু নাস্তিক্য বুদ্ধিপ্রবণ আধুনিক যুক্তিবাদীকে এ কথা বলা বৃথা, বুঝান অসম্ভব। এই যুক্তিবাদ ঈশ্বর মানে, কিন্তু সে-ঈশ্বর যে-হেতু অতএব দিয়া গড়া। এই যুক্তিবাদ পরলোকও মানে, কিন্তু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলে, এই পরলোক একটা মানসকল্পনায় পরিণত হয়। এই যুক্তিবাদের চক্ষে মানুষ মরিলেই দেবতা হইয়া যায় "মোহমায়া পাশরি" সেই "আনন্দধামে" চলিয়া যায়, যেখানে জপ নাই, মৃত্যু নাই, পাপ নাই, তাপ নাই, আছে কেবল চিরশান্তি ও নিখুঁত পুণ্য। শূন্য বা নিরাকার আত্মা, শূন্য বা নিরাকার ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়া, মৃত্যুতে সেই নিরাকার শূন্যে বা ব্রহ্মে বিলীন হয়, এই যুক্তিবাদ সাহস করিয়া এ কথাটাও বলিতে পারে না। কিন্তু নিরাকার আত্মা মৃত্যুতে নিরাকারের কক্ষে যাইয়া, নিরাকার হইয়া অনন্ত উন্নতির নিরাকার পথে চলিতে থাকে, এই কথাই বলে। এই কিম্ভূতকিমাকার নিরাকারের পথে সিদ্ধদেহের কোনও স্থান নাই। দেহ মাত্রেই যে সাকার।

বৌদ্ধ-জাতক বুদ্ধদেবের অসংখ্য জন্ম-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যিশু খৃষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের ইতিহাসের কেতাবে তাই লেখে। কিন্তু জাতক বলেন, এই জন্মই বুদ্ধদেবের প্রথম জন্ম নহে। তিনি ইহার পূর্ব্বেও আরও অনেকবার জন্মিয়াছিলেন। অনেকবার জন্মিয়াছিলেন, একথা যদি মানিতে হয়, তবে জন্মিয়া আবার সেই-সেইবার মরিয়াও ছিলেন, ইহাও মানিতে হইবে। যে বুদ্ধ পূর্ব্বে অনেকবার জন্মিয়াছিলেন, জন্মিয়া অনেকবার মরিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধ পঁচিশ শ' বৎসর পূর্ব্বে কপিলবস্তুতে, শাক্যকুলে জন্মিয়াছিলেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই বুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা Individuality বা "ব্যক্তিত্ব", একটা Personality বা "পুরুষবিধত্ব" প্রতিষ্ঠিত হয় না কি? যাহা নিতান্ত নিরাকার, তার কোনও বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব বা পুরুষবিধত্ব ত সম্ভব হয় না। নিরাকার অর্থই ত যার কোনও সীমানা, কোনও নির্দ্দেশ, কোনও সংজ্ঞা, কোনও চিহ্ন নাই। নিরাকার আর একাকার ত একই কথা। অতএব ব্যক্তিত্ব বা Individuality পুরুষবিধত্ব বা Personality মানিলেই আকার মানিতে হয়। এই আকার যে সর্ব্বথা স্থূল, চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, এমন হইতেই হইবে, একথা বলি না। কিন্তু স্থূল না হউক, সূক্ষ্ম; জড় না হউক চিৎ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হউক অতীন্দ্রিয়;—আকার একটা তার থাকিতেই থাকিবে। আর যার আকার আছে, তাহাকেই ত দেহী বলিতে পারা যায়। স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করাই আকারের ধর্ম্ম। দেহ ও দেহীর বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে। আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবে যার দেহ নাই, তার যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা কখনও ধরা পড়ে না।

দেহের নিত্যত্ব যাঁরা স্বীকার করেন নাই, তাঁরা আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব

বা পুরুষবিধত্বও স্বীকার করেন নাই। স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব বা পুরুষবিধত্ব মায়িক, পারমার্থিক নহে; তাঁরা এই কথাই বলিয়াছেন। মায়া বলিতে তাঁরা—অনাদিকৃত অবিদ্যা বা অজ্ঞান বুঝেন। অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান; অসত্যে সত্য বুদ্ধি; ক্ষণিকে নিত্য বুদ্ধি—এ সকলই এই মায়া বা অজ্ঞানের কর্ম্ম। এই অজ্ঞান নিরস্ত না হইলে, সত্য জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। সত্য জ্ঞানের প্রকাশ না হইলে, জীবের মুক্তি হয় না। সত্য জ্ঞানের প্রকাশে জীব মুক্তিলাভ করিলে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করে। জ্ঞান, মুক্তি, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বুদ্ধি, এ সকল পর পর লাভ হয় না। জ্ঞান অর্থই ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি অর্থই কৈবল্য বা মুক্তি। এই কৈবল্য মুক্তিতে মারোপহিত যাবতীয় স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি একান্ত নষ্ট হইয়া যায়। জীবন্মুক্তিতে সংস্কারবশতঃ দেহ থাকে বটে, কিন্তু দেহ রক্ষা করিলে, মুক্ত পুরুষের কোনও দেহান্তর প্রাপ্তি হয় না। ইহাই আমাদের প্রাচীন নিরাকারবাদের পারলৌকিক সিদ্ধান্ত।

আপনার সিদ্ধান্তের স্ববিরোধিতা দোষ আটকাইতে হইলে, আধুনিক নিরাকারবাদকেও এই পারলৌকিক সিদ্ধান্তই আশ্রয় করিতে হয়! কিন্তু এ নিরাকারবাদ ত নিজের গড়া সিদ্ধান্ত নয়, পরের নিকট হইতে ধারকরা মাত্র। পার্কার, নিউম্যান্, চ্যানিং, কব্, কার্লাইল্, এমার্স‌ণ্, ওয়ার্ডস্‌বার্থ প্রভৃতি খৃষ্টীয়ান্ কবি ও মনীষিদিগের কেতাবি বুলিই ইহার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এ সকল উদার খৃষ্টীয়ান্ মতবাদে পরলোকতত্ত্বের একটা গতানুগতিক ভাব আছে, কিন্তু কোনও সজীব সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা ত হয় নাই। আমাদের প্রাচীনেরা কিন্তু বলিয়াছেন যে, পরলোকসম্বন্ধিনী মতি কোনও দিন তর্কের দ্বারা লাভ করা যায় না। "ধাতুর প্রসন্নতা" লাভ হইলেই কেবল এই "মতি" লাভ হইতে পারে। "ধাতু" যার প্রসন্ন হয় নাই, কেতাব পড়িয়া, কবিতা আওড়াইয়া, কার্লাইল্ এমার্সন্, দেবেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের কল্পসৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়া সে এই "মতি" লাভ করিবে কেমনে?

আধুনিক নিরাকারবাদ স্বদেশীই হউক, আর বিদেশীই হউক, সত্য পারলৌকিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। বহুদেববাদীরা যেমন অদৃশ্য দেবতায় বিশ্বাস করেন, কেবল কিম্বদন্তির আশ্রয়ে; নিরাকারবাদী সেইরূপ পরলোকে বিশ্বাস করেন, ঐরূপ কিম্বদন্তিরই খাতিরে। পরলোক সম্বন্ধে ইহারাও Idolatrous, প্রতীক উপাসক মাত্র। নিরাকার পদ্ধতির শ্রাদ্ধক্রিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যই পরলোকবিশ্বাসী, তাঁহাদের এই বিশ্বাস তাঁহাদের প্রকৃতিগত আস্তিক্য বুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, যে মতবাদ আশ্রয় করিয়া তাঁরা ধর্ম্মসাধন করেন, তাহার উপরে নহে।

যাঁরা জন্মটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার মনে করেন, এই পৃথিবীতে আমাদের

চক্ষের উপরে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবের প্রথম সৃষ্টি বা উৎপত্তি হয়, যাঁরা এই বিশ্বাস করেন, তাঁদের পক্ষে সত্য পারলৌকিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

কারণ, জন্মটা যদি এরূপ একটা আকস্মিক ব্যাপারই হয়; কালবিশেষে জীবের উৎপত্তি হয়, এই জন্মের পূর্ব্বে জীব ছিল না, এই সিদ্ধান্ত যদি মানিতে হয়; তাহা হইলে, মৃত্যুর পরে জীব থাকে, একথাও ত আর বলা চলে না। জীবদেহের উৎপত্তি কাল-বিশেষে হয়, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। আর এই দেহ কালে বিনাশ পায়, ইহাও প্রত্যক্ষ ব্যাপার। দেহের উৎপত্তিকেই যদি জন্ম বল, দেহের বিনাশই যদি মৃত্যু হয়; তবে এই জন্ম একটা আকস্মিক ব্যাপার, কালবিশেষে ঘটে, ঘটিবার পূর্ব্বে তার অস্তিত্ব ছিল না, আর মৃত্যুর পরেও কিছু থাকে না, ইহাই মানিতে হইবে। কিন্তু "পর" আছে "পূর্ব্ব" নাই, ইহা অনুভবগম্য নহে, কল্পনাও করা যায় না। পরলোক মানিলেই, পূর্ব্বলোক মানিতে হইবে। পরজন্ম মানিলেই পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিতে হইবে। জন্ম আর মৃত্যু, একই শিকলের দুইটা কড়া মাত্র, ইহা অস্বীকার করা অসাধ্য হইবে। জন্ম আর মৃত্যু, যদি এরূপ একই শৃঙ্খলের দুইটা অংশ মাত্র হয়, তবে জন্মকে ছাড়িয়া মৃত্যুকে, এবং মৃত্যুকে ছাড়িয়া জন্মকে, এবং জন্ম ও মৃত্যু যে শৃঙ্খলের দুইটি কড়া বা অংশ মাত্র, সেই শৃঙ্খলকে ছাড়িয়া জন্ম মৃত্যু উভয়ের কোনটিকেই ভাল করিয়া বুঝিতে ও ধরিতে পারা যায় না।

দেহ ধারণকেই আমরা জন্ম বলি। আত্মবস্তুকে যাঁরা অপ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে—"আত্মার অমরত্বে" যাঁরা বিশ্বাস করেন,—অন্ততঃ তাঁদের নিকটে এই অপ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ এই অমর আত্মার দেহ ধারণই জন্ম, এতভিন্ন জন্ম শব্দের অপর কোনও অর্থ নাই, থাকিতে পারে না।

কিন্তু যাহা নাই, তাহাকে ত ধরা বা ধারণ করা যায় না। অবস্তুর ধারণও হয় না, গ্রহণও সম্ভব নহে। হয় বল যে আমরা যাকে জন্ম বলি, তাহা একটা মিথ্যা, একটা ভ্রান্তি, একটা ইন্দ্রজাল, যাহা হয় না, তাহা হইয়াছে বলিয়া মনে করা, যাহা ঘটে নাই, ঘটে না, কদাপি ঘটিতে পারে না, তাহা ঘটিয়াছে, বা ঘটিল, এরূপ কল্পনা করা ভিন্ন আর কিছু নহে। মায়াবাদী একথা বলেন বটে। মায়াবাদীর চক্ষে জন্মও মিথ্যা, মৃত্যুও মিথ্যা; দেহও মিথ্যা, জীবনও মিথ্যা; জগৎ মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই মিথ্যা। আত্মার বৈশিষ্ট্য মিথ্যা, স্বাতন্ত্র্য মিথ্যা, ব্যক্তিত্ব বা Individuality মিথ্যা। পুরুষবিধত্ব বা Personality মিথ্যা। সকলই রজ্জুতে সর্পভ্রম মাত্র। এরূপ সিদ্ধান্ত আছে; এরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভব।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আমরা যাঁহাকে ঈশ্বর বলি, ইংরাজিতে যাঁহাকে Personal God বলে, যে ঈশ্বর জীব হইতে স্বতন্ত্র, যাহার সঙ্গে জীবের নিত্য উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ, যে

ঈশ্বরের "নিত্য-দাস" জীব, এই ঈশ্বর তত্ত্বেরও স্থান নাই। ঈশ্বর বা Personal God'ও মানিবে, আত্মার অমরত্বও কপচাইবে, অথচ আত্মা যে দেহ ধারণ করিয়া দেহীরূপে সংসার-প্রবাহে প্রকাশিত হয়, সেই দেহ মিথ্যা, নিতান্ত অনিত্য, এই দেহের কোনও নিত্যত্ব নাই, ইহাও বলিবে, এত হয় না। 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' তত্ত্বে, যে তত্ত্বে Personality of God প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে বৈদান্তিক মায়ার স্থান নাই।

"স্বতন্ত্র ঈশ্বর" কিম্বা Personal God বলিলেই, ঈশ্বরতত্ত্ব জীব ও জগৎ হইতে পৃথক, ভিন্ন,—জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বরের আশ্রিত, কিন্তু ঈশ্বর নহে, ইহা বুঝায়। এই স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য ঈশ্বর এবং জীব ও জগতের মধ্যে কোনও না কোনও প্রকারের লক্ষণ বা চিহ্ন থাকা চাই। যাহার দ্বারা এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে আমরা পৃথক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করি, তাহাই যে বস্তুর আকার। এই পার্থক্য নির্দ্দেশই আকারের ভাবগত বা Conceptual লক্ষণ। এইজন্য, আমাদের দেশের প্রাচীন বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বরে বা Personal God এ বিশ্বাস করেন বলিয়া ঈশ্বরকে নিরাকার কহেন না, চিদাকার কহেন।

ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ, সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥

এ সকল কথা, অন্যত্র, অন্য-সূত্রে, মহাজনদিগের ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া, সবিস্তারে কহিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি করিব না।

আর ঈশ্বর স্বতন্ত্র বা Person বলিয়া যদি নিরাকার হইতে না পারেন, তবে জীবও ত স্বতন্ত্র বা Person; জীবেরও ত এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা Personality আছে। তাহা হইলে, ঈশ্বরতত্ত্ব যেমন কদাপি নিরাকার হইতে পারে না, সেইরূপ জীব-তত্ত্বও কদাপি নিরাকার হইতে পারে না। আর ঈশ্বরের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা Personality নিত্য বলিয়া, তাঁর যে বিশিষ্ট আকারের দ্বারা এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়, তাহাও অবশ্যই নিত্য হইবে। ঈশ্বর পরিণামের অধীন নহেন, সুতরাং পরিণাম-ধর্ম্মাধীন কোনও প্রকারের দেহ-ধারণ ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে। ঈশ্বর নিত্যকাল নিজ-স্বরূপে, আপনার চিদ্দেহেতে, আপনার চিদৈশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করেন। ঈশ্বরের এই নিত্যসিদ্ধ চিদ্দেহ "পৌরুষ দেহ"। ভাগবত কহিয়াছেন—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান মহদাদিভিঃ

ভগবান মহত্তত্ত্বাদির সঙ্গে পৌরুষ দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এই পৌরুষ দেহ ধারণ করিয়া তিনি লোকসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বাঙ্গালার

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের চূড়ামণি শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কহিয়াছেন—ভগবান যে পৌরুষরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে, তাহাতেই এই পৌরুষরূপের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ যাহা নাই তার গ্রহণ সম্ভব হয় না। ঘট নাই, অথচ ঘট গ্রহণ করিলাম, এমন কথা ত কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং "জগৃহে"—গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই ক্রিয়ার দ্বারাই ভগবানের এই পৌরুষরূপ তাঁর নিত্য-সিদ্ধ, অনাদিকাল হইতে আছে. ইহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপেই শাস্ত্র-যুক্তি সহায়ে, আমাদের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে ভগবানের নিত্য সিদ্ধ রূপের বা দেহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব যেমন নিত্য, জীবতত্ত্বও ত সেইরূপ নিত্য। যাঁরা আত্মতত্ত্বে বিশ্বাস করেন; জীবের আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ—এ সকল কথা কহেন; আধুনিক ভাষায় "আত্মার অমরত্ব" স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে জীবের নিত্যত্ব মানিতেই হয়। যাহা চিরদিন ছিল না, তাহা কদাপি চিরদিন থাকিতে পারে না। যাহা "অজ" নহে, তাহা কখনও "অমর" হয় না; হইতেই পারে না।

ঈশ্বর স্বতন্ত্র বা Person বলিয়া যেমন নিরাকার নহেন, কিন্তু চিদাকার; তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য নিত্য বলিয়া যেমন তাঁহার এই চিদাকার বা চিদ্দেহও নিত্য-সিদ্ধ, সেইরূপ জীবও স্বতন্ত্র বা Person বলিয়া যেমন নিরাকার নহে কিন্তু চিদাকার, আর এই স্বাতন্ত্র্য নিত্য বলিয়া, জীবেরও একটা নিত্যসিদ্ধ দেহ বা আকার অবশ্যই আছে। এই নিত্যসিদ্ধ চিদ্দেহেতেই জীব ভগবানের নিত্য-দাস। আর এই নিত্যসিদ্ধ দেহের আশ্রয়েই জীব অনন্তকাল ভগবানের সেবা ও ভজনা করিবে। স্বতন্ত্র ঈশ্বরে বা Personal Godএ যাঁরা বিশ্বাস করেন; মুক্তিতে জীব ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়, এ সিদ্ধান্ত যাঁরা মানেন না, যাঁরা বলেন - জীব অনন্তকাল ঈশ্বরের সেবা করিবে,—জ্ঞান-প্রেম-ও-কর্ম্ম-যোগে তাঁহার সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া থাকিবে; তাঁদের পক্ষে, আপনাদের সিদ্ধান্তের সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে, জীবেরও নিত্যসিদ্ধ দেহ আছে, এই কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। তবে যাদের কোনও সিদ্ধান্ত নাই, কেবল কতকগুলি অজীর্ণ মতবাদ মাত্র আছে, কিম্বা অনুভূতি নাই, অনুভবের প্রয়াসও নাই, কেবল গতানুগতিক একটা বিশ্বাস মাত্র আছে,—তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা কি মানে বা না মানে, তার বিচার হয় না। যেখানে অনুভবও নাই, সদ্‌যুক্তিও নাই, আছে কেবল খেয়াল বা হটকারিতা সেখানে বিচারেরই বা অবকাশ কৈ?

জীব জন্মিতেছে—আমরা দেখি। কিন্তু জীব জন্মায় কোথা হইতে, এই প্রশ্নের বিচার করি না। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না। জন্ম বলিতে যদি দেহধারণই বুঝি, তাহা হইলেও যে বীজ হইতে জীব-দেহ উৎপন্ন হয়, সেই বীজের মধ্যেই এই দেহের একটা স্বরূপ বা নিত্যসিদ্ধ রূপ নিহিত ছিল, ইহা স্বীকার

করিতেই হয়। বটবীজে সমগ্র, পরিপূর্ণ, বটবৃক্ষ লুকাইয়া ছিল, অনুকূল আধার ও আবেষ্টন বা Environments এর প্রভাবে তাহাই বৃক্ষরূপে প্রকট ও পরিণত—manifested এবং evolved হইতেছে,—একথা আস্তিক নাস্তিক নির্ব্বিশেষে সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। আধুনিক জীবতত্ত্ব বা বাওলজি (Biology) পর্য্যন্ত এই কথা অস্বীকার করিতে পারে না। আর বটবীজের মধ্যে বটগাছের যে পরিপূর্ণ আদর্শটি নিহিত থাকে, তাহাই বটগাছের নিত্যসিদ্ধ দেহ। ঐ নিত্যসিদ্ধ দেহ-লাভেই বটগাছের পরিপূর্ণ সার্থকতা। তাহাই বটগাছের "মুক্তি"। এই ভাবে দেখিলে কেবল মানুষেরই মুক্তি হয়, এমন বলা যায় না; বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর একটা পরম সার্থকতা বা মুক্তি আছে, বিশ্বের পরিণাম বা ক্রমবিকাশ-ধারা ঐ লক্ষ্য মুখেই অবিরাম ছুটিতেছে, ঐটি না পাইলে বিশ্বের কোনও বস্তুর শান্তি ও বিরাম নাই— কোনও বস্তুর জীবন-সংগ্রামের অবসান হয় না—এ সকল কথাই মানিতে হয়। জড় চেতনাদির ভেদ-জ্ঞান লোপ পাইয়া, তখন মৃৎ ও চিৎ এক হইয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র প্রাণের খেলা, জীবনের লীলা, চৈতন্যের অভিব্যক্তি দেখিয়া, চিত্ত বিস্ময়ে, আনন্দে, প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

জীবের জন্মের মূলে তার একটা বীজ অবশ্যই আছে। জীব জন্মকালে যে দেহ-ধারণ করে, জন্মের পূর্ব্ব হইতেই সেই বীজদেহ তার থাকে, সেই দেহই জীব ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়;—জন্মকর্ম্মের বিচার ও চিন্তা করিয়া, এই সিদ্ধান্তেই পৌছিতে হয়। আমাদের প্রাচীনেরা এ সকল বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন বলিয়া—জীব জন্ম-কালে যে দেহ ধারণ করে, জন্মের পূর্ব্বে তার সে দেহ ছিল না, শূন্য হইতে হঠাৎ সে দেহের প্রকাশ হইয়াছে, এ কল্পনা কখনও করেন নাই।

জীবমাত্রেরই একটা নিত্যসিদ্ধ দেহ আছে। এই নিত্যসিদ্ধ দেহ, সংসার-প্রবাহে প্রচ্ছন্ন থাকে, নিত্য-ধামে বা ভগবদ্ধামে নিত্য প্রকট আছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শিখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

"যথা বাঁধ—যথা।"

"যথা আবার কি?"

"জান না? যাকে সাধু ভাষায় বলে 'যূথ' কি 'যৌথ', এই যে তোমাদের কবিরা আজন্ম 'যূথভ্রষ্টা' হরিণীর উপমা দিয়ে আস্ছেন, ব্যবসায়িক লেথকেরা আজকাল সংস্কৃত অভিধান খুঁজে খুঁজে যৌথ কারবারের দোহাই মাতিয়ে তুলেছেন, পশ্চিমে তাকেই আপামর সাধারণে ব'লে থাকে 'যথা'। 'যূথ' আর 'যৌথ'র চেয়ে 'যথার' ভিতর একটা জোর আছে। সেই জোরটা আমি বাংলায় আর বাঙালীর ভিতর চালাতে চাই। আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথায়বার্ত্তায়, সভামঞ্চে বাঙ্গলা বক্তৃতা দেবার সময়, মাসিকে, দৈনিকে, সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ লিথ্তে ব'সে সব জায়গাতেই 'যথা' কথাটা ঢোকাব স্থির ক'রেছি। এমনি ক'রে ক'রে এর মর্ম্মগত ভাবটা বাঙালীর রক্তে ও কাজে ফুটে উঠ্বে।"

"তা যেন হ'ল, এথন এস্থলে করা কি যায়? বিনোদকে এথন শক্রদের চক্রান্ত থেকে বাঁচান যায় কেমন ক'রে?"

"বিনোদকে বাঁচানব জন্যেই ত বল্‌ছি। দলের বিরুদ্ধে একা কেউ কথন লড়ে জেতে নি, দলের বিরুদ্ধে দল বেঁধে লড়া চাই, সঙ্ঘর বিরুদ্ধে সঙ্ঘ চাই। পঞ্জাবের আর্য্যসমাজকে আমি এই জন্যে বড় ভক্তি করি, ওবা যথাবাদী। "সত্যার্থ প্রকাশ" আমি প্রায়ই পড়ি। দয়ানন্দ স্বামী দেখিয়েছেন, যম নিয়মাদিকে সত্য, অহিংসা, অস্তেয় প্রবৃত্তিকে আর্য্যরা গৌণ ধর্ম্ম ব'লে জান্‌তেন, তাঁরা আপনাদের সমাজ রক্ষাই মুথ্য ধর্ম্ম জান্‌তেন, সেই সমাজরক্ষার জন্যে 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' এই মন্ত্রকে মুখ্যমন্ত্র মুথ্য উপদেশ ব'লে চিনেছিলেন ও প্রচার ক'রেছিলেন। আজকালকার আর্য্য সমাজীরাও তাই করছে। আমাদেরও এ স্থলে তাই কর্ত্তে হবে।"

জমিদার বিনোদেন্দু রায়ের বৈঠকথানায় চারি বন্ধুর কথোপকথন হইতেছিল। প্রধান বক্তা বাগ্মী ও বেঙ্গল কৌন্সিলের মেম্বর নরেশচন্দ্র নিয়োগী। এবার তাঁর মেম্বরশিপ লইয়া কিছু গোল বাধিয়াছিল। একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী থাড়া হইয়াছিলেন। এ সঙ্কটে বিনোদেন্দু রায়ের সাহায্যে তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বিনোদেন্দু মনোহরগঞ্জের মস্ত বড় জমিদার। বছর দশেক হইতে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। মিষ্টভাষে, সদালাপে ও সদাচারে সর্ব্বলোকপ্রিয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিনোদেন্দু রায়ের প্রতিপত্তি নরেশের পাব্লিক লাইফে অনেক সময় অনেক কাজ দিয়াছে। কিন্তু সে সংবাদ সর্ব্বজনবিদিত ছিল না। এবার কৌন্সিলের মেম্বরশিপের ঝগড়ায় বিনোদেন্দু যে নরেশ নিয়োগীর পক্ষের লোক এ কথা লোকগোচর হইয়া গেল।

পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী যে সে লোক নহেন, তিনি কালীচকের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা।

রতিকান্ত বাঁড়ুয্যে বিনোদের বাল্যবন্ধু, হাইকোর্টের উকীল, নরেশের কথার জবাবে তিনি বলিলেন,—'সত্যার্থ প্রকাশ' ত আমিও প'ড়েছি, কিন্তু আমি ত তার ভিতর এ তত্ত্ব পাই নি। যা হোক্, দল কি আমাদের নেই? বিনোদের বন্ধু সংখ্যা কি কমী? দল বেঁধে লড়্তে বিনোদ কি পারেন না? কিন্তু বিনোদের বন্ধুদের অসুবিধে এই যে, তারা ভদ্রলোক, মহেন্দ্রনারায়ণের লোকদের মত বিবেকহীন নয়, তারা কোন নীচতার আশ্রয় নিতে পারে না। এ দিকে রাজার লোকেরা শত্রুর সর্ব্বনাশের জন্যে এমন জঘন্য উপায় নেই, এমন কোন নীচতা নেই, এমন কোন মিথ্যা নেই যা অবলম্বন কর্‌তে ছেড়েছে বা ছাড়্বে।"

"রতিকান্ত বাবু এ অকর্ম্মণ্য লোকের নালিশ, দুর্ব্বলের জবান, অক্ষমের আত্মোক্তি।"

"সে কি রকম?"

"বিবেক শব্দটা যথাবাদীর অভিধান থেকে ছেঁটে ফেল্‌তে হবে। যথা পালন আমাদের ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মরক্ষার জন্য সত্যদলন, মিথ্যাপোষণ যখন যেটা দরকার পড়্বে তাই কর্ত্তে হবে। আজ জার্ম্মাণীর কাছে বাকী সব য়ুরোপ এত মার খাচ্ছে কেন? জার্ম্মাণ এই যথাধর্ম্ম চূড়ান্তরূপে আয়ত্ত করেছে, য়ুরোপের বাকী জাতেরা এখনও তাতে ঢের কাঁচা আছে। নিজের অস্তিত্বর জন্যে যথার অস্তিত্ব চাই, যথার অস্তিত্বর জন্যে সত্য মিথ্যা দুটোকেই গোলামীতে বহাল রাখা চাই।"

রতিকান্ত বাবু গরম হইয়া জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়া উদীয়মান কবি সুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত হো হো করিয়া হাসিয়া, কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলভরা মাথা হেলাইয়া বলিল,—

"বেশ যা হোক্। রতিকান্ত বাবু আপনি দেখ্ছেন না নরেশ বাবু মনের দুঃখে ব্যঙ্গ করে সব কথাগুল বল্ছেন, এ কি আর ওঁর সত্যিকার মনের ভাব যে, আপনি রীতিমত খণ্ডন কর্‌তে উদ্যত হচ্ছেন?"

নরেশ বলিল,—"সুধীন্দ্র তোমার নিতান্ত ভুল, আমি মোটেই ব্যঙ্গ কর্‌ছিনে।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বল্‌ছি। কথাগুলো একেবারে নিছোক সত্য বলে জেনো। ধর্ম্ম অধর্ম্মের পুরোণ সংস্কার উল্টেপাল্টে বদ্‌লে দেখ্‌তে হবে আমাদের।"

নৃপেন দত্ত এতক্ষণ চুপ করিয়া একপাশে বসিয়া শুনিতেছিল। বিনোদেন্দু রায়ের অতি বড় ভক্ত সে। মুখে বেশী কথা নাই, কিন্তু বিনোদেন্দুর বিপদে অন্তর্দ্দাহে জ্বলিতেছে। নরেশ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, নৃপেন গা ঝাঁকা দিয়া উঠিল, নরেশের সাম্‌নে আসিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"নরেশ বাবু, যথেষ্ট! যে পড়াটা এতক্ষণ ধরে পড়ালেন, বেশ ভাল করে মাথায় প্রবেশ করেছে। আমি আপনার ছাত্রত্ব স্বীকার কর্‌লুম। এখন কি কর্ত্তে হবে বলুন। যথাব চার জন ত আমরা এখানেই উপস্থিত! এখন সত্য মিথ্যা, নীচতা উচ্চতার ভাগ করে দিন। আমার জন্যে নীচতা ও মিথ্যা রাখবেন, রতিকান্ত বাবু ও সুধীন্দ্রকে সত্য ও উচ্চতা দেবেন।"

সুধীন্দ্র মুচ্‌কে হাসিয়া বলিল,—"আর নবেশ বাবু নিজে কি নেবেন?"

নৃপেন উত্তর করিল—"উনি আমাদের নেতা, যথাপতি, সুতরাং মিথ্যার রাজ-অংশ উনি গ্রহণ কর্‌বেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেওয়ান রমাকান্ত রাজা মহেন্দ্রনারায়ণকে বুঝাইল, শত্রুতা চরিতার্থের এমন মাহেন্দ্রক্ষণ ছশো বছরে আর যুটিবে কি না সন্দেহ। য়ুরোপে কুরুক্ষেত্র, ব্রিটিশরাজ্যে হুলস্থূল, সাম্রাজ্য-রক্ষাকারীদের চিত্তবিপ্লবে বুদ্ধি-বিভ্রাট, স্পেশাল ট্রিবিউন্যাল, ডিফেন্স-অব্‌-ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট,—তাব উপব হতভাগা ছোঁড়াগুলোর অবিরাম পাপাচার—ডাকাতী ও খুন,—এই কটা উপকরণ মিলাইয়া শত্রুব সর্ব্বনাশ সাধনের একটা অব্যর্থ টোট্‌কাও যদি গড়িয়া তুলিতে না পারে, তবে বৃথাই রমাকান্তের দেওয়ান—জন্মধারণ। শুধু যে প্রভুভক্তি বশতঃই রমাকান্ত এই কার্য্যে ব্রতী হইল তাহা নহে। পূর্ব্ব প্রভুর প্রতি কৃতঘ্নতার প্রবল বাসনা তাহাকে বৎসরাবধি দগ্ধ করিতেছিল। মনোহরগঞ্জের জমিদারী কাছারীতে নায়েবী কালে তহবিল ভাঙ্গার অপরাধে রমাকান্ত ধরা পড়ে। কিন্তু রমাকান্ত পরলোকগত প্রাচীন দেওয়ান কমলাকান্তের পুত্র, শৈশবে বিনোদেন্দু রমাকান্তের সঙ্গে একত্রে খেলা করিয়াছেন, গ্রাম্যস্কুলে একত্রে পাঠ করিয়াছেন। বাল্য সহপাঠী, চাকর হইলেও এবং অপরাধী হইলেও বিনোদ তাহাকে চাকরের ন্যায় দেখিতে পারিলেন না এবং অপরাধীর ন্যায় শাস্তি দিতে পারিলেন না। তাহার চাকরী বহাল রহিল এবং তহবিল ভাঙ্গার কথাটাও সাধ্যমত ঢাকা দিয়া রাখিলেন। শেষে গত বৎসর একটা জুগুপ্সাজনক ব্যাপারে গ্রামশুদ্ধ লোক তাহার বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহাকে আর রাখিতে

পারিলেন না, বাধ্য হইয়া ছাড়াইলেন। গ্রামের লোকেরা ধর্ম্মনষ্ট করিয়া তাকে তাড়াইল, কিন্তু রমাকান্তের রাগের লক্ষ্য বিনোদেন্দু একাই রহিলেন।

মনোহরগঞ্জের কাছারী হইতে বরখাস্ত হইয়া রমাকান্ত পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার মহেন্দ্র-নারায়ণের নিকট গিয়া যুটিল। এ পর্য্যন্ত মহেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বিনোদেন্দুর কোন অপ্রণয় ছিল না। কিন্তু রমাকান্ত সেখানে দাখিল হওয়ার পর হইতেই ছোট ছোট উৎপাত আরম্ভ হইল। বিনোদেন্দু ভাবিলেন, এ রকম আঁচড়টা-আসটা জমিদারের জীবনের নিত্য সঙ্গী, এত দিন ছিল না যে তাই আশ্চর্য্য, এখন যে দেখা দিয়াছে তাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার বেশী কারণ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদেন্দুর স্ত্রী নির্ম্মলার হঠাৎ যক্ষ্মাকাশ দেখা দিল। ডাক্তারের আদেশে বিনোদ নির্ম্মলাকে লইয়া করাচী গেলেন। করাচীর হাওয়া-বন্দরে একটা প্রকাণ্ড বাঙ্গলায় দাসদাসী পরিবৃত দম্পতি ছয়মাস যাপন করিলেন। কাছাকাছি আর কোন বাঙ্গলা নাই, কোন লোকজন নাই। করাচীর একজন প্রসিদ্ধ গোয়ানীজ ডাক্তার দিনান্তে প্রতিদিন নির্ম্মলাকে একবার দেখিতে আসেন আর দৈবাৎ কখন কোন দিন সহর হইতে সিন্ধী শেঠ তুলারাম সস্ত্রীক দেখা করিতে আসেন।

সমুদ্রে স্নান, সারাদিন খোলা হাওয়ায় যাপন, নিক্তির ওজনে পথ্য সেবন সবই চলিল। কিন্তু নির্ম্মলার ওজন দিন দিন কমিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় নির্ম্মলা প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। স্বামী বুঝিলেন, এ চাঁদ অনন্তে লীন হইয়া যাইবে, একে ধরিয়া রাখা যাইবে না। হাওয়া-বন্দরে হাওয়ার বিশ্রাম নাই। এক এক রাত্রে সমুদ্র গর্জ্জনের সঙ্গে হাওয়ার গর্জ্জন মিশ্রিত হইয়া এক আতঙ্কর শব্দ উত্থিত করে। নির্ম্মলা ভয় পায়, স্বামীকে বলে, "দেশে ফিরে চল, সেখানে কি যেন অমঙ্গলের রচনা হচ্ছে মনে হয়।" বিনোদ মনে মনে ভাবে নির্ম্মলাকে হারাইতে বসিয়াছে, এর ছাড়া অমঙ্গল আর কি হইতে পারে? সে অমঙ্গলের রচনা ত এখানেই চলিতেছে, তার দরুণ দেশে ফিরিয়া কি রক্ষা হইবে? যতদিন এখানে থাকে ততদিন বরঞ্চ রক্ষা আছে, দেশে পা ফেলিতে না ফেলিতে সে চলিয়া যাইবে। তাহাই হইল। নির্ম্মলা আর প্রবাসে থাকিতে চাহিল না। তাহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আনা হইল। সপ্তাহের মধ্যে বিনোদেন্দুর গৃহ শূন্য হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাচনের দিন প্রায় সমাগত। নরেশ নিয়োগী দিন পনের ধরিয়া বিনোদেন্দুকে লইয়া তার মোটরে সারাদিন সহর ও সহরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই, লোকের বাড়ী ভোট ভিক্ষা করিতে উপস্থিত। কোন কোন স্থলে নরেশ নিজে যান না, বিনোদকে একা পাঠাইয়া দেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ ও নরেশ নিয়োগীতে তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। কার তীর লাগিয়া যায় এখনও বলা যায় না, দুজনেই সমান ক্ষিপ্রহস্ত, দুইজনেই মহারথী। কিন্তু নরেশই জিতিলেন। মহেন্দ্রনারায়ণের তীর কাণের কাছ দিয়া গেল, লক্ষ্য বিঁধিল না। নরেশ বিনোদেন্দুকে কৃষ্ণ-সারথি করিয়া জয়ী হইলেন। তখন রমাকান্তের পরামর্শে মহেন্দ্রনারায়ণ আর এক লক্ষ্য ভেদের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ইলেক্‌শনের জন্য সুপারিশের উত্তেজনা যখন থামিয়া গেল, বিনোদ দেহ মনে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলা হারাণর ক্ষত শুকায় নাই, চাপা ছিল। নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেই একটা শূন্যতা তাঁহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। আর সেই শূন্যতার কেন্দ্রস্থলে যেন কি এক গাঢ় অন্ধকার। এক এক রাত্রে মনে হয়, সেই অন্ধকারের মধ্যে কিরীচের মত কি যেন ঝক্‌মক্ করিতেছে, যেন ঠিক তাঁর মাথার উপর ঝুলিতেছে, যেন এই পড়ে পড়ে। কোন কোন রাত্রে হাওয়া-বন্দরের সেই হাওয়ার গর্জ্জন অবিরাম কাণে প্রতিধ্বনিত হয়, সেই সঙ্গে নির্ম্মলার ভয়োক্তিও প্রবাহিত হইয়া আসে—"ওগো কি যেন অমঙ্গলের রচনা হচ্ছে।"

একদিন সারারাত্রি অনিদ্রার পর ভোরবেলায় ঘুমাইয়া পড়ায় বিনোদেন্দুর বাহিরে আসিতে একটু বিলম্ব হইল। বৈঠকখানার দিকে যাইতেই শিখ প্রতিহারী অর্জ্জুন সিং বন্দেগি করিয়া বলিল, "সাচ্চা পাদশা! কমিশনর বাহাদরকা চাপ্‌রাসী বহুৎ দেরসে ইন্তজার কর্ রহা। কহতা হায়, হজুরইকা হাথমে চিট্টি দেনি হায়, ঔর কিসিকো নেহি"।

"বোলাও"।

লাল চাপকান্ পরা চাপ্‌রাসী আসিয়া সেলাম করিয়া, বিনোদেন্দুর হাতে শীল মোহর করা এক লম্বা লেফাফা দিল। বিনোদেন্দু দেখিলেন, উহা পুলিশ কমিশনের দপ্তর হইতে আসিতেছে। একটু কুতুহলী ও একটু উদ্বিগ্ন হইয়া লেফাফা খুলিয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরলাদেবী।

রাজা রামমোহন রায়ের

"তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন"

রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার সংস্কারে হাত দিবার কিছু কাল অ'গে, সম্ভবতঃ যখন রঙ্গপুরে বাস করিতেন, তখন 'তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করেন। গ্রন্থের ভূমিকা আরবী ভাষায়, আর ফারসী ভাষায় তাহার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, কেননা আজাম প্রদেশের অধিবাসিগণ ওই ভাসা বেশী বুঝিতে পারে। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবুর অনুরোধে মৌলবী ওবায়েদ উল্লা মহোদয় এই গ্রন্থ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর অশেষ উপকার করিয়াছেন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ব্রাহ্ম সাধারণগণ গত এক শতাব্দীরও বেশী এই গ্রন্থেব বাঙ্গালা অনুবাদের কোন প্রয়োজনই দেখেন নাই, অথচ এই গ্রন্থ লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নানা বিরোধী মতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিরোধী দলের পরস্পর মতের বিভিন্নতার মাঝে একদল বলেন যে, ইহাই রাজা রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাঁহারা আরো বলেন যে, রাজা শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারা একেশ্বরবাদের প্রমাণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে আবার কেমন করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, সেই একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য তো বটেই বরং দুঃখের কথা এই যে, 'তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীনের' অত্যুন্নত যুক্তিবাদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, রাজা শাস্ত্রালোচনার কালে তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের অধিকতম উন্নতিশীলদল এই গ্রন্থের যুক্তিবাদকেই ধর্ম্ম-সংস্থাপনের ভিত্তি করিয়া, রাজা পরবর্ত্তী যে শাস্ত্রমীমাংসা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আর একদল বলেন, ইহা রাজার মানসিক ইতিহাসের একটা ধাপমাত্র, রাজা এই যুক্তিবাদ ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত—এই গ্রন্থ রচনার সময়ে রাজার মনের ও

জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নাই, পরবর্ত্তীকালে শাস্ত্রমীমাংসায় যাহার পূর্ণ-প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতবাদের উভয় দলের অভিমত সম্বন্ধেই আমরা কোন বিশেষ বিচার না করিয়া, বাঙ্গালী পাঠকের মধ্যে ইহার বিস্তৃত আলোচনার জন্যই ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। অনেক ব্রাহ্মসাহিত্যিকগণ এমনও বলেন যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অল্পবয়সে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া ধর্ম্মজীবনের বিকাশে তাঁহাদের উভয়েরই অনেক বিভিন্নতা ও মতান্তর দেখা গিয়াছিল, কিন্তু রামমোহন রায়ের তাহা হয় নাই। আমরা কিন্তু দেখিতেছি ও পরস্পরবিরোধী দুই দলের উক্তিতে ইহাই বুঝিতেছি যে, রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা-জীবনের ইতিহাসে উন্নতি ও অবনতির বিরাম ও অবসর আছে।

আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস যে, রাজা রামমোহনের গ্রন্থাদি ও তাঁহার অদ্ভুত জীবনের ঘটনাবলীর যথাযথ আলোচনা বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পই হইয়াছে।

অনেক ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর মতে বর্ত্তমান যুগ—রামমোহন যুগ। সেই জন্য রাজা রামমোহনের জীবন ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সকল বিষয়েই বিশেষ-রূপে আলোচনা হওয়া উচিত। বর্ত্তমান যুগ বাঙ্গালীর কাছে এক মহা সমস্যার মত দাঁড়াইয়াছে। এই যুগের যে বিশিষ্ট সাধনা, তাহার সঙ্গে বাঙ্গালীর প্রাণের যোগ আছে, কি নাই, কি কতটা আছে, আজ তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

নারায়ণ সম্পাদক।

ভূমিকা

পৃথিবীর শেষ সীমান্তের দেশ পর্য্যন্ত কি সমতল ভূমিতে, কি পার্ব্বত্য প্রদেশে সর্ব্বত্রই আমি ভ্রমণ করিয়াছি। এবং দেখিলাম যে, তৎ তৎ প্রদেশের যাবদীয় অধিবাসিগণ সাধারণতঃ এক পরম পুরুষে—যিনি সকল সৃষ্টির মূলাধার ও বিশ্বের বিধাতা তাঁহার সেই অস্তিত্বের বিশ্বাস সম্বন্ধে একমত। এবং কেহ কেহ সেই পরম পুরুষকে নানা বিশিষ্ট গুণে ভূষিত কবিতে অন্য মত হয়েন। আবার কেহ কেহ হারাম (নিষিদ্ধ) ও হালালের (বিধিনিষিদ্ধ আইন) মতে ধর্ম্মের যে উপদেশ তাহাতেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভুক্ত। এই উন্নয়নাত্মক অনুমান হইতে আমি ইহা জ্ঞাত হইয়াছি যে, এক অব্যয় পুরুষের প্রতি মনের যে সাধারণ গতি, তাহা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং তাহা সমগ্র ব্যক্তির মধ্যেই সমভাবেই বর্ত্তিয়া আছে। এবং মানবের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভিতর কোন এক বিশিষ্ট দেবতা বা দেবতাসকলের প্রতি এই যে আকর্ষণ, কাহাকেও বা কোন বিশিষ্ট গুণে ভূষিত করা অথবা কোন বিশেষ পদ্ধতিতে পূজা বা ভক্তি করা এবম্বিধ যে আচার ও ইচ্ছা তাহা জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষেব অভ্যাস ও শিক্ষাব ফলে গুণবাহুল্য স্বরূপে উদ্ভব ও প্রকাশ পাইয়া থাকে। অভ্যাস ও স্বভাবেব মধ্যে কি বিশাল পার্থক্য! কোন কোন সাম্প্রদায়িকেরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেব বাক্যেব সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মতেব সহিত নিজেদেব মতদ্বৈধ হওনে তাহাদের বিরুদ্ধ ধর্ম্মমতকে খণ্ডন কবিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। যদিচ তাহাদের সেই পূর্ব্বপুরুষেরাও সাধারণ মানবের মতই ভুল ভ্রান্তি ও পাপকর্ম্মের অধীন ছিলেন। সুতরাং এমত হয় যে, এই সকল সাম্প্রদায়িকেরাই (নিজ নিজ ধর্ম্মের মতবাদের সত্য প্রতিষ্ঠার অজুহাতে) হয় তাহারা (তত্ত্বব্যাখ্যায়) সত্যবাদী, নয় অপবাদী হইয়া পড়েন। পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করিলে দুই বিরুদ্ধ মতবাদের একত্র সমাবেশ হয় (যাহা ন্যায়মতে অস্বীকার্য্য)। এবং উত্তর পক্ষে কোন ধর্ম্মমত বিশেষে অথবা সাধারণতঃ সকল মতবাদেই মিথ্যাত্ব আরোপ করিতে হয়। প্রথম পক্ষে হইল তর্‌জি বিলা মুরাঝে অর্থাৎ বিনা কারণে তাহাকে প্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। (ইহাও ন্যায়মতে অস্বীকার্য্য) অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল ধর্ম্মমতেই ভেদ বুদ্ধি ব্যতিরেকে এই মিথ্যাত্ব আরোপ সাধারণতই বিদ্যমান হয়। ইহাই অর্থাৎ (আমার এই মতবাদ) আমি পারস্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছি। যেহেতু এই ভাষা আজাম (অর্থাৎ অনা-আরব্য জাতি সকল) প্রদেশের অধিবাসীদিগ্যের নিকট অধিক বোধগম্য হয়।

তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন বা ঈশ্বরবাদীদিগের জন্য দান

যাঁহারা মানবের অভ্যাস ও সচরাচর সঙ্গজনিত যে অবস্থা তাহার সহিত মানবের মধ্যে তাহার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাজনিত ফলে যে সকল ভিতরের স্বাভাবিক গুণজ অবস্থার পার্থক্য বিচার করিতে যত্নতঃ সক্ষম হয়েন এবং যাঁহারা কোন সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির পক্ষপাতিত্ব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সত্যাসত্য নিরূপণে অনুসন্ধিৎসু হইয়া প্রাণপণ যত্নবান হয়েন এবং সেই সকল সর্ব্বজন স্বীকৃত মতবিধি যে সকল লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, যাঁহারা খুব তীক্ষ্ণ ভাবে তাহার পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই সুখে কালহরণ করেন। কারণ পরস্পর বিভিন্ন কার্য্যের জন্য সৃষ্টবস্তুর স্বভাবের সত্য ধারণা করা এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের তারতম্য ও তাহাদের প্রচ্ছন্ন ফলের (উভয়েই যাহা মানবের পরিপূর্ণতার বিশিষ্ট অঙ্গসমূহ) জ্ঞান লাভ করা উভয়েই অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। তথাপি, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অধিকাংশ নেতারা তাহাদের নাম ও যশোলিপ্সার জন্য ধর্ম্মবিশ্বাসের কতিপয় মতবাদ উদ্ভাবন করিয়া, অপ্রাকৃতিক অনৈসর্গিক কর্ম্মের ছলনার দোহাই দিয়া, বা ভাষার বা গলার জোরে অথবা সমসাময়িকদের অবস্থাবৈগুণ্যের সুবিধামত ব্যবস্থা বা বিধিনিষেধাত্মক উপায় দ্বারা সেই ধর্ম্মমত সকলকে সত্যরূপে প্রচার করিয়াছেন। এবং এইরূপে বহুসংখ্যক জনসাধারণকে তাহাদের কথা মানিতে এবম্বিধ রূপে বাধ্য করিয়াছেন যে, এই সকল দুর্ভাগ্য মানবগণকে আপনাপন বিবেকের বাণী ভুলিয়া, অন্ধের ন্যায় তাহাদের ধর্ম্মনেতৃগণের অনুসরণে বদ্ধ করিতে এবং সত্য ধর্ম্মনীতি ও প্রত্যক্ষ পাপের মধ্যে প্রভেদ বিচার করিয়া, তাহাদের ধর্ম্মগুরুর আদেশ প্রতিপালন করা মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করে। তাহাদের ধর্ম্ম ও বিশ্বাসে আস্থা থাকার জন্য, এমন কি হত্যা, পরস্বাহরণ ও পরপীড়নাদি জঘন্য ক্রিয়াগুলিকেও মহান্ ধর্ম্মের কার্য্য ও অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করে, যদিচ তাহারা এক জাতি বা এক পিতামাতার সন্তান হয়, অপিচ তাহাদের সেই পারমার্থিক গুরুর বা ধর্ম্মনেতার উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনজনিত যে সংস্কার তাহাকেই,— মিথ্যা কথন, বিশ্বাসঘাতকতা, চৌর্য্যবৃত্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি যে সমস্ত ঘৃণ্য অপকর্ম্ম, যাহা কি পারলৌকিক, কি সামাজিক জীবনে নিতান্ত অনিষ্টকর — তাহাকেই—সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তির হেতুরূপে মনে করে, ও নানাবিধ অসম্ভব কাহিনী ও পৌরাণিকী কথা পাঠ ও জল্পনা করিয়া, তাহাদের বহুমূল্য সময় ক্ষেপণ করে এবং যাহা তাহাদের পূর্ব্বতন ধর্ম্মগুরু ও বর্ত্তমান ধর্ম্মধ্বজীপ্রচারকদের উপর বিশ্বাসের ভিত্তিকে উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করিয়া থাকে। যদি বা ঘটনাচক্রে কেহর

মন সুস্থ ও বিচার বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত থাকা নিবন্ধন শক্তিবান হয়; তাহার আচরিত ও অনুষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে জানিবার উৎকণ্ঠা বা ইচ্ছা হয়, তিনি পুনরায় ধর্ম্মমতানুসরণকারীদিগের অভ্যাসমত, সেই ইচ্ছাকে শয়তানের প্ররোচনার ফলস্বরূপ মনে করেন, এবং তাহা, কি ইহ কি পরলোকে নিজের ধ্বংসের কারণ বিবেচনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে বিরত রহেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই শৈশবে, যখন তাহার মনোবৃত্তিগুলি যে সমস্ত ভাব তাহার কাছে আসিত, তাহা গ্রহণ করিতে স্বতঃই ও সহজেই উপযোগী ছিল, সেই সময় হইতে, আত্মীয় কুটুম্ব ও প্রতিবেশিগণ, যাহাদিগের মধ্যে তিনি জন্ম শিক্ষা ও ধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বতন ধর্ম্মগুরুদিগের অদ্ভুত ও অসম্ভব কাহিনী শুনিয়া এবং স্বজাতির মধ্যে প্রতিপালিত ধর্ম্মমতের সুফলের কথা শুনিয়া, স্বধর্ম্ম মতবাদে এমনই দৃঢবিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন যে, তিনি আপন মতবাদের অধিকাংশ স্পষ্টতই অযৌক্তিক ও নিরর্থক হইলেও তিনি তাঁহার সেই গৃহীত ধর্ম্মবিশ্বাসকে কদাপি ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি অপরাপর মতবাদ অপেক্ষায় আপন ধর্ম্মমতকে শিশেবরূপে পছন্দ করিয়া থাকেন, এবং প্রচলিত আচার ও আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধের ধারা পালন করিয়া চলেন, এবং দিন দিন তাহাতেই আরও দৃঢভাবে অনুরক্ত হইয়া রহেন। অতএব ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য কোন ধর্ম্মমতবিশেষে এইরূপ দৃঢ বিশ্বাস স্থাপন করিলে পর তাহার সুস্থ মন পুস্তক হইতে অধীত ও গৃহীত জ্ঞান ও বিদ্যায় পুষ্ট হইয়া পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত্যন্তর, বহু বৎসরের প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রগুলির সত্যাসত্য নিরাকরণ করিবার অনিচ্ছাবশতঃ প্রকৃত নিগূঢ় তথ্য আবিষ্কার করণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়। পরং সেই ব্যক্তিই কখন কখন নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে তথাকথিত যুক্তি ও প্রচলিত সংস্কারকে ভিত্তি করিয়া, মুজতাহিদ বা ধর্ম্মসূত্র ব্যাখ্যানকর্ত্তার—সম্মান অর্জ্জন করিবার আশয়ে নূতন নূতন যুক্তিতর্কের সৃষ্টি ও অবতারণা করিয়া, তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসের নীতিগুলিকে আরো দৃঢ় করিবার জন্য নিতান্ত উদ্‌গ্রীব হয়েন। এদিকে যাহারা মুকালিদ্ বা সাধারণ নিরক্ষর ব্যক্তির দল, অন্ধ অনুকরণে সেই ধন্দ অনুসরণ করিয়া, প্রবাদ কথায় যেমন আছে যে, "কুক্ দিলে পাগল নাচিয়া উঠে" সেইমত, যাহারা সর্ব্বদাই পরের ধর্ম্মাপেক্ষা নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠত্ব দান ও প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহারা সেই সকল বৃথা মিথ্যা তর্কযুক্তিগুলিকে বিচারের ভূমি সৃষ্টি করিয়া নিজেদের ধর্ম্মের বড়াই করে, এবং অন্যের ধর্ম্মের ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যদিস্যাৎ দৈববশতঃ কখন কেহ, তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসের সূত্রসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন প্রশ্ন করে, তখন তাহার সমধর্ম্মীরা যাহাদের ক্ষমতা থাকে, তাহারা সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বর্ষার জিহ্বা ফলকে নিক্ষেপ করে, (অর্থাৎ

হত্যা করে) এবং যেখানে সেই বর্ষামুখে নিক্ষেপ করিবার সুবিধা না থাকে, সেখানে তাহাকে তাহাদের জিহ্বার ক্ষুর ধারায় নিক্ষেপ করে, (অর্থাৎ তিরস্কার ও লাঞ্ছনার ভারে তাহাকে পিষিয়া মারে। এই সকল ধর্ম্মানুসরণকারীদিগের উপর ধর্ম্মনেতাদিগের এমনই প্রভাব এবং তাহাদের প্রতি যে বাধ্যতা তাহা এমন উৎকট মাত্রায় গিয়া ঠাঁই লয় যে, কত শত ব্যক্তি তাহাদের ধর্ম্মগুরুর উপদেশাদির উপর দৃঢ়বিশ্বাস পরায়ণ হইয়া, প্রস্তর তরু গুল্ম অথবা পশুগণকে তাহাদের উপাসনার সত্য নিত্যবস্তু-রূপে গ্রহণ করে, এবং যাহারা তাহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই পূজার্চ্চনার মূর্ত্ত বস্তুগুলিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, বা তাহার অবমাননা করে, তাহাদিগের রক্তপাত করা বা তাহার জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করাকে ধর্ম্ম, ও জগতে মহান্ গৌরবের কর্ম্ম, ও ভবিষ্যত জীবনে মোক্ষের চরম কারণ বলিয়া মনে ধারণা করে। ইহা আরও বিস্ময়কর হয় যে, মুজতাহিদেরা অর্থাৎ ঐ সকল ধর্ম্মসূত্র ব্যাখ্যাকারেরা অন্যান্য ধর্ম্মের নেতাদিগের দৃষ্টান্ত মত, ন্যায় ও সততা পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মবিশ্বাসের মতগুলির স্বপক্ষে যুক্তি ও বুদ্ধিবিচার রূপের অনুমত এমন বাক্যাবলী উদ্ভাবন করে, যাহা সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে অর্থহীন ও অসম্ভব, এবং এইরূপে যাহারা অন্তর্দৃষ্টি শূন্য ও বিচারবুদ্ধি বিহীন সাধারণ ব্যক্তি তাহাদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিবার জন্য যত্ন করে।

"আমাদিগের পাপ প্রলোভন ও আমাদিগের পাপকর্ম্ম হইতে রক্ষার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয়ের আমরা প্রার্থনা ও অনুসন্ধান করি।" *

যদি চ ইহা বস্তুতঃ সত্য, এবং তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই, যে মানবজাতি স্বভাবতঃ সামাজিক জীব ও সমাজবন্ধনে একত্র বসবাস করাই তাহাদের প্রয়োজন মত হইয়াছে, তথাপি সমাজ যেমন তদঙ্গীভূত ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের ভাব বিনিময় ও কতিপয় সামাজিক নিয়মাদির অস্তিত্ব সাপেক্ষ্য, যে নিয়ম সমূহের দ্বারা পরস্পরের বিষয় সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সূচিত হয় এবং একে অন্যের অত্যাচারাদি হইতে রক্ষিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন দেশবাসী জাতিসকল, এমন কি দূরস্থ দ্বীপবাসিগণ বা উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শিখরাধিবাসিগণ সকলেই বিশিষ্টভাবব্যঞ্জক এমন শব্দাদির উদ্ভাবন করিয়াছে, যাহা তাহাদিগের ধর্ম্মসৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ হয় ও যাহার উপর তাহাদের সমাজ সজ্জীকরণ নির্ভর করে। যেহেতু আত্মা, যাহাকে বস্তুগত্যা শরীরের নিয়ন্তৃ-রূপে অভিধা করা হয়; তাহার অস্তিত্বের বিশ্বাসের উপর ও সেই পরলোকের অস্তিত্বের বিশ্বাসের উপর (যে স্থান দেহ হইতে আত্মার পৃথক্ হইবার পর, এই পৃথিবীতে কৃত সৎ ও অসৎ কর্ম্মের ফলাফল হইবার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)—যেমন সকল

* কোরাণ হইতে উদ্ধৃত বচন।

ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সেই হেতু সমাজের কল্যাণার্থে আত্মা ও পরলোকের সত্য বাস্তব অস্তিত্ব (যদিচ ইহাদিগের প্রকৃত তথ্য গুহানিহিত ও রহস্যময়)—স্বীকার ও তৎশিক্ষা প্রদানের জন্য তাহারা (মানবজাতি) ক্ষমার্হ; কেন না, তাহারা শুধু মাত্র পরলোকে শাস্তি ভোগের ভয়ে, অপিচ সাংসারিক কর্ত্তৃত্ববিদ্ কর্ত্তাদিগের দণ্ড ভয়ে বে-আইনী কর্ম্ম হইতে বিরত রহেন। কিন্তু এই উভয় অপরিহার্য্য ধর্ম্মমতে বিশ্বাস-সহ ভোজ্য এবং পেয়, শুচিত্ব ও অশুচিত্ব, শুভাশুভত্ব বিষয়ক শত শত অপ্রয়োজনীয় দুঃখ ও ক্লেশ সহন ব্যবস্থা, সংযোজিত হইয়াছে এবং এইরূপে তাহারা সামাজিক জীবনের অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণ স্বরূপ হইয়াছে এবং তদঙ্গীভূত জনসাধারণের সামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধায়ক না হইয়া তাহাদিগের সকল অমঙ্গলের মূল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার কারণ হইয়াছে।

হা ভগবান্! (অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা) সে মুজাহিদ অর্থাৎ ভবরোগ-বৈদ্যদিগ্যের পক্ষে এবম্বিধ তীব্র, বিবিধ উৎসাহ থাকা সত্বেও মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিতে এমন এক অন্তর্গত ধীশক্তি বর্ত্তিয়া আছে যে, সুস্থচিত্তসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি যদি কোন ধর্ম্মবিশেষের মতবাদগুলি মানিয়া লইবার পূর্ব্বে অথবা পরে বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মুখ্য অথবা গৌণ মতবাদসমূহের মূলে নিহিত তথ্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে এবং ন্যায় বিচারের আশয়ে অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, তিনি অসত্য হইতে সত্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া এবং হেত্বাভাসপূর্ণ তর্কজাল হইতে তথ্য কথা চয়ন করিয়া লইতে পারিবেন, অধিকন্তু তিনি ধর্ম্মের বিধি নিষেধাত্মক সংযমাদি যাহা সময়ে সময়ে একজনের উপর আর একজনকে অযথা বিরূপ করিয়া তুলে এবং তাহাদিগের আধিব্যাধির মূলীভূত কারণে পরিণত হয়, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া সেই এক পরম পুরুষ যিনি সকল বিশ্বের সামঞ্জস্যীভূত সার্ব্বভৌমিক একাত্ম সৃষ্টির উৎস তাঁহার প্রতি ধাবমান হইবেন এবং সমাজের যাবৎ শুভকর কার্য্যের প্রতি মনঃসংযোগে যত্নবান্ হইবেন। "ঈশ্বর যাহাকে লইয়া যান (ধর্ম্মপথে) তাহাকে কেহই ভ্রান্তিতে লইয়া যাইতে পারে না এবং যে নিজে ভ্রান্তপথে যায়, তাহার অন্য কোন গুরু নাই।" *

ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিশিষ্ট ধর্ম্মের মতাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন যে যিনি সত্য স্রষ্টা তিনি এই মানবজাতিকে এক বিশেষ ধর্ম্মের মতগুলিকে মানিয়া চলার দ্বারাই ইহ পরকালের সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত গ্রথিত কর্ত্তব্যপালনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অন্য ধর্ম্মমতাবলম্বীরা, যাহারা তাহাদের ধর্ম্মানুগত বিশ্বাসের মূলসূত্রগুলি হইতে অন্যমত হয়েন তাহারা পরলোকে শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়েন। এবং যেহেতু প্রত্যেক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ই তাহাদের আপনাপন

* কোরাণের উদ্ধৃত বচন।

কৃতকর্ম্মের শুভফলের ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের কুপ্রথা জনিত পরলোকে কুফলের ধারণা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হয়েন, সেই হেতু তাহাদের মধ্যে কেহই এই জীবনের ধারায় অন্যের ধর্ম্মমতকে খণ্ডন করিতে পারে না। ফলতঃ সরলতার পরিবর্ত্তে তাহারা ঘৃণা ও পরস্পর হৃদয়ে অনৈক্য বীজই বপন করে এবং পরস্পর পরস্পরকে অমর আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত করে। যেহেতু ইহা স্পষ্টই পরিস্ফুট রহিয়াছে যে, তাহারা সকলেই বহিঃ প্রকৃতির যত কিছু আশীর্ব্বাদ (মুখ্যত আকাশ) তাহা সমভাবেই ভোগ করে যেমন সূর্য্যের আলোক, নববসন্তের আনন্দ সুখ, বৃষ্টির ধারা, শরীরের স্বাস্থ্য, বাহ্য ও অন্তরের সকল শুভ এবং জীবনের অন্যান্য ভোগসুখ; সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অসুবিধা ও বেদনা, যেমন অন্ধকারের তমগূঢ়তা, এবং শৈত্যের তীব্রতা, মানসিক ব্যাধি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্কীর্ণতা, বাহ্য ও অন্তরের অশুভ, সমভাবেই সহ্য করে, কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মমতাবলম্বী বলিয়া তাহাদের কোন পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না।

যদিচ মানবের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই, কাহার নিকট হইতে শিক্ষা ও পরিচালনা ব্যতীত, শুধু মাত্র তাহাদের তীব্র অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এবং প্রাকৃতিক রহস্যের ভিতরে গভীর অভিজ্ঞতার দ্বারা—যেমন বিভিন্ন প্রকার জীব ও উদ্ভিদনিচয়ের বিভিন্ন প্রকারে নির্দ্দিষ্ট জীবন-ধারণের ধারা, তাহাদের জীবসৃষ্টির নিয়ম; গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ভ্রমণের নিয়ম, পশুদিগের শাবক প্রতিপালনের জন্য তাহাদের আপন প্রাণের অন্তঃপ্রদেশে যে স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ, অথচ তাহাদিগের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ কোন উপকার প্রত্যাশা না রাখিয়া, যে প্রতিপালন এবং এইরূপ আরও বিবিধ প্রকার;—তাহার নিজের ভিতরে এক অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি, যাহা দ্বারা সে ইহা স্থির করিয়া লয়েন যে, এক পরম পুরুষ আছেন—যিনি (তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা) এই সমস্ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; তথাপি ইহা পরিষ্কার পড়িয়া রহিয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই যে জাতির মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে সেই জাতির ব্যক্তিত্বের অনুসরণ করিয়া এক বিশিষ্ট দেবতার অস্তিত্ব (তাহাতে বিশিষ্ট গুণযুক্ত করিয়া) প্রচার করে, এবং সেই সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ কয়েকটী মতবাদকেই অনুকরণ করিয়া চলে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যথা—তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা মনুষ্যগুণ যুক্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে,মানুষের মত ক্রোধ, দয়া, ঘৃণা ও প্রেম প্রভৃতি আরোপ করে; কেহ বা সমস্ত প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসবান; অতি অল্প লোকেই নাস্তিক্যবুদ্ধিতে বিশ্বাসী. অথবা দাহ্র (কাল) বা প্রকৃতিকে বিশ্বের সৃষ্টি শক্তির মূলীভূতকারণ মনে করেন। এবং কেহ কেহ বা সৃষ্টিতে যাহা বিশাল বা বিরাট তাহাতেই ভগবদ্‌বিভূতি আবিষ্ট করিয়া, পূজার্চ্চনার বস্তু করিয়া তোলে। এই সকল ব্যক্তিবর্গ বিশিষ্ট শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে যে বিশ্বাস, তাহার সহিত সৃষ্টির মূল:কারণের প্রতি যে স্বতঃ বিশ্বাস, ইহাদের কোন

পার্থক্যই করিতে পারেন না,—মানবজাতির মধ্যে যাহা অবর্জ্জনীয় ও বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়,—এবম্বিধরূপে তাহারা কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলিত ধারা অনুসন্ধানের প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া, অভ্যাস ও প্রচলিত রীতির প্রভাবে বিশ্বাস করে যে, নদীতে স্নান, বৃক্ষকে পূজা, বা সন্ন্যাসী হওয়া, এবং গুরু পুরোহিতের নিকট হইতে নিজেদের পাপের ক্ষমা অর্থদ্বারা ক্রয় করা প্রভৃতি, (বিভিন্ন ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ মতানুসারে) সারাজীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তির বিশিষ্ট কারণ বলিয়া বিশ্বাস করে। এবং তাহারা মনে করে যে, এই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পবিত্র হওন, পুরোহিতদিগের অমানুষিক ক্রিয়া ও তাহাদের আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসের ফল এবং তাহা তাহাদের নিজেদের খেয়াল ও অন্ধ বিশ্বাসের ফল নহে। কিন্তু যাহারা এই সকল বিশ্বাস ও ধর্ম্মমতে অনৈক্য ও শ্রদ্ধাবান্ নহেন, তাহাদের উপর এ সকল কার্য্যের কোন সুফলই হয় না। যদ্যপি এই সকল কাল্পনিক বস্তুর সত্যই কোন সত্য সুফল থাকিত, তাহা হইলে ইহা সকল বিভিন্ন জাতির অনুসরণের ধারায় একই প্রকার হইত, এবং মাত্র শুধু এক বিশিষ্ট জাতির ধর্ম্মগত বিশ্বাস ও অভ্যাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত না। কারণ, যদিচ ফলের শক্তির মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন শক্তিমান ব্যক্তির শক্তি-অনুসারে তারতম্য ঘটে, তথাপি ইহা একজন বিশেষ বিশ্বাসীর ধর্ম্মমতের উপর নির্ভর করে না। তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, যদি কেহ অমৃত বলিয়া মিষ্টান্ন বিশ্বাসে বিষ ভক্ষণ করে, তাহাতে অবশ্যই বিষের ফল ফলিবে ও তাহার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী! "হে ঈশ্বর! আমাকে অভ্যাস ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্যবিচারের সুদৃঢ় শক্তি প্রদান কর।"

ধর্ম্মসংস্থাপনকারীরা অপ্রাকৃতি ও অলৌকিক কার্য্যসকলের ভাবকে নিজেদের মধ্যে বিশেষ ধর্ম্মের উৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া, সাধারণ লোকের উপর আপনাদের বিশ্বাসের প্রভাব বর্দ্ধিত করেন।

সাধারণ লোকের ইহাই রীতি, যাহারা খেয়ালের বশে খাটিয়া মরে, তাহারা যখন দেখে যে, কোন্ কার্য্য কৃত, কোন্ বস্তু সৃষ্ট, অথবা প্রাপ্ত ও যাহা তাহাদের বুঝিবার শক্তির ও সামর্থ্যের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হইয়া পড়ে, অপিচ যাহার কোন সহজ কারণ পরিষ্কাররূপে তাহারা নিরাকরণ করিতে পারে না, তখনই সেই কার্য্যকে তাহারা অপ্রাকৃতিক ও অলৌকিক বলিয়া আখ্যা দেয়। রহস্য এইখানেই যে, এই ধারায় যথায় কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলার ভিতর সকল বস্তুই পরস্পর শৃঙ্খলিত ও গ্রথিত রহে, প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বই বিভিন্ন কারণ ও অবস্থার উপর নির্ভর করে; কেন না, যদি শেষ কারণগুলির আমরা বিচার করি, আমরা এমত কহিতে পারি যে, প্রকৃতিতে যে কোন একটী বস্তুই আছে, সমগ্র বিশ্বের সহিত তাহা বিজড়িত হয়। কিন্তু যখন অভিজ্ঞতার অভাবে এবং খেয়ালের প্রভাবে, সেই বস্তুর কারণ কাহার নিকট অজ্ঞাত রহে, অন্য এক ব্যক্তি সেই

সময়ে নিজের স্বার্থসাধনের সম্যক্ সুবিধা ও সুযোগ বুঝিয়া, নিজের দৈবীশক্তির উপর তাহার কারণ নির্দ্দেশ করে, এবং জনসাধারণকে আপন দলে আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষে এই বর্ত্তমান সময়ে অপ্রাকৃতিকত্বে ও অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এমনই মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, যখনই তাহারা কোন আশ্চর্য্য বস্তু নিরীক্ষণ করে, তখনই তাহা তাহাদের অতীতের কোন মহাপুরুষের ক্রিয়ার সঙ্গে বর্ত্তমান কোন ঋষির সহিত মিলাইয়া দেয়, যদিও সেই বস্তুর অস্তিত্বের পরিষ্কার প্রত্যক্ষ কারণ সত্ত্বেও তাহারা তাহা স্বীকার না করিয়া অবজ্ঞা করে। পরন্তু যাঁহাদের সুস্থ মন এবং যাঁহারা ন্যায়ের অভিন্ন সুহৃদ্, তাঁহাদের কাছে ইহা লুক্কায়িত রহে না যে, অনেক জিনিস আছে, যেমন ইউ-রোপীয় জাতির অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রের আবিষ্কার সকল, ও ঐন্দ্রজালিকদিগের ভোজবাজী, তাহাদের কারণ যদিও খুব পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না, এবং মনুষ্যের বুদ্ধি ও ক্ষমতার অতীত বলিয়া মনে হয়, তথাপি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা বা অন্যের নিকট শিক্ষার দ্বারা, সেই সমস্ত কারণই উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। এই উন্নয়নাত্মক কারণ মাত্রেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ নানা দৈবী ক্রিয়ার প্রবঞ্চনা হইতে যথেষ্ট নিরাপদ হইবার পন্থা। এই বিষয়ে আমরা যতদূর পর্য্যন্ত বলিতে পারি, তাহা এই যে, কোন কোন বিষয়ে, খুব তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী বুদ্ধি-বিচার-শক্তি থাকিলেও কোন কোন বিস্ময়কর বিষয়ের কারণ, কাহার কাহার কাছে অজ্ঞাতই রহিয়া যায়। তখন সেই সব বিষয়ে আমাদের নিজেদের সংবিতের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহাকে এই প্রশ্ন করিতে হয়, যথা,—যে আমাদের বুদ্ধির বিচারের সহিত মিলাইবার পর আমরা মানিয়া লইতে পারি কি না যে, সেই কারণ বুঝিতে আমরা অপারগ, অথবা ইহা কোন অসম্ভব শক্তির কার্য্য, যাহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী হয়? আমার বোধ হয়, আমাদের বোধী প্রথমটীকেই গ্রহণ করিবেন। অধিকন্তু যাহা আমরা নিজেরা প্রত্যক্ষ দর্শন করি নাই, এবং যাহা প্রত্যক্ষ দর্শনের নিয়মের সহিত বিরোধী হয়, সে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন করায় আমাদের কি প্রয়োজন হয়? যেমন, মৃতকে পুনর্জীবিত করণ এবং স্বশরীরে স্বর্গে গমন ইত্যাদি,—বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল, এমত শুনা যায়। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বলিয়া মনে হয় যে, যদিচ লোকে বৈষয়িক ব্যাপারে, একের সহিত অন্যের নির্দ্দিষ্ট যোগের ব্যাপার না জানিয়া, তাহারা বিশ্বাস করে না যে, একটী কারণ আর অন্যটী তাহার ফল, অথচ যখন ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের প্রভাব তাহাদের উপরে পড়ে, তখন তাহারা একটীকে কারণ আর অন্যটীকে ফল বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, যদিচ সেই উভয়ের মধ্যে কোন সংযোগ বা কোন পারম্পর্য্য নাই। যেমন দোয়া'র (অর্থাৎ কোনরূপ প্রার্থনা) ফলে বিপদ হইতে দূর হওন অথবা কোন তুক্তাক্ বা রক্ষাকবচ ইত্যাদি দ্বারা রোগ হইতে মুক্ত হওন।

যখন এই সকল রহস্যময় বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করা হয়, যে সমস্ত বিস্ময়কর কার্য্যে, যুক্তি জ্ঞান তাহার সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে দ্বিধা বোধ করে, তখন ধর্ম্ম-গুরুগণ তাঁহাদের অনুচরদিগের তুষ্টির জন্য ব্যাখ্যা করেন যে, ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপারে, বিচার ও তর্কের কোন কার্য্যই নাই; এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের ব্যাপার ভগবদ্‌-কৃপা ও বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে। যে বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই এবং যাহা যুক্তিজ্ঞানের স্ববিরোধী এবং যাহা তাহার সহিত সঙ্গত বলিয়া বিবেচনায় আইসে না, বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বা কেমন করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ও স্বীকৃত হইতে পারেন?—"হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জনগণ, ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। *

ন্যায়শাস্ত্রে তাহাদের গভীর জ্ঞান ও অধিকার থাকার জন্য তাহারা কখন কখন তর্ক করিতে আরম্ভ করে যে, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ক্ষমতার কাছে ইহা কিছুই অসম্ভব নয় যে, সম্পূর্ণ অবস্তু হইতে এই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি করা, মৃতদেহের মধ্যে দ্বিতীয় বার আবার প্রাণসঞ্চার করা এবং এই প্রস্ফুটাত্মক শরীরে আলোকের গুণ ও ধর্ম্ম বা বায়ুর উপরে এমন ক্ষমতা প্রদান করা যাহাতে অল্পক্ষণের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারে। কিন্তু এই সকল তর্ক যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, ঐ সকল ঘটনা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা আছে, অথচ তাহাদের পূর্ব্বতন ধর্ম্মগুরু-দিগের ও আধুনিক মুজতাহিদ্‌দিগ্যের অপ্রাকৃতিক কার্য্যসকলের প্রমাণ করিতে চায়, এমতে ইহা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে স্পষ্টই পরিস্কার বোধগম্য হয় যে, এই যুক্তি তর্কে কোন তক্‌রিব † নাই।

ইহা ব্যতীত যদ্যপি তাহাদের যুক্তিকে সত্য বলিয়াও ধরা যায়, তবে 'মানজারা' অর্থাৎ তর্ক-বিতর্কে বা বাদানুবাদের সময় 'মানা' অর্থাৎ ব্যাপ্তি নিরূপণে সাধ্য পক্ষ ও তত্ত্ব প্রতিপাদ্যের সত্য বিষয়ে প্রশ্ন করার কোন উপায়ই রহে না। এবং কোন প্রতিজ্ঞাকে, তাহা যাহাই হউক না কেন, ত্যাগ করার দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ, যে কেহই অসম্ভব বস্তুসকলের প্রমাণের জন্য চেষ্টা করে, বিচার-কালে সেই প্রকারের সাধ্য ও পক্ষের পথ লয়, এবং এইরূপে সম্ভব ও অসম্ভব উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার কোন নিরাকরণই হয় না, ফলতঃ প্রতিজ্ঞার সমস্ত ভিত্তি এবং ন্যায়বিচারের গাঁথনি ধূলায় লুণ্ঠিত হয়। যদ্‌হেতু ইহা স্বীকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে যে, স্রষ্টার অসম্ভব বস্তু সৃষ্টির কোন ক্ষমতাই নাই; দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত অংশীদারীর সম্পর্ক বা ঈশ্বরের অনস্তিত্ব অথবা দুই বৈপরীত্যের এককালে স্ববিরোধী অস্তিত্ব ইত্যাদি।

* কোরাণ হইতে উদ্ধৃত আরবী বাক্য।

† ন্যায়শাস্ত্রে তক্‌রিবের অর্থ—প্রতিজ্ঞার প্রামাণ্যের সহিত মীমাংসার সামঞ্জস্য।

হাফেজ হইতে একটী শ্লোক।

বাহাত্তরটী সম্প্রদায়ের যে বিরোধ তাহা ক্ষমা করা যাইতে পারে, কারণ তাহারা সত্যের দর্শন না পাইয়া, উপকথা ও অবান্তর কথার পথ মাড়াইয়া চলিয়াছে। *

যেহেতু সময়ের ব্যবধানের জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের গুরুগণের অতিমানুষিক ক্ষমতার বিষয় বহিরিন্দ্রিয়ের অর্জ্জিত জ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত করা যায় না। (যাহা কোন কোন অবস্থায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বস্তু) সেই হেতু বিভিন্ন ধর্ম্মধ্বজী-দিগের আচার্য্যগণ তাহাদের অনুচরদিগের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, সেই সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ জন্য 'তোয়াত্তর' (পৌরাণিকী কথা বা সাধারণের দ্বারা সংগৃহীত ধারাবাহিক প্রচলিত চলিত কথা) এর ভাবকে পোষণ করে। অথচ 'তোয়াত্তরের' ভাবসম্বন্ধে বিশেষ অনুধাবন করিলেই যাহা স্থির বিশ্বাসকে আনিয়া দেয় এবং ধর্ম্মের অনুসরণকারীদিগের দ্বারা যে 'তোয়াত্তর' গৃহীত হয়, তাহার দ্বারা এ উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যা হেত্বাভাস বা ন্যায়ের ফাঁকি তাহা বিদূরিত করা যাইতে পারে। কারণ, ধর্ম্মের অনুসরণকারীদিগের মতে 'তোয়াত্তর' এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে আগত হয়, যাহাদের উপর মিথ্যার আরোপ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু পুরাকালে সেই শ্রেণীর লোকের সত্য অস্তিত্ব ছিল কি না, বর্ত্তমান কালের লোকেদের কাছে, অভিজ্ঞতা বা বহিরিন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা তাহা তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তো বটেই, বরং তাহা অত্যন্ত অসম্ভব ও সন্দেহজনক। তাহা ব্যতীত অতীতকালের প্রত্যেক ধর্ম্মের গুরুদিগের মধ্যে বিশাল মতান্তর, তাহাদের ধারণাকে মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণ করে। যদ্যপি ইহা বলা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর লোকের দ্বারা কথিত বিষয়ের সত্যতা যাহারা তাহাদের গুরুগণের অলৌকিক কার্য্যের চাক্ষুষ সাক্ষ্য দেয়, তাহাদের পরের শ্রেণীর লোকের - যাহারা তাহাদের সমসাময়িক—কথার দ্বারা প্রমাণ করিতে হয়, এবং সেই পরের শ্রেণী অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের কথার সত্যতা আবার তৃতীয় শ্রেণীর লোকের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে হয়। (যাহারাও তাহাদের সমসাময়িক) তাহাদেরও যোগ করা কর্ত্তব্য; কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের কথার সত্যাসত্যও প্রমাণ সাপেক্ষ এবং সেই প্রকারে তৃতীয় শ্রেণীর কথার জন্যও চতুর্থ শ্রেণীর যোগ প্রয়োজন, এবং এই প্রকার ধারাবাহিক সাক্ষ্য প্রমাণের ধারা পরবর্ত্তী কাল অবধি আসিয়া পড়ে। ইহা পরিষ্কার বোধগম্য হয় যে, সুস্থ মনের লোকেরা সেই শ্রেণীর লোকদিগকে যাহারা তাহাদের সমকালেই ছিল,

* মুসলমানদিগের মধ্যে ৭২টি সম্প্রদায় আছে।

একথা মানিতে দ্বিধা করিবে; বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়ে কোন মিথ্যার আরোপ তাহাদিগের উপর করা যায় না। এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যৎ বাণীর স্বীকার এবং অস্বীকার ও ধর্ম্মগুরুদিগের বহুতর উত্তম উত্তম গুণসম্বন্ধে, প্রকাণ্ড বিরোধ দেখা যায় এবং এই সকল বিরোধী মতামত সেই 'তোয়াত্তরের' দ্বারাই প্রমাণীকৃত হয়। সুতরাং প্রত্যেক দলের কথার সত্যতা যদিও গ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে দুই বিভিন্ন বিরোধীমতকে স্বীকার করিতে হয়। এবং একজনের কথার উপব বিনা কারণে আর একজনের কথার বিশ্বাস স্থাপন করা হয় (অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট কারণ না দেখাইয়া বিশ্বাস করা) কাবণ প্রত্যেকদলই সমভাবেই ছলনা করিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কথাই সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য। কথা এই যে, 'তোয়াত্তব' বা প্রচলিত কথা যেথানে বিচার বুদ্ধির নিকট গ্রহণীয় বা যে লোকের কথাব সত্যের কোন প্রতিবাদ কাহার দ্বারা হয় নাই, সেইখানেই স্থির বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই প্রকার 'তোয়াত্তর' বিচার-বুদ্ধির বিরোধী অসম্বন্ধ কথা হইতে অনেক পৃথক্। এই প্রকার মত বিচারেব দ্বারা নিম্নলিখিত তর্কবিচারের ধারাকে (ভবরোগবৈদ্যদিগের দ্বারা গঠিত) সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। তাহারা বলে, প্রথমতঃ, যে, "কেমন করিয়া সেই সমস্ত লোক যাহারা ইতিহাসে লিখিত পৌরাণিক রাজাদিগের কাহিনী ও প্রচলিত তোয়াত্তর বা প্রচলিত কাহিনীর ধারায় বিশ্বাস করে, তাহারা যে ধর্ম্মের গুরুদিগের দৈবী কার্য্যসকলের কথা, যাহা বহুকাল হইতে জাতির যে সনাতন প্রচলিত কথা ও জনশ্রুতি বা পুরাতন পুঁথিব মধ্যে উল্লেখ আছে, তাহাকে যে ত্যাগ করে, তাহার ন্যায়মতে বিচাব কি হয়? এবং দ্বিতীয়তঃ, কেমন করিয়া সেই সমস্ত লোক যাহারা তাহাদিগের হইতে বর্ণ, আকার ও সামাজিক রীতিনীতিতে পৃথক্ হইয়াও এবং নিগূঢ় তত্ত্ব তাহাদের নিকট গুপ্ত থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেব বংশের ধারার জন্মের কথায় যাহা 'তোয়াত্তরের' দ্বারা পাওয়া যায়, তাহাতে যাহারা বিশ্বাসবান্ হয়, তাহারা কেমন করিয়া পুরাতন মুজতাহিদ্দিগের পবিত্রতা ও অলৌকিক কার্য্য বিশ্বাস করিতে দ্বিধা করে, যাহাও সেই একই প্রকার তোয়াত্তরের দ্বারাই পাওয়া যায়?" অধিকন্তু অতীতকালের রাজাদিগের কাহিনী যেমন কোন রাজার সিংহাসনারোহণ ও শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ ইত্যাদি যাহা বিশ্বাস-যোগ্য ও সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে, অথচ ওই সকল দৈবকার্য্যের কাহিনী যাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর তাহাকে অগ্রাহ্য করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন কোন এক শ্রেণী জন্তুর জন্ম যেমন চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হয়, কিন্তু পিতা মাতা ব্যতিরেকে সন্তানের জন্ম বুদ্ধি জ্ঞানের বিশ্বাসে সম্পূর্ণ বিরোধী হয়।

"এক পথ হইতে অন্য পথের মধ্যে কি বিশাল পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখহ।"

এতদ্ব্যতীত অতীতকালের রাজাদিগের কাহিনী অথবা তাহাদের বংশাবলীর ধারার কথা মনে শুধু মাত্র ধরিয়া লওয়া হয় এবং যদি কোন ধর্ম্মের ধর্ম্মমত সকলের বিশ্বাস, তাহাদের ধর্ম্মানুশাসন মতে তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টবস্তু হয়, সুতরাং এইরূপ বস্তুগত পার্থক্য থাকায় একের সহিত অন্যের কোন সাদৃশ্য বিচারই হইতে পারে না। ইহা সত্ত্বেও যখন ইতিহাসে রাজাদিগের কাহিনী বা বংশাবলীর কথায় যদি কোন বিরোধ উত্থাপিত হয়, তখন সে সমস্ত কথা ও কাহিনী অবিশ্বাস্য বলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন অলিকসুন্দরের চীনবিজয় ও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে গ্রীস ও পারস্যের ই'তহাস লেখকদের পরস্পর মতবিরোধ দেখা যায়, সুতরাং তাহাকে সঠিক সত্যরূপে ও নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

কেহ কেহ এইরূপ ভাবে তর্ক করে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ স্রষ্টা, ধর্ম্মগুরু ও অবতার-দিগের মধ্য দিয়াই পথপ্রদর্শকরূপে এই পৃথিবীর জীবদিগকে চলিবার পথ খুলিয়া দিয়াছেন। ইহা পরিষ্কাররূপেই ভ্রম, কারণ সেই সকল লোকেরাই বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিতে সকল বস্তুরই অস্তিত্ব, কি সৎ বা অসৎ সকলেই সেই মাঝে থাকা দালাল ব্যতীত মহান্ স্রষ্টার সহিত সংযুক্ত এবং তাহাদের অস্তিত্বের সকল অবস্থা ও মাঝে থাকাই তাহাদের দ্বিতীয় কারণ। অতএব এখন দেখিতে হইবে যে, আপ্তবাক্য ও অবতারদিগের প্রেরণা ও আদেশ যাহা তাহাদিগ্যের নিকটে আইসে, তাহা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ নিকট হইতে না ঐ সকল মধ্যবর্ত্তী লোকের নিকট হইতে আইসে। প্রথম পক্ষে মোক্ষের জন্য পথ দেখাইবার একজন মাঝে থাকা দালালের কোন প্রয়োজনই নাই এবং অবতার বা আপ্তবাক্যের মত যন্ত্রের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। এবং দ্বিতীয় পক্ষে মাঝে থাকা দালালের ধারাই চলিয়া আইসে যাহার আর কোন সমাপ্তিতেই শেষ হইবে না। অতএব অবতার বা আপ্তবাক্যের আবির্ভাবও প্রকৃতিতে অন্যান্য বিষয়ের মত ঈশ্বরের সম্বন্ধ ব্যতীতই বাহিরের কারণের উপরই নির্ভর করে অর্থাৎ তাহা উদ্ভাবকের উদ্ভাবনার উপরেই নির্ভর করে। অবতার প্রভৃতি উদ্ভাবিত সম্প্রদায়সকলের উপদেশের বিশেষ কোন বাণী বহন করিয়া আইসে না। এতদ্ব্যতীত কোন এক জাতি যাহাকে তাহার সত্য বিশ্বাসে পৌঁছিবার বিশেষ পন্থা বলে, অন্যে তাহাকে ভুল করিয়া ভুলপথে লইয়া যাওয়াই কহে। ধর্ম্মানুসরণকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবংবিধ তর্কও করিয়া থাকেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্মের উপদেশের মধ্যে অনৈক্য থাকায় ইহা প্রমাণিত হয় না যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যেই মিথ্যা আছে। পৃথিবীর পুরাকালের ও বর্ত্তমানের শাসনকারী-দিগ্যের আইনের মধ্যে যেমন অনৈক্য দেখা যায়, সমাজের ধর্ম্মের এই অনৈক্যও ঠিক সেই একই প্রকার; আধুনিক শাসনকারীরা যেমন বিভিন্ন সময়ে সমাজের বিভিন্ন

অবস্থা বুঝিয়া, পূর্ব্বেকার গ্রথিত আইনসকলকে যখন তখন রদ করেন, সেই প্রকার এই সমস্ত ধর্ম্মসকলের পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এ সকলই তাঁহারই ইচ্ছায় একটা বদ হইয়া আর একটার প্রতিষ্ঠা হয়। এই তর্কের উত্তরে আমার জবাব এই যে, এই আইন বা শাসনপ্রথা কি সত্যস্বরূপ ভগবানের, যিনি ধর্ম্মানুসরণকারীদিগের মতে, প্রত্যেক অণুপরমাণুর বিশেষ অবস্থার সহিত পরিচিত এবং যিনি স্বয়ম্ভু, যাঁহার নিকট ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকলই সমভাবে জ্ঞানে প্রতিভাত এবং যাঁহার প্রভাবে সমস্ত মানব জাতির হৃদয়ে তেঁহ যখনই যাহা ইচ্ছা করেন, তখনই তাহাদিগ্যের হৃদয়কে সেই পথেই ফিরাইতে পারেন এবং যিনি সকল বস্তুরই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কারণের সংগোপ্তা এবং যিনি তাঁহার নিজস্ব কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্বার্থ হইতে দূরে রহেন, এবং যিনি খেয়ালেব কল্পনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাঁহার কার্য্যেব সহিত মানবজাতির আইন বা শাসন-প্রথার কোন সাদৃশ্য বিচারই হইতে পারে না; কারণ যাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি অসম্পূর্ণ এবং যাহারা তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যের বিশেষ চরম উদ্দেশ্য বুঝিতে সম্পূর্ণ অপারগ এবং যাহারা সদাই ভুল-ভ্রান্তির বশীভূত এবং যাহাদের সকল কার্য্যই স্বার্থপরতা প্রবঞ্চনা এবং ছলনায় ভরা। ইহা কি সেই প্রকারের সাদৃশ্য উপমান বিচার নহে? দুই বস্তু উভয়েই যাহারা তাহাদের আসল স্বত্বেই পৃথক্? এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত মতকে গ্রহণ করায় আরও বহু ঘোরতর বাধা আছে। যেমন ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং ভগবানের নিকট হইতে সনাতন প্রথামত আসিয়াছে এবং ভগবানের নিকট হইতে এই কঠিন আদেশ প্রাপ্ত যে, চিরকালের জন্য তাহারা তাহাদের আচার ও রীতিনীতি পালন করিবে ও এই বিশ্বাস রক্ষা করিবে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভগবদ্ বাক্য প্রামাণ্য হইতে এইরূপ অনেক আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং আমি, ভগবানের সৃষ্টিতে আমি অতি অধম ব্যক্তি তাহাদিগ্যের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছি, সেই ভাষা শিক্ষা করিয়াছি এবং সেই সকল অনুজ্ঞা হৃদয় মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি এবং এই জাতি (ব্রাহ্মণেরা) ভগবদ্ অনুজ্ঞায় এমনই বিশ্বাসবান্ যে, তাহা কদাপি তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না; যদিচ তাহারা ইহার জন্য অনেক শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে এবং ইস্‌লামের প্রবর্ত্তকদিগ্যের হইতে হত্যা পর্য্যন্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে ইসলামের অনুসরণকারীরা তাহাদের কোরাণেব পবিত্র শ্লোকের মতানুসারে (পৌত্তলিকদিগকে যেখানে দেখিবে, সেইখানেই হত্যা করিবে) এবং (সর্ত্তে আবদ্ধ করিবে অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধে অবিশ্বাসীদিগকে বন্দী করিবে তাহার পর হয় অর্থ লইয়া, না হয় তাহাদিগকে ধর্ম্মে বাধ্য করিয়া পরে মুক্তি দিবে)—ভগবান্

হইতেই প্রামাণ্য দেখায় যে. পৌত্তিলিকদিগকে হত্যা করা এবং প্রতিপদে তাহাদিগ্যের উপর যন্ত্রণা ও অত্যাচারাদি দ্বারা পীড়ন করা, ভগবানের আদেশেই এইরূপ করিতে বাধ্য। পৌত্তলিকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর পৌত্তলিক। অতএব ইস্লামের অনুসরণকারীরা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের গোঁড়ামীর উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া ভগবানের বাণী বহন করিবার আকাঙ্খায় বহু দেববাদীদিগকে যাহারা পয়গম্বরের বাণী ও ইহ-পরলোকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ তাহা বিশ্বাস না করে, তাহাদিগকে নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়িত করিতে ও হত্যা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে বিমুখ হয় না। ভগবৎ আশীর্ব্বাদ যেন তেঁহ ও তাঁহার শিষ্যদিগের উপর রহে। এখন এই সকল বিবোধী মত ও উপদেশ সেই মহান্ সদাশয় ও নিঃস্বার্থ স্রষ্টার দয়া ও জ্ঞানের সহিত মিলন হয় না, ধর্ম্মের অনুসরণকারীদিগের মিথ্যা জাল রচনা হয়? আমার বিবেচনায় এই আইসে যে, যে কোনও সুস্থ প্রকৃতির ব্যক্তি শেষোক্ত মতবাদটী গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না। তৎপরে ইহাও বিচার করিতে হইবে যে, উভয়ের মধ্যে কোনটী যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ হয় এই সকল আদেশ বা অনুজ্ঞা ভগবানের দিক্ দিয়া লইতে হইবে, নয় বিরোধী সনাতনী প্রচলিত কথা বলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন এক শ্রেণী তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের প্রামাণ্যে বলে যে, ধর্ম্মগুরুগণের সঙ্গেই ভবিষ্যতের বাণী রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং অন্যদলে দাবী করে যে, ভগবানের প্রামাণ্য আদেশ হইতে ইহাই বলে যে, ভবিষ্যতের বাণী দাউদের বংশপবম্পরার শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া বহিবে। বস্তুতঃ এই দুই কথাই প্রচলতি বা ভবিষ্যৎবাণী এবং ইহারা কোন আদেশ বা আইন নহে যে, ইহা রদ করা যাইবে। কারণ, একে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যে অবশ্যই মিথ্যা হয় কিন্তু পবিবর্ত্তনের যে আশঙ্কা বা মিথ্যা হওয়া, উভয় মতেই সমভাবে প্রযোজ্য। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই সকল ধর্ম্মনেতাদিগেব প্রস্থানের সময় হইতে শত শত শতাব্দীর পর ভারতবর্ষে ও :অন্যান্য প্রদেশে নানক ও অন্যান্য লোক ভবিষ্যৎবাণীর পতাকা উড়াইয়াছেন এবং নানা প্রলোভনের দ্বারা বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নিজেদের অনুগামী করিয়াছেন ও কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বরং যাহারা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও সামান্য বুদ্ধির লোক তাহাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য পরিপ্রাপ্তির দ্বার সর্ব্বদাই একেবারে মুক্ত হইয়া রহে। ইহা প্রতিনিয়তই দেখা যাইতেছে যে, শত শত ব্যক্তি কোন সম্মান বা সামান্য পদার্থ লাভেচ্ছু হইয়া তাহার জন্য নানাপ্রকাব শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন ও অনাহারে কষ্ট ভোগ করে অর্থাৎ প্রতিনিয়তই উপবাস করা, স্থির হইয়া গতিবিহীন করিয়া হস্ত উত্তোলন করা, শরীরকে দগ্ধ করা ইত্যাদি। (যাহা হিন্দু সন্ন্যাসী ও মোহন্তদিগের মধ্যে দেখা যায়)। অতএব ইহা বিস্ময়কর

নয়, যে (অতীত যুগে) কোন কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির লোকের নিকট নেতা হই-বার সম্মান অর্জ্জন করিবার জন্য অথবা লোকের নিকট নিজেদের শ্রদ্ধার পাত্র ও বস্তু করিয়া তুলিবার জন্য এই সকল কৃচ্ছ্রসাধন ও সময়ের নানাবিধ বিপদ সহ্য করে। একটা কথা আছে, যাহা প্রায়ই ধর্ম্মাচার্য্যগণের নিকট হইতে শ্রুত হওয়া যায়, এবং যাহা তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ের শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রামাণ্য বলিয়া উদ্ধার করে। তাহারা প্রত্যেকেই বলে যে, তাহার ধর্ম্মে, মৃত্যুর পরে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য পুরস্কার বা শাস্তির সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করে, তাহা হয় সত্য নয় মিথ্যা। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি তাহা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন পুরস্কার ও শাস্তিই থাকে না, তবে তাহা হইলে তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কোন ক্ষতিই নাই। কিন্তু প্রথম পক্ষে অর্থাৎ যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে অবিশ্বাসীদিগের পক্ষে বিশেষ বিপদের কথা। বেচারা সাধারণ লোক সকল যাহারা ধর্ম্মব্যাখ্যাকারী-দিগের মতের অনুগামী, তাহারা নেতাদিগের বাক্যকেই চূড়ান্ত তর্ক-বিচার-নিষ্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করে ও সর্ব্বদাই তাহারা অহঙ্কার ও বড়াই করে। সত্য হইতেছে এই যে, মানবজাতিতে অভ্যাস ও শিক্ষাসংস্কার চক্ষু এবং কর্ণ থাকিতেও অন্ধ ও বধির করে। উপরোক্ত বাক্য উভয় প্রকারেই হেত্বাভাস ও ন্যায়ের ফাঁকি। প্রথমতঃ—দ্বিতীয় পক্ষে, তাহাদের কথায় যে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কোন ক্ষতি নাই ইহা গ্রহণ করা যায় না। কারণ জীবন্ত অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার পর সেই বস্তুর সত্যঅস্তিত্বে বিশ্বাস, মানবজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পাইতে হইবে। কিন্তু সেই সকল বস্তুর স্বরূপ্য অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, যাহা বুদ্ধিজ্ঞান হইতে বহু দূরে রহে এবং অভিজ্ঞতার কাছে দুঃসহ অবজ্ঞার কারণ হয়, তাহা বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের ক্ষমতায় আইসে না। দ্বিতীয়তঃ সেই সকল বস্তুতে বিশ্বাস থাকায় অভিজ্ঞতার অভাবে ও জঘন্য অজ্ঞানতার জন্য, ইহা নানাপ্রকার অন্যায় কার্য্য, অত্যাচার, দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মের মূল হইয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ গোঁড়ামী, প্রবঞ্চনা, ইত্যাদি। যাহা হউক এই পক্ষে যদি এ বিচারকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, এবং ইহা হইতেই সকল প্রকার ধর্ম্মের যাহা সত্য, তাহার নিরাকরণ হয়; কারণ, প্রত্যেক ধর্ম্মানুসরণকারিগণ একই তর্কের ধারা সমভাবেই প্রকাশ করিতে পারে—তাহা হইলে সকল ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, একটীকে গ্রহণ ও অপরটিকে বর্জ্জন করা যে কোন লোকের পক্ষে অত্যন্ত গোলমাল হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রথমটী যেমন অসম্ভব ফলতঃ দ্বিতীয়টীকেও অবশ্য গ্রহণ করিতে হয়। এবং এ পক্ষেও তাহাকে পুনরায় নানা ধর্ম্মের সত্য ও মিথ্যার অনুসন্ধানেই প্রবৃত্ত হইতে হয়। এবং ইহাই আমার এই তর্ক বিচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অতঃপর কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্যগণের যুক্তি এই যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রচলিত সনাতন প্রথা ও সাম্প্রদায়িক আচার ও রীতিনীতির মধ্যে কি সত্য, বা মিথ্যা আছে, তাহার কোন অনুসন্ধান বা বিচার না করিয়াই আমাদিগ্যের তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য এবং সেই সকল ধর্ম্মানুশাসন ও সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা অথবা তাহা হইতে অন্যমত হওয়ায় ইহলোকে লজ্জা ও পরলোকে দুঃখ বহন করিয়া লইয়া যায়, এবং ঐ প্রকার কার্য্য আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি অবমাননা ও ঘৃণার ব্যবহার করা হয়। তাহাদিগ্যের এই মিথ্যাযুক্তিতে যাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালমত পোষণ করে,—সাধারণ লোকের মনে বেশ ভাল রকমই ফল ফলে, এবং ফলে ন্যায়পথ অবলম্বনে ও সত্যানুসন্ধানে তাহাদিগকে বাধা দেয়। এই যুক্তির হেত্বাভাস ও অসারত্ব একটু চিন্তা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে। কারণ, ইহা সমভাবেই প্রযোজ্য যে, প্রথমতঃ—যাহারা কোন নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া, জনসাধারণকে তাহাদিগ্যের প্রতি আকর্ষণ করে, এবং দ্বিতীয়তঃ—যাহারা তাহাদিগ্যের ধর্ম্মগুরুদিগের নিকট হইতে উপদেশ ও অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের আচরিত পুরাণ পথ হইতে ভিন্নপথ লয় এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মপদ্ধতির ভিত্তিকে টানিয়া উপড়াইতে চেষ্টা করে। যদি কোন মনুষ্য কেবলমাত্র নিজের আবিষ্কারকে ভগবানের উপর আরোপ করার অপরাধের জন্য শাস্তি পাইতে হয়, তাহা হইলে-এই পথ অবলম্বনই খুব প্রশস্ত উপায়। কথাটা এই যে, এক ধর্ম্ম পরিহার এবং অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ, যাহা পূর্ব্বতন কালের লোকদিগের নিকট সচরাচর প্রচলিত ছিল, তাহাতে বুঝায় যে, ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ মানবজাতির অভ্যাসের মধ্যেই বর্ত্তিয়া আছে। ইহা ব্যতীত মানবজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভগবান্ সে বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই বোধগম্য হয় যে, অন্যান্য জীবের মত, মনুষ্য তাহার জাতির অন্যান্য জাতভাইদিগের অনুসরণ করিবে না বরং সে তাহার অধিকৃত জ্ঞানের দ্বারা ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সৎ ও অসৎ বিচার করিবে, যাহাতে তাহার এই মহামূল্য ভগবৎ দান বৃথায় ব্যয়িত না হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের অনুসরণকারীরা কখন কখন পৃথিবীতে ঈশ্বরবাদীদিগের সংখ্যার প্রাচুর্য্য দেখিয়া গর্ব্ব করে যে, অধিকাংশ লোক তাহাদিগ্যের দিকেই আছে। ইহা দেখিতে হইবে যে, কোন বাক্যের সত্যতা, কথিতের সংখ্যার অধিক গুণফলে নির্ভর করে না, এবং কোন ঘটনার বর্ণনার বিশ্বাসযোগ্যতা শুধু মাত্র কথিতের সংখ্যার প্রাচুর্য্য নিবন্ধন হয় না। কারণ, সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগের নিকট, ইহা গ্রহণীয় হইয়াছে যে, যদিচ অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহার বিরুদ্ধ হয়, তথাপি সত্যকেই অনু-

সরণ করিতে হইবে। অধিকন্তু এই প্রতিজ্ঞাকে গ্রহণ করিলে পর অর্থাৎ কথিতের সংখ্যার প্রাচুর্য্যতা, কথার অসত্যতাই আনিয়া দেয়—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত—এবং সকল প্রকার ধর্ম্মের প্রতি মারাত্মক আঘাত করাই প্রমাণ করে। কারণ, প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রারম্ভে অতি অল্প লোকেই তাহা মানিয়া লয়। যথা—ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার অতি অল্প একনিষ্ঠ সরল অনুগামিগণ, যাহারা তাঁহার সহিত একই উদ্দেশ্যে জড়িত; এবং তাহারা পরে তর্কের এত প্রকার বহুল ধারা ও এত রাশি রাশি গ্রন্থসকল লিখেন ও সেই অল্প লোকের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহা প্রকাশ করেন—যেমন একগাছি তৃণের উপরে পর্ব্বতের প্রতিষ্ঠা করার মত,—অথচ প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল ভিত্তি হইতেছে যে, এক সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের উপর বিশ্বাস। যাহারা ভগবান্ হইতে স্বাভাবিক আদেশের স্থানে এই সকল তৈয়ারী আপ্তবাক্যের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান্ হয়, যাহা শুধু আপনাপন জাতির সামাজিক জীবনের ধারার মধ্যেই নিহিত এবং মিথ্যা হইতে সত্য বিচার করিবার সংবিত ও বিচারবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগের সকল সমস্বষ্ট ব্যক্তির পরস্পর স্নেহ ও ভালবাসার দ্বারা হৃদয়ের মিলন না করিয়া, আকার, বর্ণ, ধর্ম্ম, ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য না ধরিয়া, যাহা প্রকৃতিতেও ভগবানের নিকট একমাত্র পবিত্র উপাসনা বলিয়া গ্রহণীয়,—কতকগুলিন বিশেষ পরিবর্ত্তন ও শারীরিক মতিগতির নিয়মকে মুক্তির মুখ্য কারণ ও সর্ব্বশক্তিমানের কৃপা পাইবার বিশেষ কারণ বলিয়া মনে করে। তাহারা বস্তুতঃ ভগবানের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তনের আরোপ করে, এবং মনে করে যে, তাহাদের শারীরিক কার্য্য ও মানসিক ভাবসকল অপরিবর্ত্তনশীল ভগবানের পরিবর্ত্তন আনিবার ক্ষমতা রাখে। আমাদের আপন কার্য্যসকল বা প্রাণের ভাবসকল কোন কারণেই ভগবানের ক্রোধ শাস্তি বা তাঁহার ক্ষমা ও কৃপাপ্রাপ্তির কারণ হইতে পারে না। কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা সত্যকেই ধরাইয়া দেয়।

শ্লোক।

সেখগণের বা আধ্যাত্মিক গুরুগণের এই সকল প্রবঞ্চনা কার্য্যের কোন মূল্যই নাই। মানবের প্রাণে শান্তি দান কর, এই একমাত্র ভগবদ্ উপদেশ।"

স্বল্প কথায় ইহাই বলা যায়, মানবজাতির মধ্যে যাহারা প্রবঞ্চক এবং যাহারা প্রবঞ্চিত হয় এবং যাহারা উভয়ের কোনটাই নয়—ইহারা চারিভাগে বিভক্ত।

প্রথমতঃ—এক শ্রেণীর লোক আছে, যাঁহারা জনসাধারণদিগকে তাহাদিগের দলে টানিয়া লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া সাম্প্রদায়িক উপদেশ, নীতি, ও ধর্ম্মমত পদ্ধতির রচনা করে, এবং জনসাধারণকে দুঃখে নিক্ষেপ করে ও পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের কারণ সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ—এক শ্রেণীর প্রবঞ্চিত লোক, যাহারা সত্যের কোন অনুসন্ধান না করিয়া তাহাদের মতে অনুগমন করে।

তৃতীয়তঃ—এক শ্রেণীর লোক, যাহারা প্রবঞ্চকের দল ও নিজেরাও প্রবঞ্চিত। তাহারা নিজেরা অন্যের বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অন্যকে সেই উপদেশ মত চলিবার জন্য টানিয়া আনে।

চতুর্থতঃ—যাহারা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের প্রসাদে প্রবঞ্চনাও করে না এবং প্রবঞ্চিতও হয় না।

হাফেজের রচিত শ্লোক।

কোন জীবের কোন অনিষ্টের জন্য ঘুরিও না এবং তাহা ব্যতীত যাহা খুসী হয় করিও। কারণ ইহা ব্যতীত আমাদের পথে, আমাদের আর কোন পাপই নাই।

এই স্বল্প কয়েকটী কথা, অল্প এবং প্রয়োজনায়, ভগবানের সৃষ্ট এই অধম জীবের মতে — কোন গোঁড়ামী বা একদেশী না হইয়া পক্ষপাতিত্ব শূন্য হইয়াই লিখিত হইয়াছে, এই আশায় যে সুস্থ মন ও চিত্তযুক্ত ব্যক্তিগণ ন্যায়ের চক্ষে ইহাকে দেখিবেন। "মানাজাবাতুল * আদিয়ান" নামে মৎ লিখিত অন্য এক গ্রন্থে ইহা বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। নকলকারীদিগের দ্বারা কোন পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায় লিখিত হইবার পরেই ইহা আমি মুদ্রিত করিয়াছি। সকলে জ্ঞাত হউন যে, এই গ্রন্থে যে সকল আশীর্ব্বচন মহাজনদিগের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আরব ও আজামের রীত্যনুসারেই অনুসরণ করা হইয়াছে মাত্র।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

সমাপ্ত।

এই অনুবাদে যথাসম্ভব রাজা রামমোহন রায়ের ভাষার ও রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে। ইতি— অনুবাদক।

---

* মানজারা পরস্পর কথাবার্ত্তায় ছাঁচেই রচনা তাহাকে মানজারা বলে; যাহাতে দুই তিন জনের অধিক ব্যক্তিও রহেন ও যে কোন একটি বিশেষ বিস্তৃত প্রকার তর্ক ও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন।

কি দেখা

আমি তখন সুদূর পশ্চিমে চাকরী করি। বৈশাখ মাস, চারিদিকে গাছ-পালাগুলি যেন মরিয়া বাঁচিয়া আছে। আফিস হইতে বাড়ী ফিরিতে একটু দেরী হইয়াছিল। সারাদিনের খাটুনির পর একটু বিশ্রামের জন্য সামনের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। চাকর তামাক দিয়া গেল, আপনার মনের গম্ভীরতার সঙ্গে গুড়্‌গুড়ির গম্ভীর আওয়াজে চারিদিক বেশ জমিয়া উঠিতেছিল; এমন সময় ডাকহরকরা আসিয়া তিনখানি চিঠি আমার হাতে দিয়া গেল। একখানা, সরকারের কাছ হইতে আমার পঞ্চাশ টাকা মাহিনা বৃদ্ধির সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, আর একখানা কয়লাওয়ালার হিসাব, তৃতীয়খানা আমার বাল্যবন্ধু উ···র কাছ হইতে। উ··· ও আমি এক সঙ্গেই পশ্চিমে আসি। আজ ছয় সাতদিন হইল, হঠাৎ উ··· দুই মাসের ছুটী লইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহা কেহ জানিত না, আমাকেও কিছু বলিয়া যায় নাই। আমার প্রথমে বন্ধুর ব্যবহার একটু অদ্ভুত লাগিয়াছিল, এই চিঠিটা পাইয়া আমারও মনে হইল, উ··· ও যেন মরিয়া বাঁচিয়া আছে।

উ···র পত্র।

প্রিয়—

তুমি যে আমাকে কি ভাবিতেছ জানি না। আমি কোন কারণে হঠাৎ এখানে চলিয়া আসিয়াছি। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, কাহাকেও কিছু বলিব না, তোমাকেও না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা চাপিয়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। একজন ব্যথার ব্যথী না পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইব। আমি এই পত্রের সঙ্গেই সরকারের কাছে কাজ ছাড়িবার আবেদন পত্র পাঠাইতেছি, আমার আর কাজ করিবার বাসনা নাই। এ পত্র তুমি যখন পাইবে, তখন আমি যে কোথায় থাকিব তা জানি না। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না, আর কারও সঙ্গে দেখা করিব না, তুমি বোধ হয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। তবে শোন,—আজ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার লক্ষ্ণৌতে আসি, তোমার বোধ হয় মনে আছে। তখন এখানে একজন ধনী মুসলমানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। একদিন আমার নূতন বন্ধুটি তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি যথাসময়ে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলাম। দেখিলাম, খালি খাওয়া নয়, গান-বাজনার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। সেখানে আমি মতিয়াকে প্রথম

দেখি। মতিয়া সে সময় এই প্রদেশে নামজাদা বাইজী ছিল, তুমি বোধ হয় জান। আমার তখন ৪৩ বৎসর বয়স, মতিয়ার ১৯ বৎসর। কিন্তু জানি না কেন সে রাত্রে আমি বাড়ী আসিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না। আমার খালি মনে হইতে লাগিল, ঐ দুটী চোখের ভিতর যেন কি দেখিয়াছি। কি যে দেখিয়াছি, তাহা জানি না। সারারাত প্রায় এমনি করিয়া কাটিল, ভোরের বেলায় ঘুমাইয়া পড়িলাম, কিন্তু তবুও ঐ দুটি চোখের হাত এড়াইতে পারিলাম না। স্বপ্নে দেখিলাম, মতিয়া কাঁদিতেছে, আমি তাহাকে সান্ত্বনার জন্য কত কথা বলিতেছি, কিন্তু সে মানিতেছে না। কতক্ষণ যে মতিয়া কাঁদিল, তা জানি না, হঠাৎ যে মুখ তুলিয়া বলিল,—"বাবুজি, এরা খালি আমার গান শোনে, আমার নাচ দেখে, আমার প্রাণের ব্যথার খোঁজ কেউ নেয় না। আমি ওদের মন রাখবার জন্য কত সাজ করি, কত রসের গান গাই, কত হাব ভাব কত রং ঢংয়ে ওদের ভোলাই, ওরা দেখে ভুলে যায় অথচ ভাবে আমার প্রাণ নেই। কিন্তু আজ আপনি কেন আমার দিকে অমন ক'রে কেন চেয়েছিলেন? আপনি কি বুঝ্‌তে পেরেছেন যে, আমাদের বাইরেরটা আমাদের ভেতরের নয়?" এই বলিয়া মতিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মাথা ভয়ানক ভার ঠেকিতে লাগিল, বুকের ভিতর যেন কিসের একটা ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। চাকর জলখাবার দিয়া গেল, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। কতক্ষণ যে গাড়ীতে বসিয়াছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখিলাম, যেখানে গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, গাড়ী সেইখানেই আছে, আর গাড়োয়ান গাড়ীর দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে গাড়ী চালাইতে বলিলাম, সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যেতে হবে?" আমি বলিলাম, মতিয়া বিবির বাড়ী।

গাড়ী মতিয়ার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। দরজায় একজন দাড়ীওয়ালা দরোয়ান বসিয়াছিল, সে আমাকে দেখিয়া সেলাম করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে মতিয়া বিবির ঘর দেখাইয়া দিতে বলিলাম। সে আমাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। মতিয়ার ঘরে গেলাম, দেখিলাম, সে ঘরের ভিতর একটা ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে। আমি ঘরে ঢুকিতে সে তাড়াতাড়ি উঠিবা বসিল। আমাকে বসিতে বলিল, আমি বসিলাম। কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ মতিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি হঠাৎ এই সময়?" আমি বলিলাম,—মতিয়া, কাল যখন প্রথম তোমায় গান শুনি, তখন থেকে আমার সব যেন কি রকম হয়ে গেছে। কাল সারারাত্রি আমি ঘুমুই নি, তোমাকে এমন ক'রে নষ্ট হ'তে আমি দেব না। তুমি আমার সঙ্গে চলে এস, আমি তোমাকে

বিবাহ করিব। মতিয়া হাসিল, আমি কাঁদিলাম। মতিয়া বলিল,—"বাবুজি, আমি মুসলমান, আপনি হিন্দু; আমাকে নিকা করিলে যে আপনার জাত যাবে।" আমি বলিলাম,—"আমি জাত মানি না।" মতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না, আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা মন আবার কেমন করিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, মন্ত্রমুগ্ধের মত মতিয়ার ঘরে গিয়া বসিলাম, মতিয়াকে আবার সেই কথা বলিলাম। মতিয়া আবার হাসিল, আমি আবার কাঁদিলাম। এমনি করিয়া যে কতদিন গেল জানি না। অবশেষে একদিন মতিয়া আমার কথায় রাজী হইল। আমি মুসলমান হইয়া মতিয়াকে বিবাহ করিব ঠিক করিলাম; বিবাহের দিন অবধি ঠিক হইয়া গেল। বিবাহের দুইদিন আগে সকালবেলা আমি মতিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। গিয়া যা দেখিলাম, তাতে আমার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। দেখিলাম, মতিয়া কাঁদিতেছে, তার হাতে একখানা চিঠি। আমি কাছে যাইতে সে চীৎকার করিয়া উঠিল—আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মতিয়া চিঠিখানা আমার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। চিঠিখানা মতিয়ার মায়ের লেখা। আমি চিঠিখানা—একবার, দুইবার, তিনবার পড়িলাম। চিঠি কাশী হইতে আসিতেছে। মতিয়ার মায়ের চিঠিখানা আমি এখানে তুলিয়া দিতেছি, তা' না হইলে তুমি সব বুঝিতে পারিবে না।

কাশী।

মা!

তোর কাছে একটা কথা বল্‌বো ব'লে আজ এই চিঠি লিখছি, তোর কাছে একটা কথা এতদিন লুকিয়ে রেখেছি। যা জান্‌বার সকলের অধিকার আছে আমি তা তোকে জান্‌তে দিই নি। তুই চিরকাল জেনে এসেছিস্ যে, তুই মুসলমানের মেয়ে। আমিও কখন ও কথাটা তোর কাছে খুলে বলি নি। কিন্তু আমার দিন ফুরিয়েছে। আমি তো চল্‌লুম। আমার যাবার পর যদি কখনও কোন বিপদে পড়িস্, কি কোন সাহায্য দরকার হয় ত নিচে যে ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা দিলাম, তার সঙ্গে দেখা ক'রে আমার নাম বলিস্, তা হ'লেই তিনি বুঝতে পার্‌বেন। উনিই তোর জন্মদাতা।……" দেখিলাম, আমাব নাম ঠিকানা ওখানে লেখা রহিয়াছে। মতিয়া কাঁদিতেছিল, আমি মতিয়াকে তার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিতে চাহিলাম, কিন্তু সে গেল না। সে আমার পা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি এখান থেকে চলে যান্। আমার কোন খোঁজ আর নেবেন না।" আমি এক বন্ধুকে মতিয়ার খোঁজখবর লইবার ভার দিয়া, তোমাদের কাছে ফিরিয়া গিয়াছিলাম। এই

গত দুই বৎসরে মতিয়ার খবর বড় বেশী কিছু পাই নাই। আমি ছুটি লইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার বন্ধুর এক পত্রেতে জানিলাম, মতিয়া মৃত্যুশয্যায়। আমি তখনি লক্ষ্ণৌতে তার করিলাম; তার উত্তরে শুনিলাম, মতিয়া আর ইহজগতে নাই। আমি তোমাদের কিছু না বলিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, মতিয়ার সৎকারের জন্য। মতিয়ার বন্ধু-বান্ধবেরা কবরের বন্দোবস্ত করিতেছিল, কিন্তু আমি গিয়া তাহার দেহ সৎকার করিয়াছি। আমি যখন এখানে আসি, তখন ভাবিয়াছিলাম, আবার ফিরিয়া যাইব, কিন্তু মতিয়ার সেই মরামুখে যেন একটা নূতন কি দেখিয়াছি, তাহা যতদিন না বুঝিতে পারি, ততদিন আর ফিরিব না।

ইতি—

উ.........

শ্রীচিররঞ্জন দাশ।

কমলের দুঃখ

(কমল—অমর)

অমর! ধরিত্রী আমাদের চিরযৌবনা, ছয় ঋতু যার অঞ্চলে খেলা করে, পুষ্প-স্তবকের মত অভিনব মধুর হাসিতে সে হেসেই ভুলে থাকে। যৌবন যেমন নিজের রূপে, নিজের সৌন্দর্য্যে ভুলে থাকে, ধরিত্রী তেমনি চিরযৌবনের হাসিতে চিরকাল হেসেই অস্থির। এই সে দিন পাণ্ডুবর্ণ বিবাট অস্থিমাংস বার করে রোদ পোহাচ্ছিল—আজ ফুলে ফুলে তৃণের হিল্লোলে সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে, নদীজলে পাখীর কলগানে, কুসুমেব বিকাশে সেই বিরাট হাসি ফুটে উঠেছে। কি মধুরই হাসি! যৌবনেব হাসিই হাসি। মধুময় হাওয়া চলেছে, কলঝঙ্কারে পঞ্চম গেয়ে উঠেছে, বিরাম নেই। কেবলই নূতন—কেবলই সৃষ্টি, বিরাম নেই পূর্ণ-যৌবন ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সবই বিচিত্র—বিচিত্র! যৌবনই সৃষ্টি, যৌবনই বিচিত্র! অনন্ত অনন্ত রকমে সে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। পাশে দিয়ে উৎক্ষিপ্ত জলধারা সাতরঙের হাসি ছড়াতে ছড়াতে ছুটেছে, সবুজ তৃণবীথি মৃদু মধুর-বায়ুর হিল্লোলে দুলে উঠেছে, আর ওই যৌবনরাজ্যের ফুলরাশির রূপে রূপে ঢল ঢল সৌন্দর্য্যের মাঝে রাজ্যের পাখীবা তান তুলেছে; যেন পরিপূর্ণ উচ্ছল আনন্দ—ধরিত্রীর শিশু; ধরিত্রীর সঙ্গে আকণ্ঠ আপনার আনন্দ আপনি পান কর্‌ছে। অনন্ত—অনন্তযৌবনা ধরিত্রীব বসন্তের নব বিকাশের মাঝে এক মহা সত্য নিহিত রয়েছে,—সে ওই প্রেম! প্রেমই শিশুর হাসি, যুবতীর ব্রীড়া, মাতার স্নেহ, দিদিমার হাসি! প্রেমই মন্ত্র; শত শত যুগ ধ'রে কেবলই বিকাশ ও প্রকাশ; সেই প্রেমের, সেই আনন্দের, সেই চির-যৌবনের বৈচিত্র্যের বিচিত্র হাসি। অঙ্কুর উদ্গত হয়, শাখা পল্লবে প্রসারিত হয়, গগনস্পর্শী বিরাট গঠন হয়, ফুলে ফলে ভরে যায়, আবার নূতন অঙ্কুর উদ্গত হয়, একই নিয়মে একই প্রেমের প্রকাশ আনন্দে-বৈচিত্র্যেই আনন্দ। ধরার অন্তরের অন্তরতম ধীরে ধীরে অন্তর হইতে বাহিরে, বাহির হইতে অন্তরে—সঙ্কুচন ও প্রকাশ চলেছে। আপনি হাসে, আপনিই হেসে ভুলে যায়। প্রেম আনন্দের উন্মাদনা,—যৌবন ধরিত্রীর উন্মাদনা,—উন্মাদনার উন্মাদনা,—হাসি; ফুলের হাসি, ফুল নিজে। এই বিচিত্র বিশ্ব এক বিচিত্র আনন্দের ফুল; রূপে রূপে, বর্ণে বর্ণে, শব্দে শব্দে, গানে গানে, প্রাণে প্রাণে এ চিরযৌবনা ধরা সেই এক প্রেমেরই স্বরূপ। তুমি

ভাব্‌ছ আমি কবিত্বের ফোয়ারা ছুটিয়েছি, তা নয় হে, তা নয়। কবিত্ব যদি সত্য হয়, তবে তাই। ওই চাঁদ উঠেছে—আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা, পূর্ণিমার হাসি সমস্ত বিশ্বকে যেন আনন্দ ধারে স্নান করাচ্ছে—তুমি হয়ত আমায় চন্দ্রগ্রস্ত মনে কর্‌তে পার,—এই পূর্ণিমার রাতেই আমার জন্ম, তাই চাঁদই আমায় পাগল করেছে। চাঁদ যেমন ধরার রূপ দেখবার জন্যে অন্ধকার থেকে ছুটে আসে, আমিও ধরার প্রতিছত্রে—বর্ণে সেই তার রূপ দেখি, বিভোর হই; সেই রূপ দেখবার জন্যে ধরায় এসেছি; সেই আনন্দ পান কর্‌বার জন্যেই মানুষ হ'য়ে এসেছি। রূপে রূপে সেই আনন্দ-রস পান কর্‌বার জন্যে এসেছি, মনুষ্যজীবনের সার্থকতা তাই। আমিও ধরিত্রীর যৌবনপুষ্পের একটা বৃন্ত, আমিও সেই আনন্দ-রস পান কর্‌ছি। বসে বসে ভাবছিলাম, তার পর মনে হ'ল,—যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে—সমস্ত তৃণপুষ্প থেকে—সব পাতার মর্ম্মর থেকে—যেন এক অপরূপ সুর উঠেছে; সে সুরে যেন বিশ্ব চমকিত, চাঁদের জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে সে সুর শূন্য হ'তে শূন্যে মহাকাশের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ছে,—চন্দ্র জ্যোৎস্নাধারার সঙ্গে ধরার রূপ গান কর্‌ছে; ধরা চন্দ্রের এক তরুণ বর্ণহীন গান গাইছে, সুরে সুরে মিশে গেছে। অকস্মাৎ ধরার মর্ম্মতল ভেদ করে, এক করুণ রাগিণী বাঁশীর রন্ধ্রে ফুকারে উঠ্‌ল। আমার কেমন মনে হ'ল,—এ কি করুণা, এ কি ঝঞ্ঝনা, এ আবার কোন্ অন্তিমের ডাক? গ্রহ হতে গ্রহান্তরে, চন্দ্র হতে ধরার বুকের পরে, তৃণ হতে বৃক্ষশীর্ষে, পাতার মর্ম্মরে, ঝিল্লীর ঝঙ্কারে বাঁশী সুর মিলায়ে মিলায়ে বেজে উঠ্‌ছে। প্রথম সুর যেন কোন অপরিচিত বেদনার ভিতর থেকে জেগে উঠ্‌ল, দাবানলের দাহন জ্বালার মত বাঁশী উন্মত্তের মত বাজতে লাগল—ভাবলাম, এমন স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে আগুন কার জ্বলেছে, তারপর সুর বড় মিঠা বাজতে লাগল। ভাসমান শুভ্রকমলরাশির ন্যায় জ্যোৎস্নায় সুর ভাসতে লাগল, যেন কার চরণে সেই সুর ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বাঁশী সকল রন্ধ্র খুলেছে; তারপর সুর গম্ভীর হ'য়ে এল। আকাশ পাতাল ঝিম্ ঝিম্ ঝমকে ঝমকে প্লাবিত হ'তে লাগল, দূরে দূরে দিগন্তে তার প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ছে। তারপর সুর যেন শত শত উন্মাদের করুণ ক্রন্দনে ফেটে পড়তে লাগল—প্রাণটা কেমন করে উঠ্‌ল! সামনে দেখি তাকিয়ে, দূরে সেই তুলসীতলায় যেখানে জবা দীপ দিত, সেই তুলসীমঞ্চতলে দীপ জ্বালা, আর তারই তলে—সেই বিরাট কৃষ্ণ-প্রস্তর খোদিত দৃঢ়বদ্ধপেশী সবল সরল বন-দেবতার ভীমমূর্ত্তের মত কালু ব'সে একটা বাঁশের বাঁশী বাজাচ্ছে। অবাক হয়ে শুন্‌তে লাগলাম। একি পূজো ও আহ্বান এক সঙ্গে! বাঁশী বাজতে লাগল—সে এক নূতন সুর—কখন শুনি নি—যেন সুরের মাঝে সব পাখীরই সুর আছে;

বাতাসের নিশ্বাস আছে, বিরাম আছে, মিলন আছে, বিরোধ আছে, শেষ পাপিয়ার তানের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে লাগল। শিরীষফুলের গাছের উপর একটা পাপিয়া সেই সুরের সঙ্গে যেন এক নূতন সৃষ্টি কর্‌তে লাগল। বাঁশীর তানে গাছের পাতা দুলে উঠে ফুল-আঁখি মেলে চায়, আকাশে মেঘ উদাস হয়ে ভেসে যায়, প্রকৃতিকে সজাগ ক'রে— ঘুমন্ত পাপিয়া জ্যোৎস্নায় দিক্‌হারা হ'য়ে,—চোখ গেল ব'লে সুরে ফেটে পড়ে,—এমন বাঁশী আর কখন শুনি নি। শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন তা জানি নি—সুরে সুরে যেন তখনও আলোড়ন হচ্ছে—'কোথায়,' 'কোথায়,' 'কোথায়,' 'চোখ গেল' 'চোখ গেল!'

বাঙলার বাইরে রোয়াকের উপর একখানা খাটিয়ায় শুয়েছিলাম, অকস্মাৎ যেন কার পরুষ কর্কশকণ্ঠে ঘুমভেঙ্গে গেল; শুন্‌লাম, কে যেন বজ্র-গম্ভীরস্বরে কড় কড় কর্‌তে কর্‌তে বল্‌ছে "তব্ ভি কুত্তা, আরে আরে কাল্লু আছে খাড়া, অব্ যাওগে কাঁহা"—আমি ধড়মড় করে উঠলাম। দেখি কাল্লু একটা লোকের গলা টিপে ধরেছে— লোকটাও ভীষণ জোয়ান; হাতে একখানা ছোরা—কিন্তু লোকটা ধীর শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটু জোরও করে নি। আমি কিছু ঠিক বুঝতে পার্‌লুম না— কাল্লু বল্লে—"আরে বাবু এ একটা কুত্তা আছে, এ হর্‌রোজ ইধার উধার করে, আর হামি সব বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে দেখি, আজ এ কুত্তা এই কুক্‌রী হাতে কব বাগিচামে আস্‌ছে। হামি ত রাতভোর বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে বাঁশী বাজায়—ত, হামি দেখি কি ইধার আস্‌ছে;—আরে কুত্তা, হাহা হাহা, আরে কাল্লু পাহাড়ী আছে, আদমি নিদে আছে, আরে তু বেইমান মারণে তৈয়ার—ছো!" কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সিঙ্গীর মত কাল্লু যাকে ধরেছে– সেও ত দ্বিতীয় সিঙ্গী বল্লেই হয়, যদি—কে জানে! তখন সেই লোকটা আমার নাম ধরে বল্লে,—"কমল বাবু! আমি সত্যই খুনে, তবে—আজ আমি আপনাকে মারব বলে আসিনি—তা হলে এতক্ষণ দুজনকেই বোধ হয় শেষ কর্‌তে পার্‌তুম,—তা নয়; আমি নির্জ্জনে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলাম। এই নিন্ সেই ছোরা, এখনও ওতে রক্ত শুকিয়ে কাল দাগ হয়ে ফুটে আছে, এই ছোরাই একদিন আপনার পিঠে আঘাত করেছিল। আমি বুক পেতে দিচ্ছি, এ হীন দেহ-প্রাণ যে অন্যায় করেছিল, তার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিন্। আমিই আপনার হত্যাকারী!" ছোরাখানা কাল্লু কুড়িয়ে নিয়ে—এমন উঁচিয়ে ধর্‌ল, কাল্লুর চোখ রক্তবরণ—"তব্ কুত্তা আপনা মুমে, বোল্!" আয়ে রাম রাম—কি কর কি কর" করে আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌তে কাল্লু হাত নামালে,—বল্‌লে "বাবুজী, মাপ কর, তোহার দুষমন্ আমার ভি দুষমন্ আছে।" কাল্লু তখন তাকে ছেড়ে দিলে। লোকটা বল্‌তে লাগল "কমল বাবু! আপনাকে খুন কর্‌তে পার্‌লে—আমি দশ হাজার টাকা পেতাম, পেতাম কেন দশ হাজার টাকা

পেয়েছিলাম, সে টাকাটা আমি ফিরিয়ে দিয়েছি,—আর এখন আমার টাকার বিশেষ দরকার নেই। যারা আমায় এখানে নিযুক্ত করেছিল—তাদের নামে আপনার কাছে কি আর বল্‌ব—আমার বল্‌বার বিশেষ কিছু নেই। আমি যা বলতে এসেছিলাম, সে বলা হয়েছে। আমার সাধ—আপনি আমাকে শাস্তি দিন্। যখন আপনাকে আমার মেয়ে বাঁচায়—তখন তার মুখে যে কথা শুনেছি, আমার সমস্ত চৈতন্য ফিরে এসেছে সে ওই "ভগবান্"। কিন্তু বাবু আমার আর বাঁচবার ইচ্ছা নেই, আমার সে মেয়ে হেনা—একদিন যে রাণী—" বলেই লোকটা কেঁদে ফেল্‌লে। কাল্লু দেখে, বলে, "আরে আরে তোম কুত্তা নেহি, তোর আবি জান আছে রে—জান আছে! আরে যব রোতে হেঁ তব্ মার্‌না কাহে-কু আরে ছোঃ! বাবু, বাবু, ইন্‌কো মাপ কর্—" আমি বল্‌লাম, 'তোমার নাম?' "আমার নাম,—নাম আগে ছিল শশী, এখন হয়েছে 'মেধো'—তা নাম যাই হোক্—আমার শাস্তি কি?" আমি বল্লাম, "দেখ শশী তোমার আগেকার সব কথা আমার জান্‌তে ইচ্ছা হলেও এখন আর জান্‌তে চাই নি। তুমি যখন আমার কাছে সত্য বলেছ, তখন তুমি সত্যের,—তুমি এখন আমার বন্ধু। তোমার যদি থাক্‌বার স্থান না থাকে আমার কাছে থাক। তুমি আমায় হত্যা কর নি—আমায় বাঁচিয়েছ। আমি মানুষের ওপর ঘৃণা রেখেছিলাম,—তোমার ছুরিকার আঘাতে আমার সে ঘৃণা মরেছে। তোমার মেয়ে আমাকে বাঁচিয়েছে—আমি তার কাছেও যেমন কৃতজ্ঞ, তোমার কাছেও তাই। তুমি আমার অজ্ঞান নাশ করেছ, তুমি গুরু।" লোকটা খানিক কি ভাবলে, আকাশের পানে চাইলে, বল্‌লে, "হাঁ সত্যি ভগবান্, ভগবান্ আছে, সে সব শুন্‌তে পায়, বাবু আমার থাকবার স্থান আছে;—আকাশ আছে, মাটী আছে, নদী আছে, শ্মশান আছে—আছে ভগবান আছে।" কাল্লুটা খানিক চুপ করে রইলো—"আরে আরে শির নোয়া, শির নোয়া, তুই বড় মিঠে দুষমণ আছিস্ রে,—বড়া মিঠে দুষমণ! আরে জানলিতে আস্‌ছিস্, অব্ রোতে রোতে ভগবানকে নাম লিচ্ছিস্! বড়া মিঠে দুষমণ,ওরে বড়া মিঠে দুষমণ!" লোকটা নীরবে আমায় নমস্কার করে বিদায় হ'ল! কাল্লু বল্‌ছে "সবভি ত ভাল আছে। তব্‌ভি এ হল কেম্‌নে—দুনিয়া কি ফিকির!" অমর! প্রেম এমনই জিনিষ যে শত্রুকেও সে মিঠা দেখে—এই অন্ধকার কাল পাথরের ভিতর কি আগুন জল্‌ছে—যে তার দীপ্তিতে সব উজ্জল হয়ে উঠ্‌ছে। তার সেই প্রতিমাকে স্মরণ করে, তারই কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। তুলসী-মঞ্চে আলো জেলে সে তার প্রেমের নিদর্শন ফুটিয়ে রেখেছে। মন্দ যা তারও প্রেমে জন্ম, ভাল যা তাও প্রেমে জন্ম! লোকটা চলে যাবার পর কাল্লু সেইখানে বস্‌ল। আমি বল্লাম, 'আচ্ছা কাল্লু, তুমি এমন বাঁশী বাজাতে শিখলে কোথা থেকে?' কাল্লু বল্‌লে, "আরে বাবু ওই পাখী কেমন করিয়া গায়, ওসব যেমন মনে হোয়, বাজাই। পাগলী বড়া মিঠা গান গেত—ওহি সব কেমন

হোয়, অব্ বাঁশী বাজাই। বেচারী, তার বাপ্টা বড়া ভাল ছিল।" কথা বল্‌তে দেখি আঁখি কোণে ছল ছল জল, টল টল করছে। কাল্লু একটা ঢোঁক গিলে সাম্‌লে নিলে। তার পর বল্‌লে, "আরে বাবু এ লোক পাগল আছে, আরে আদমি আদমিসে লড়াই করে মা:র কাটে, এ লোক সব পাগল আছে। এ সব আপনা আপকো মারে, এ সব পাগল আছে নেই বাবু? হামি দেখি কি পাগলী এই ফুল লেকে কত বাত চিত করত, হাম সে বহু সমঝায় না, তব্‌ভি ভাবতো ইতো বড়া মিঠা আরে ফুলমে যব প্রাণ নেই বোয়, তব্ কাহে ও ভোঁওয়া ভোঁ ভোঁ লাগে; তব্ সব দিল্‌ত একিই আছে, তব্ ঝগড়া কাহে বাবু, বখেড়া ঝামেলা ছোঃ! হাম ওই বাজ্‌রা ক্ষেতী মে চাষ করে, রোটী পাকায়; আব নন্‌দিয়া কিনারে বালু খোদ্ কর আঁজলি আঁজাল পানি পি লে, আর এ রাত্‌মে বংশী বাজায়, আর মৌজমে হ্যায়, তোম ভি হামার দোস্ত আছে, ও ভি হামার দোস্ত আছে—বাবু এয়সাই হো, কি দিল মে দিল বহনা ত দুষমণ ভি প্রীত্ করে—নেই বাবু? দেখ বাবু ও পাগলী একঠো গান গেত—কেয়া হামার ত ও ঠিক পাত্তা না সমঝায়

সুখ দুখ সব মন কি বরেথা।
প্রীত্‌সব সে সার।"

ত হামি, মন মন শোচে কি, ই-ত ভালা বড়ি মিঠা বাত দেখে 'মন কি বরেথা,—যব প্রীত কর ত সুখ ভি চলে যায়, দুখ ভি চলে যায়, বড়িয়া মিঠি বাত্ প্রীত্ সে সব সার। দেখ বাবু হাম জানে ও পাগলী একঠো ফুল হ্যায়—ও সুখ ভি নেই জানে, দুখভি নেই জানে, যেয়সে ইয়ে সব গুলাব চামেলী বেলা এয়্‌সেই ও হ্যায়। গান গেত যায় লাখোঁ পাপিয়া উহ্ আকাশমে চুলবুল করে, ত ফুকার ত ফুকার, ত ফুকার--মুমে এয়সি প্রীত্ কি বাণী যায় ঝোর ঝর্‌ঝর্ পিয়াস না রোয়, মন ভোওরা উদাস ভয়ো কি, ফুল না পাড়তা—না ডাঁট না পেড়, না ঘাঁস না মাট্টি, না মেহা না পানি, এহ্ মন ভোঁওরা উদাস হোকর, বাওয়া না কেয়া আচ্ছা বন্ যায়। হামি মন মন অব শোচ করে, কি—সুখ ভি নেহি, দুখ ভি নেহি, তব্ কা ডর, তব্ হ্যায় কোন চিজ—" কাল্লু এই সব বল্‌ছে, আমি নির্ব্বাক হয়ে হয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লাম—হঠাৎ একটা ভীমরাজ ডেকে উঠ্‌ল। ফিবে চাই, পূর্ব্ব-দিকের আভায় ফরসা দেখাচ্ছে। কাল্লু বল্‌লে, "অব্ ভোর কা হাবা চলত্ চলত্, অব নন্‌দিয়া যায় আস্নান করে ত ক্ষেতীমে যায়।" বলে চলে গেল খানিক দুব থেকে শুন্‌তে পেলাম, সে গাইতে গাইতে যাচ্ছে—

"মন ভোঁওরা উদাস ভয়ো
কা করুঁ অব সুখ দুখ লে করুঁ"

কি গম্ভীর সুর! সত্যই মন যেন কোথায় উদাস হয়ে ধায়,- তখন সে আবার গাইছে,—অন্ধকার যেমন নিজের বুকের ভিতর হতে সূর্য্যকে প্রকাশ করে।

"দিল্‌কা রোশনি দিল্‌কা জাগায়া
কা করু অব সুরজ সে কর"

সত্যই যখন অন্তরাত্মা তার অক্ষয় দীপ জেলেছে, তখন আর ও সূর্য্যের জন্য ভাবি কেন —অন্ধকার ত আমার আর নেই। অমর! প্রেম কি মহান্ সমস্ত বিশ্বকে গণ্ডূষে পান করেছে—জহ্নু মুনির মত আবার নিজেকে সমস্ত বিশ্বের মাঝে বাতাসের মত ছড়িয়ে রেখেছে। তখন ভোর হয়ে এসেছে, লক্ষ পাখীর কলস্বরে ধরায় আলোকের আনন্দ কলরোল উঠ্‌ছে, শিশির নিষিক্ত পাখা ঝাড়তে ঝাড়তে কোথায় কোথায় উড়ে গেল, কপোত কপোতীর পাখার শব্দে হাসি,— ঘুঘুদম্পতীর পাখার শব্দে বেদনার করুণ ক্রন্দন বাজতে লাগল, ভোর হল। নদীতীর হতে শান্তিস্নিগ্ধ বায়ুর পরশে প্রাণ যেন সজাগ হয়ে উঠ্‌ল,—দেখলাম, কাল্লু স্নান করে দূরে চলে যাচ্ছে গান গাইতে গাইতে—

"হাম্ না চাঁয়া, তুম্ না চাঁয়া
চাঁয়া মেরে আধার—
যব্ আঁধিয়া টুটে, ভোঁওরা ছুটে
ফুল কা এয়সি বাহার
অব্ দিয়া লিয়া সব্ সঙ্গ চলি যায়
প্রীত্ সব্ সে সার—
মনুয়া প্রীত্ সব্ সে সার॥"

অন্তরের অন্তরতম যখন জেগে উঠে, পরিপূর্ণ বিশ্বের প্রীতিই তার সার পদার্থ। জন্ম-মরণের দোলার মাঝে সে দেখে সবই প্রেমের হিন্দোল! কাল্লু তখন ঠিক বলেছিল,দুনিয়া কি ফিকির—দুনিয়ায় ফিকির করলেই, গণ্ডী দিলেই, স্বার্থ জাগলেই, শয়তান হাজির,—শয়তানকে নিজেরাই গড়ি। আগুনই জ্বালি কিন্তু পোড়াই পরকে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঁচতে চাই, তাই পাপ সৃষ্টি হয়। তাই পাপী পরকে পুড়িয়ে, নিজে শেষ পুড়ে মরে। মানুষ শুধু দেহ নয়, দেহ ছাড়িয়ে আরো একটা আছে, সে ভিতরে আছে–বাইরেও আছে,—দূরেও আছে—নিকটেও আছে। সবই সমান—যত কাছে আসে তত সমান সমান হয়ে মিশে, যত দূরে দূরে চলে যায় ততই বৈচিত্র্য হয়। প্রেমে যখন বিশ্বের সমস্ত রশ্মি কেন্দ্রগত হয়, তখন সব সমান হয়ে আসে,যখন সে দূরে দূরে চলে যায়—কেন্দ্রচ্যুত হয়—নিজেকে কেন্দ্র করে জগৎ গড়তে যায়, তখনই পাপ মূর্ত্তিমান হয়। পাপেরও সার্থকতা প্রেমের উপলব্ধি, পুণ্যেরও সেই প্রেমের উপলব্ধি। আদি অন্ত সবই প্রেমে

সৃষ্টি। তাই বলেছি তোমায়—ধরিত্রী চিরযৌবনা; সৃষ্টির চাতুর্য্যে এত বর্ণভেদ, এত বৈচিত্র্য, এত সুরের সমাবেশ, এত ঝঙ্কার, এত ঝঞ্ঝনা, এত তৃষা, এত শান্তি, এত রৌদ্র, এত বর্ষণ। শশী যখন আমায় মেরেছিল টাকার লোভে, তখন সে নিজেকে কেন্দ্রে গড়ে নিয়েছিল, যখন মনে পড়ল ভগবান্—তখন নিজের কেন্দ্র হারিয়ে গেল; তখন সেই মহাকেন্দ্রের বিন্দু মধ্যে নিজের রশ্মি প্রতিফলিত দেখলে,—সে ফিরলো; সঙ্গে সঙ্গে আমারও দুর্ব্বলতা—হেনাকে বেশ্যা বলে ঘৃণা,—আজন্মের ঘৃণার লোপ করে দিলে। বুঝালে যে.—ঝঞ্ঝা. যুদ্ধ, লোভ, মোহ, কামনা, আঘাত, চাঞ্চল্য, পতন, মৃত্যু সবই—হত্যা পর্য্যন্ত সবই—সেই জীবনের চেতনা। যে চেতনা নিজেকে জান্‌বার জন্যে মহাবিশ্বের সংবাদ নেবার জন্যেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'চ্ছে। যে দীপ ভাল করে জ্বালা হয় নি, সেই দীপখানি ভাল করে জ্বেলে, কাল্লু দেখলে প্রীত্‌ সব সে সার। শশী দীপ ভাল করে জ্বালে নি—কাল্লু দীপ ভাল করে জ্বেলেছে—নইলে একই—অন্ধকার থেকেই আলোর জন্ম, আলো থেকেই অন্ধকারের জন্ম। এ দার্শনিকতা নয় বন্ধু! আলো যখন ফুরিয়ে আসে, প্রেম যখন স্বার্থের খোলে পড়ে মারা যায়, তখনই বিশ্ব অন্ধকার হয়। অন্ধকার যখন স্বার্থের গণ্ডী ভেঙে লাফিয়ে উঠে দপ্‌ করে জ্বলে যায়, আলো দেখা দেয়! একই প্রেম— শুধু বিকাশের তারতম্য; বিকাশের তারতম্য আছে বলেই—বিচিত্র; বিচিত্র বলেই অনন্ত; তাই এখন হ'চ্ছে সৃষ্টি, তাই শুধু হচ্ছে—ধ্বংসও তাই রূপান্তর। তাই মুক্তি, তাই বন্ধন, এখন তাঁকে নেমে আসতে হবে, নেমে এসে এই আমাদের সঙ্গে কাঁদা হাসা খেল্‌তে হবে। তোমার আমার বন্ধন আছে, তাই মুক্তির সার্থকতা; মুক্তিও আছে, তাই বন্ধনের সার্থকতা। কাল্লু গাইলে—কা করু অব সুরজলে কর। তার হৃদয় মুক্ত সে বুঝছে বন্ধন আছে—তাই সে মুক্ত। শশী বন্ধন যে আছে, তা এখন বুঝেছে, কাযেই সেও মুক্তি বুঝবে। তুমি হয়ত বল্‌বে কমলদাদা কেবল মহা মহা তথ্য নিয়ে পাগলাম করে—তা হয়ত হবে; কি জান, উট কাঁটা ঘাস না খেয়ে থাক্‌তে পারে না। কেউ কেউ আছে, তারা কেবল মৃণালের উপর পদ্মের বীজের মুড়ি খায়। যার যা—যে যা বোঁচকা বেঁধে নিয়ে আসে, তাই নিয়েই সে নাড়াচাড়া করে, আর পাবে কোথায়?

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭-১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি ও তত্ত্ববিচার

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তির ইতিহাস ও ভূগোলদর্শন মোটামুটি শেষ করিয়া এইবার আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ববিচারের দিকে অগ্রসর হইব।

আধুনিক ব্রাহ্ম-সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথকে দার্শনিক জগতেও একটা প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য চেষ্টা দেখা যায়। ইহাঁরা বলেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদকে, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষ হইতে বিচার ও মীমাংসা দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ শঙ্কর-প্রতিবাদী এক নূতন দার্শনিক। ইহাঁরা আরও বলেন যে, শাঙ্কর-অদ্বৈত ও মায়াবাদে দেশ মোহাচ্ছন্ন হইয়া উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করকে খণ্ডন করিয়া দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করিয়াছেন।

শঙ্কর-পন্থী সকলেই শ্রীশঙ্করকে এক অর্থে বুঝেন না। তাহার কারণ, শাঙ্কর অদ্বৈত ও মায়াবাদ দেশকে যতই আচ্ছন্ন করুক না,—শঙ্কর-শিষ্যদের জীবনে তেজ ছিল, চিন্তায় স্বাধীনতা ছিল, ধর্ম্মে নিষ্ঠা ছিল। ফেরঙ্গ মোহাচ্ছন্ন দেশ, সেই তেজ, নিষ্ঠা ও স্বাধীনতা আর একবার কি ফিরিয়া পাইবে না? দেবেন্দ্রনাথ এবং তদনুগামীরা শ্রীশঙ্করকে যে অর্থে বুঝিয়া তাঁহাকে খণ্ডন করিতে বসিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য,—শঙ্করসম্বন্ধে তাহাই একমাত্র অর্থ নহে। অনেক পণ্ডিতের মতে সম্ভবতঃ তাহা সদর্থও নহে। তথাপি দেবেন্দ্রনাথ সাধারণভাবে শঙ্করকে যে অর্থে বুঝিয়াছেন, এবং বুঝিয়া তাঁহাকে খণ্ডন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমরাও আচার্য্যকে এ ক্ষেত্রে সেই অর্থেই বুঝিয়া, দেবেন্দ্রনাথের খণ্ডন-প্রণালীর ক্রম ও তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রহ্মসভায় আসিয়া যোগ দেন, তখন আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ইহার একমাত্র কাণ্ডারী। রাজা রামমোহনের ব্রহ্মবাদ যাহাই হউক, রাজার পরে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের হস্তে ব্রহ্মসভার ধর্ম্মমত শঙ্করানুরূপ অদ্বৈতমতাশ্রিত বলিয়াই অনুমান হয়। দেবেন্দ্রনাথ, সুতরাং বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের হস্ত হইতে, বিনা বিচারে এই শাঙ্কর-অদ্বৈত মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং অক্ষয়কুমার আসিয়া শাঙ্কর-অদ্বৈত-মতের প্রতিবাদ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের মনে স্বাধীন ভাবে এই অদ্বৈত-বাদ সম্বন্ধে কোন সংশয় বা প্রশ্ন জাগে নাই। তার পর যেমন বেদের প্রামাণ্যকে,

তদ্রূপ এই শাঙ্কর অদ্বৈতবাদকেও, দেবেন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নহে,—অক্ষয়কুমারের নিতান্ত অনুবর্ত্তী হইয়া ত্যাগ করেন। তবে বেদ পরিত্যাগে দেবেন্দ্রনাথ স্বকীয় সাহস ও সামর্থ্যের বাহিরে গিয়া পড়ায়, ভুলিয়াছেন একটু বেশী, আর সময়ও লইয়াছিলেন কয়েকটি বৎসর। কিন্তু অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ, বেদ পরিত্যাগের মত দুঃসাহসের কার্য্য নয় বলিয়া, তাহা স্বভাবতঃই অল্পসময়ে ও নিঃশব্দে সম্পন্ন হইয়াছে। এবং সেই জন্যই ইহা অনেকের দৃষ্টিকে এড়াইয়া গিয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনটি জিনিষ হইতে রক্ষা করিবার কথা বলিয়া গিয়াছেন। যথা—(১) পৌত্তলিকতা (২) খৃষ্টানধর্ম্ম (৩) বৈদান্তিক মত। তাঁহার 'আত্মজীবনীতে' যেখানে এই বৈদান্তিক মতের কথা বলিয়াছেন, সেখানে তিনি অদ্বৈতবাদকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাঙ্কর-অদ্বৈতই যে একমাত্র বৈদান্তিক মত নয়—বৈদান্তিক মতের যে আরো বিচিত্র শাখা-প্রশাখা আছে,—দেবেন্দ্রনাথ তাহা জানিতেন না। জানিলে কখন ওরূপ বলা সম্ভব হইত না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ তিনি রামানুজ দর্শন পড়িয়া থাকিবেন। কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, উহা অনুমানমাত্র এবং প্রমাণের নিতান্তই অভাব। প্রমাণাভাব সত্ত্বেও যে সমস্ত অনুমান দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে চলিতে পারে, ইহা তাহার মধ্যে একটি। যাহা হউক, ইহা দেখা গেল যে, অদ্বৈত-বাদকেই একমাত্র বৈদান্তিক মত বলিয়া ভুল করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মধর্ম্মের" পক্ষ হইতে তাহাকে অস্বীকার করিলেন। কেননা অদ্বৈতবাদসম্বন্ধেও তখন তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল যে, "বৈদান্তিকেরা ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে।" সব বৈদান্তিকেরা তো ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলেই না। শাঙ্কর বৈদান্তিকেরাও, ঈশ্বরকে আর যাহাই করুক, শূন্য করিয়া ফেলে না। শাঙ্কর 'বেদান্তে' ঈশ্বরের বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, দেবেন্দ্রনাথ 'ঈশ্বর' আর 'ব্রহ্মকে' এক অর্থেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। বেদান্তের যে কোন শাখার সহিত পরিচিত যে কোন বালকেই ঈশ্বর ও ব্রহ্মের পার্থক্য বুঝিতে পারে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাহা পারেন না। এবং এই জ্ঞানে তিনি শঙ্করের প্রতিবাদী ?

আত্মজীবনীতে অদ্বৈতবাদসম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা ছিল, তাহা আমরা দেখিলাম। ইহার দুই তিন বৎসর পরে "আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা" নামধেয় একখানি কতিপয় পৃষ্ঠাসমন্বিত ক্ষুদ্র পুস্তকে তিনি শাঙ্করভাষ্যের প্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদ ও মায়া-বাদকে কিরূপে নিরস্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন,—এক্ষণে তাহাই দ্রষ্টব্য। শাঙ্কর অদ্বৈতকে দেবেন্দ্রনাথ মোটামুটি এই ভাবে নিলেন যে,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব আর ব্রহ্ম এক। অর্দ্ধ শ্লোকের এই জগৎ, জীব, আর ব্রহ্মমীমাংসাকে দেবেন্দ্রনাথ কোন্ অস্ত্রে ছেদন করিতে অগ্রসর হইলেন, আমরা তাহা দেখিব। জড়ের সমষ্টি এই জগৎ,

আর জীবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "জড়ের প্রধান গুণ যে বিস্তৃতি, তাহা জীবাত্মাতে নাই ; জীবাত্মার প্রধান গুণ জ্ঞান, তাহা জড়েতে নাই।"

ইহা দেকার্ত্তের তর্জ্জমা। অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ, ব্রাহ্মণোত্তমের এ কি প্রকার হীন পরানুকরণ ? ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ কি কহেন ? এস্থলে ?—তবে তর্জ্জমাকে যাহারা মৌলিকত্ব দিতে চান এবং দিয়া আসিতেছেন এই ফেরঙ্গ যুগে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা বলি, তর্জ্জমা চিরকালই তর্জ্জমা। দেবেন্দ্রনাথের হইলেও তর্জ্জমা। পরঃ পরঃ সদা। দেকার্ত্তকে হুবহু নকল করিয়া, অথচ কোথায়ও তাহা স্বীকার না করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ জড় অথবা জগৎ জীবাত্মাকে অত্যন্ত ভিন্ন সাব্যস্ত করিলেন। তা বেশ করিলেন। কিন্তু এই পরের দ্রব্যটি তিনি না বলিয়া লইলেন কেন ? অর্থাৎ লইয়া কোথাও তাহা স্বীকার করিলেন না কেন ? ইহা ব্রাহ্মণোত্তমের (?) কার্য্যই বটে ! শ্রদ্ধাস্পদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অবশ্য এত সব তলাইয়া দেখেন নাই। দেখিবার অবসর তাঁহার নাই। অথচ এই নিতান্ত অনবসরের মধ্যেও তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক সত্য বিরুদ্ধ পূর্ব্বতন ভ্রান্তমতের পুনরাবৃত্তি করিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইতেছেন না। যাহা হউক তারপর দেবেন্দ্রনাথ লিখিলেন, "জড় হইতে জীবাত্মা যত ভিন্ন, তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন।" দেকার্ত্ত দর্শনকে অনুকরণ করিয়া দেখা গেল যে, জড়ে যাহা আছে জীবে তাহা নাই, আবার জীবে যাহা আছে জড়ে তাহা নাই। জড় ও জীব সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইটি জিনিসের বিভিন্নতা অপেক্ষা জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভিন্নতা 'অনন্তগুণে' অধিক ! পরমাত্মা-ধ্যানে নিয়ত মগ্ন দেবেন্দ্রনাথ এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিলেন। আবিষ্কার—কেন না এই সিদ্ধান্ত আর ইতিপূর্ব্বে সম্ভবতঃ কেহ পৌছিতে পারে নাই, এবং অনেক দিন পরেও কেহ পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এবং এই সিদ্ধান্তের আবিষ্কারেই না কি দেবেন্দ্রনাথের দার্শনিক বুদ্ধির অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি এরূপ 'খাপ' ছাড়া (?) সিদ্ধান্তে কেন আসিলেন ? আছে,—তাহারও কারণ আছে। কিরূপ কারণ ? কহিতেছি শ্রবণ করুন। শঙ্কর বলেন, জীব আর ব্রহ্ম এক। দেবেন্দ্রনাথ শঙ্কর প্রতিবাদী। কাজেই দেবেন্দ্রনাথকে বলিতে হইল, জীব আর ব্রহ্মে কোন সম্পর্ক নাই।

"ইহা ছাড়া যে আর কোন উপায়ই ছিল না !"

কেমন, শারীরক ভাষ্য খণ্ডন হইল কি না ? এবং শঙ্করের প্রভাব হইতে দেশ মুক্তি পাইয়া—কৈবল্য বা নির্ব্বাণ ছাড়িয়া, স্বাধীন ইচ্ছাকে জাগাইয়া, নৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল কি না ? দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে শঙ্কর প্রতিবাদকারী দার্শনিক। আর এইরূপেই সমগ্র দেশকে কৈবল্যবন্ধন হইতে মুক্তিদাতা—কি আর কহিব ? শঙ্কর-

দর্শনসম্বন্ধে কতটা অজ্ঞতা, আর দেবেন্দ্রনাথসম্বন্ধে কতটা অহমিকতা এবং দেশসম্বন্ধে কতটা অন্ধতা থাকিলে,—সাহিত্যে এবংবিধ আবর্জ্জনা আসিয়া জমিতে পারে,—আমি তাহা পরিমাণ করিতে পারি না। কিন্তু আর কেহ কি তাহা পারেন না? বাঙ্গলা দেশ কি আজ এমনি পণ্ডিতশূন্য? শুধু নকল ন্যাকামীর বাচালতায় পরিপূর্ণ?

জীব আর ব্রহ্মে কোন সম্পর্ক নাই,—এই কথা বলিলেই কি শাঙ্কর-অদ্বৈত খণ্ডন হইয়া যায়? কেন সম্পর্ক নাই, ইহার কোন্ দার্শনিক যুক্তি দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে দিয়াছেন? জীব আর ব্রহ্মের ঐকান্তিক ভিন্নতা দর্শন-প্রয়াসী দর্শনের উদ্ভব অস্মদ্দেশেও হইয়াছিল, কেননা তখন আমাদের দার্শনিকেরা দর্শন করিতেন, দেকার্ত্তের ইংরেজী অনুবাদ হইতে বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া, তাহাই বাঙ্গালীর দর্শন বলিয়া চালাইয়া দিবার নির্লজ্জতাকে তাঁহারা সম্ভবতঃ খুবই ঘৃণা করিতেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেই সমস্ত দেশীয় দর্শনে অন্ধ হইলেন কেন? ইহার উত্তর অন্ধ এবং অন্ধেরা দিবেন! শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিবেদী মহাশয়ও ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন। আমরা দিতে চাহি না।

জীব আর ব্রহ্মের ভিন্নতা প্রয়াসী দেশীয় দর্শনসমূহের কোন একটির সহিতও তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল,—ইহার প্রমাণাভাব। জীব আর ব্রহ্মকে পৃথক্ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া,সেই সমস্ত পরিচিত ও প্রচলিত দার্শনিক যুক্তিসমূহের একটিরও অবতারণা তিনি করিতে পারেন নাই। সেই সমস্ত যুক্তি-সমূহের সম্যক্ বিচার আলোচনা ও মীমাংসা ব্যতীত যে কোনরূপ দার্শনিক সিদ্ধান্তই আমাদের দার্শনিক চিন্তার ধারায় কি করিয়া যুক্ত হইতে পারে, বা স্থান পাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝি না।

দেশীয় দর্শনের অন্ধতা ছাড়িয়া দিলাম। বিদেশীয় দর্শনেও ত দেবেন্দ্রনাথকে খুব চক্ষুষ্মান্ দেখি না। বরং বিশিষ্ট প্রকারে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির হীনতার পরিচয়ই পাই। তিনি দেকার্ত্ত দর্শনের যুগে বাস করেন নাই। কার্ত্তেজীয়ান দর্শনের পরে পরে অনেকগুলি ধাপ উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ সেই সমস্ত ধাপ-গুলি ঠিক ঠিক দেখিতে পান নাই। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে যাহাও বা দু' একটা ধরিতে পারিয়াছেন, তাহাও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। উঠিতে গিয়া ক্রমাগত আছাড় খাইয়া পড়িয়াছেন। মনোবিজ্ঞানে দেবেন্দ্রনাথের কোনরূপ শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া, কার্ত্তেজীয়ান দর্শনপ্রণালীর কোন বিশিষ্ট সমালোচনা তাঁহার মনের মধ্যে জাগে নাই। লকের অনুসন্ধিৎসা. হিউমের সংশয়বাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই দেকার্ত্ত দর্শন কিরূপে দার্শনিক চূড়ামণি ক্যান্টের মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়া, ক্রমে পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ তাহার ক্রম, তাহার বৃদ্ধি, তাহার পরিণতি বুঝিতে পারেন নাই। কেননা শ্রীশঙ্করের মত শ্রীক্যাণ্টও খুব সহজবোধ্য নয় কি না? দেবেন্দ্রনাথের পক্ষেও। তাহা আর যেই হউক, দেবেন্দ্র-

নাথ-পুত্র দার্শনিক সমালোচনায় সব্যসাচী, শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ অস্বীকার করিবেন, এমন বিশ্বাস আমরা করি না। কেননা এমন প্রমাণ দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা হইতে আমরা পাই না। কিন্তু আমাদের এই কথা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ শাঙ্কর বেদান্তী বা হুবহু ক্যাণ্ট-অনুগামী। বরং আমরা দেখিয়াছি যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ শাঙ্কর বৈদান্তিকেরা ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে, ঠিক এই কথা না বলিলেও, তাঁহারা যে কালিদাসকে খালিদাস করিয়া ফেলে, এমন কথা বলিয়াছেন। তথাপি বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহারা দার্শনিক পরিভাষা কপ্‌চাইয়া, জার্ম্মাণ না জানিয়া, কেবল কেয়ার্ড-গ্রীন কেতাবের হিগেল সিদ্ধান্তে শাঙ্কর প্রতিবাদ করিয়া বা চিন্ত্য (?) ভেদাভেদ বাদ ব্যাখ্যা করিয়া, খুব সস্তায় দার্শনিক নাম কিনেন, মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ সে শ্রেণীর নহেন। হেগলের ডাইলেক্‌টিকের চড়ায় ঠেকিয়া, তাঁহার দার্শনিক 'নৌকাডুবি' হয় নাই, বা উক্ত চড়ার চোরা বালিতে তাঁহার পা আটকাইয়া যায় নাই, ইহা আমরা দেখিয়াছি; এবং দেখিয়া মনে মনে সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

দেবেন্দ্রনাথ, দেখা যাইতেছে,—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক আছে,—ইহা দার্শনিক বিচারে স্বীকার করেন না। জীব আর ব্রহ্মের এই সম্পূর্ণ ভেদ কিসের জোরে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চান, তাহাও পরিষ্কাররূপে বলিতে পারেন না। জাতীয় কিংবা বিজাতীয় এ দুইয়ের কোন এক ধারার দার্শনিক যুক্তির পারম্পর্য্যকেও তিনি আগাগোড়া বুঝিতে সক্ষম হন নাই; এবং ইহার কোন এক ধারাকেও বিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই সুতরাং কি অস্মদ্দেশীয় কি অন্যদেশীয় কোন দার্শনিক জগতেই তাঁহার জীব আর ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধান্তের কোন স্থান নাই। যাহারা নিষ্ঠাহীন, যাহারা স্বভাব-দোষে এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের ভাগ্যে এইরূপ ইতঃভ্রষ্ট-স্ততোনষ্ট, না হইয়া উপায় কি?

জীব আর ব্রহ্মের এইরূপ ঐকান্তিক ভেদ দার্শনিক ক্ষেত্রে প্রচার করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ সাধনার ক্ষেত্রে সেই একই সময়ে, ব্রহ্মকে ধ্যানে আত্মায় দর্শন করিতেছেন। ইহার কোন্‌টা সত্য? তাঁহার ব্রহ্মদর্শন সত্য? না, তাঁহার ব্রহ্মধ্যান সত্য? হয় তাঁহার জীব আর ব্রহ্মের ঐকান্তিক ভেদবাদী দর্শন মিথ্যা। না হয় তাঁহার জীবাত্মায় পরমাত্মার দর্শনরূপ ব্রহ্মধ্যান মিথ্যা। কে বলিবে কোন্‌টা মিথ্যা? অথচ দেখা যাইতেছে যে, এই দুই বিরোধী সিদ্ধান্ত এক সঙ্গে কোন মতেই সত্য হইতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথের বলিয়াও নহে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার এই জীব আর ব্রহ্মের ভেদবাদী দর্শন, কালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্রমোন্নতি হইয়াছিল। উত্তম। কিন্তু কবে এবং কখন?

১৮৫০ খৃঃ আত্ম-তত্ত্ব-বিদ্যায় এই ভেদবাদী দর্শনের সাক্ষাৎ আমরা পাই। কতদিন ধরিয়া এই দার্শনিক সিদ্ধান্তে তিনি আসিয়া পৌছিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। তবে ১৮৫০ খৃঃ পরে অন্ততঃ দীর্ঘ দশ বৎসরে তাঁহার এই দার্শনিক মতের কোন ইভলিউ- সন (?) আমরা দেখি নাই। ১৮৬০ খৃঃ তিনি এই দার্শনিক ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়াছেন—তাহা আমরা দেখিয়াছি। এবং সেই স্খলন-দর্শনও আমরা ক্রমে আলোচনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার গতি ও মতি কোন্‌দিকে—তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। যদি অন্ততঃ পাঁচ বৎসর ধরিয়াও দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জীব আর ব্রহ্মের নিতান্ত ভেদবাদমূলক দার্শনিক সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হইয়া থাকেন, এবং স্খলন হইলেও ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই ভেদদর্শন সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া না থাকেন, তবে এই দাঁড়ায় যে, অন্যূন ১৫ বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ দার্শনিক দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন যে, জীব আর ব্রহ্মে কোন সম্পর্কই নাই! অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনায় সাঙ্গোপাঙ্গসহ এই ১৫ বৎসর তিনি স্বচ্ছন্দে আত্মায় পরমাত্মাকে ধ্যান করিয়া, দর্শন করিয়া, তাঁহার সহিত যোগে বিহার করিয়া গেলেন। এখন বিবেচ্য, শঙ্করকে প্রতিবাদ করিতে গিয়া কি দেবেন্দ্রনাথ জীবনে—ভ্রমকে, মিথ্যাকে সাধনা করিলেন। অথবা জীবনে সত্যকে সাধনা করিয়া, মিছামিছি শুধু শঙ্করকে প্রতিবাদের ভাণ করিলেন? আবার যদি শঙ্করের প্রতিবাদের ভূমি তিনি পরিত্যাগই করিলেন,—তবে শঙ্কর প্রতিবাদী দেবেন্দ্রনাথ কি শেষে শঙ্করকে প্রতিবাদ করা ছাড়িয়া দিলেন? ইহা প্রশ্ন। এবং ইহা উত্তরের অপেক্ষা রাখে।

দার্শনিক দেবেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিতেছেন, সাধক দেবেন্দ্রনাথকে। এবং একই সময়ে। এখন কোন্ দেবেন্দ্রনাথ খাঁটি? ইহাও প্রশ্ন। এবং ইহাও উত্তরের অপেক্ষা রাখে। আমরা—অধমেরা গ্রহণ করিব কোন্ দেবেন্দ্রনাথকে, আর বর্জ্জন করিবই বা কোন্ দেবেন্দ্রনাথকে? ইহাও প্রশ্ন। এবং আশা করিয়া গেলাম—যদি কেহ উত্তর দেন।

দেবেন্দ্রনাথ এক কথায় জীবে ব্রহ্মে ভেদ করিয়া, শঙ্করকে নাকি ফুটো করিয়া ঝুটা বানাইয়া দিলেন। দেশকে শাঙ্কর-অদ্বৈত ও মায়াবাদ হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু আমরা যে দেখিলাম, শ্রীশঙ্কর ইহার কি ভীষণ প্রতিশোধ লইলেন। ৪৩ বৎসর পরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভায় আর এক বাঙ্গালীর মধ্যেই তিনি আবার এমন ফাটিয়া বাহির হইলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের কোন ফুটোই তাহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইল না। এবং এই দুর্ঘটনার পরেও ১২ বৎসর জীবিত থাকিয়া দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে সন্তবতঃ শুধু ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া, ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। শঙ্কর-প্রতিবাদ এবারের মত শিকাতেই তোলা রহিল। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র। জাতির পক্ষে, ব্যক্তির পক্ষেও।

আর রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে? দেবেন্দ্রনাথ মারা গেলেন, কিন্তু শঙ্কর মরিলেন না। শঙ্কর বাঙ্গালার বুকে আবার কোমর বাঁধিয়া রুখিয়া দাঁড়াইলেন। তারপরে তো এই ২৫ বৎসর আর কেউকেই দেখি না। আজও পর্য্যন্ত।

জীব ব্রহ্মের ভেদ তো দেখা গেল। এখন জীব আর ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ে দেবেন্দ্রনাথ কিরূপ সিদ্ধান্তে আসিলেন,—তাহা একবার দেখা দরকার। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'পরমাত্মা যিনি বিকারবিহীন' তাঁহার 'পরিণাম' হইতে পারে না। তিনি এক সুতরাং "প্রতি শরীরে পৃথক পৃথক জীবাত্মা হইয়া"ও তিনি থাকিতে পারেন না। আর 'যদি পরমাত্মাকে কেবল জীবাত্মাসকলের সমষ্টি করিয়া বলা যায়'—তাহা হইলে "জীবাত্মা-সকল ভিন্ন যে আর পরমাত্মার পৃথক সত্তা নাই, এই বলা হয়।" এই সমস্ত প্রচলিত যুক্তির উত্তরে বেদান্তের অন্যান্য শাখা যে সমস্ত যুক্তি বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে অবতারণা করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহা জানিতেন না। জানিলে তিনি সেই সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়া এবং সেই সঙ্গে যদি তাঁহার কিছু নূতন বলিবার থাকিত তাহাও বলিতে পারিতেন। এবং আমরা সেই সমস্ত দার্শনিক যুক্তির পারম্পর্য্য বিচার করিয়া দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মদর্শনের একটা স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম। দেবেন্দ্রনাথ জানিতেন না যে, গৌড়ীয় বেদান্তের ভূমিতে দাঁড়াইয়াই, বাঙ্গালী একদিন শ্রীশঙ্করকে এমন প্রতিবাদ করিয়াছিল যে, দেশের নাড়ীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ভারত-বর্ষের চারিধামে তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ গৌড়ীয় দর্শনের কোন খবর রাখিতেন না, তাই অকারণ দেকার্ত্ত-বিভ্রাট ঘটাইয়া, দার্শনিক অরণ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন।

পরমাত্মার যে স্বরূপ নির্দ্দেশ তিনি করিলেন, ইহা আর যাহাই হউক, শঙ্করকে প্রতিবাদ নহে। তবে কি? শঙ্করের অন্ধ পুনরাবৃত্তি। শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম আর কৈবল্যমুক্তিকে সজ্ঞানে প্রতিবাদ করাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হইয়াছিল, তবে তাহা করিতে গিয়া, অজ্ঞানে অথবা অজ্ঞাতসারে তিনি শঙ্করকে অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র।

দেবেন্দ্রনাথের শঙ্কর প্রতিবাদের উদ্দেশ্য কি? দুই রকম উদ্দেশ্য আমরা ভাবিয়া লইতে পারি। প্রথম, প্রত্যেক ব্যক্তির দিক দিয়া এই আপত্তি যে, ইহাতে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ থাকে না। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা চলে না। দ্বিতীয়—সমাজের দিক দিয়া, কৈবল্যমুক্তির আদর্শ অনুসরণ করিয়া লোকেরা সংসারকে ত্যাগ করিয়া, হয় সন্ন্যাস লয়, অথবা সংসারে থাকিয়াও—সংসারকে অসার জ্ঞানে তাহার কোন উন্নতি করে না। সুতরাং ইহা সামাজিক উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা ও তাহার ২৫ বৎসর পরে মহানুভব ডফ সাহেবও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। ইহা প্রথমতঃ খৃষ্টানী আপত্তি

পরে দেখাদেখি দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে ব্রাহ্মিক আপত্তিরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। এ যুগে। তা বেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, "আত্মতত্ত্ব বিদ্যায়" দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন,—তাহাতে জীব ও জড়ের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক হীন ব্রহ্মের উপাসনা মনুষ্যেই বা কি করিয়া করে, আর জাতিই বা তাহার সহিত নিঃসম্পর্কীয় ব্রহ্মদ্বারা কিরূপে উন্নতমুখী হইতে পারে? শাঙ্কর বেদান্তের যাহা আপত্তির কারণ শঙ্কর প্রতিবাদী দেবেন্দ্রনাথের দেকার্ত্তানুকারী দর্শনে, তাহা দূর হয় নাই, প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে।

কিন্তু কেন এমন হইল? প্রথম—দেবেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রতিভার অভাব। দ্বিতীয়—শঙ্করের পরে দেশীয় দার্শনিক চিন্তার যে ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, তাহার জ্ঞানের অভাব। তৃতীয়- গৌড়ীয় দর্শনের একান্ত জ্ঞানাভাব। চতুর্থ- দেকার্ত্ত দর্শনের অন্ধ অনুকরণের ফল।

দেকার্ত্ত, জড়ে ও জীবে পার্থক্য টানিল। জড়ের বিস্তৃতি জীবে নাই, জীবের জ্ঞান জড়ে নাই। সেই ধারাকে অনুসরণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ জীবে আর ব্রহ্মে ভেদ করিলেন। দেকার্ত্তের ওদেশের সমালোচনাও যদি দেবেন্দ্রনাথ একটু ধীরে সুস্থে পড়িতেন এবং দেকার্ত্তের 'পিনাল গ্লাণ্ডের' রহস্যজনক থিওরির কথা মনে করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চিন্তই দেকার্ত্তকে এমন অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়া শঙ্কর দর্শনকে প্রতিবাদ করার খেয়াল হইতে অব্যাহতি পাইতেন।

তারপরে জীব বেচারীদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মকে জীব ও জড় হইতে নির্ব্বাসন করিয়া জীবের সমষ্টিকে কোন ঐক্য সূত্রে মিলাইবার পথ পাইলেন না। কোন একটি দর্শনের ধারাকেও অন্ততঃ পূর্ব্বাপর বুঝিতে না পারিলে, এবং বিভিন্ন দার্শনিক ধারার বিচ্ছিন্ন হস্ত পদ মুণ্ড লইয়া, দর্শনের নব কলেবর তৈয়ার করিতে গেলে এইরূপ অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি অবশ্যম্ভাবী।

এই অসংখ্য জীবসমষ্টি জড় হইতে পৃথক্, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। এই সব নিরুপায় জীবই কি দেবেন্দ্রপন্থী ব্রাহ্মগণ? যাহাদের জড়ের উপর কোন আধিপত্য নাই? যাহাদের ব্রহ্মের সহিত কোন সম্পর্কই নাই? সঙ্গত সামঞ্জস্যীভূত চিন্তাই দর্শন। এমন অসঙ্গত অসামঞ্জস্যতাপূর্ণ চিন্তা, আর যাহাই হউক, দর্শন নামের যোগ্য নহে। জড় ও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ এই অসংখ্য জীবসমষ্টি না কি বহুবাদ দর্শনে স্থান পাইতে পারে। আর বর্ত্তমান ইউরোপীয় বহুবাদ দর্শনের অগ্রগামী না কি দেবেন্দ্রনাথের এই বহুবাদ দর্শন।

দর্শনের বহুবাদ আছে তাহা জানি। কিন্তু সেই সমস্ত বহুবাদের একবাদেরও বালাই যাঁহাদের নাই, তাহারাই এমন সব অবান্তর কথার অনর্থক অবতারণা করিতে পারেন। অন্যে সম্ভবে না। জীবসমষ্টির বহুবাদ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ যে একটি কথা

বলিয়াছেন তাহা এই—"অনেক বস্তু কখন এক হইতে পারে না এবং এক বস্তুও কখন অনেক হইতে পারে না।" ইহা পারমার্থিক সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক বা বহুবাদের সংশয়। এবং সংশয়মাত্র। নিঃসংশয় বহুবাদ নহে। ইউরোপে সম্প্রতি যে বহুবাদ-দর্শন দেখা দিয়াছে, জেম্‌স্‌প্রমুখ তাহার অগ্রদূত। কিন্তু সেই সমস্ত দার্শনিকদের বহু-বাদ মূলতঃ মনোবিজ্ঞানমূলক বহুবাদ। তাহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের এক বা বহু-বাদের সংশয়ের যে কোনরূপ সাদৃশ্য বা সম্পর্ক আছে, তাহা নিতান্ত আনাড়ী ও অর্ব্বাচিন ভিন্ন আর কে বলিবে, জানি না। জর্ম্মণ্য হেগেলের প্রতিবাদে ওদেশে বহুবাদ জাগিয়াছে, কাজেই শঙ্কর প্রতিবাদে আমাদের বহুবাদ না জাগিলে চলে কিরূপে? কেননা, ও দেশ যে ফেরঙ্গ বাঙ্গলার বিশ্ব (?) আর বিশ্বরূপী ওদেশের নকল না করিলে আমরা বাঁচি কিরূপে? অতএব দেবেন্দ্রনাথেও বহুবাদ জাগিয়াছিল। কেননা, তিনি শঙ্কর প্রতিবাদী। এবং—কেননা—অস্মদ্দেশে আর ওদেশে একই ক্রিয়া চলিতেছে কি না,—আর যেহেতু এক ভগবানের অধীনেই আমরা সব পারমার্থিক ভ্রাতা-ভগিনী,—এই আর কি ?

আমি দেবেন্দ্রনাথের এক বা বহুর সংশয়বাদের সহিত ইউরোপের বর্ত্তমান বহু-বাদের কোন সম্পর্ক দেখি না। এবং খামাকা জোর করিয়া তাহা দেখাইবারও কোন আবশ্যকতা বিবেচনা করি না। তা ছাড়া ওদেশে হিগেলের যেরূপ প্রতিবাদ যে ভাবে জাগিয়াছে, বঙ্গভূমে দেবেন্দ্রনাথে শঙ্করের সেরূপ কোন প্রতিবাদের চিহ্নও দেখা যায় না, সাড়াও পাওয়া যায় না। ইহা কেবল নিরর্থক ওদেশের সহিত এদেশের জোর করিয়া সাদৃশ্য দেখাইবার একটা অছিলা, যাহা মিথ্যা হইলে আমি ঘৃণাবোধ করি, আর সত্য হইলেও বিশেষ গৌরব অনুভব কবি না। এইখানে বলিয়া যাই যে, এইরূপ বিকৃতবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয়কেও ওদেশের বর্ত্তমান ইনটুসনবাদের সহিত তুলমূল করিয়া একটা বিচারের ভণিতা দেখিয়াছি। তাহাও আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় অতীব নিরর্থক এবং মিথ্যা।

দেবেন্দ্রনাথের জীবসমষ্টির এক বা বহুবাদ সংশয়, শেষ পর্য্যন্ত সংশয়েই রহিয়া গিয়াছে। বাদের হিসাবে ধরিতে গেলে ইহা সংশয়বাদ। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং অজ্ঞাতসারে। জড় জীবের ভেদ দ্বারা তিনি জীবব্রহ্মের ভেদ সাব্যস্ত করিতে গিয়া, নৌকাডুবি করিয়াছেন। এই জড় জীবের ভেদ তিনি অন্ধভাবে দেকার্ত্তে'র অনুকরণ করিতে গিয়া করিয়াছেন। "ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন কালে তিনি বিদেশের আশ্রয় আবশ্যক বোধ করেন নাই"—ই—বটে!! রামেন্দ্র বাবুকে বিনয়ের সহিত বলিতেছি তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া একটু পড়িয়া শুনিয়া সমালোচনা করেন। কেননা না পড়িয়া সমালোচনা এবং তোতা সমালোচনা এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার শোভা পায় না।

যাহা হউক, যদি দেকার্ত্তকেও দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বুঝিতেন, তবু এবংবিধ হাস্তকর দার্শনিক বিড়ম্বনের হস্ত হইতে হয়ত বা রক্ষা পাইতে পারিতেন। ইউরোপীয় দর্শনের বর্ত্তমানযুগের একজন প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন দেকার্ত্ত। তবে আর কি! তাহাকে তর্জ্জমা করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিলেই যে কেহ বাঙ্গালীর নব্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হইবেন। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী বঙ্গদেশকে এই বুদ্ধিতেই পরিচালনা করিয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ একা নয় এবং রামেন্দ্রবাবুর মত না পড়িয়া সমালোচকের সংখ্যাও একাধিক।

দেখা গেল,—ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ে শঙ্কর-প্রতিবাদী দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করকেই অনুকরণ করিলেন। তবে শঙ্করদর্শনের সামঞ্জস্য শঙ্করের নিজস্ব। আর দেবেন্দ্রনাথের কখন দেকার্ত্ত, কখন শঙ্কর অনুকরণকারী দর্শনের অন্ধতা ও অসামঞ্জস্য বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথেরও নিজস্ব। শঙ্করকে যে জন্য প্রতিবাদ আবশ্যক, খ্রীষ্টান পাদ্রীরা বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মপাদ্রী দেবেন্দ্রনাথ তাহাই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া, এ যুগে শঙ্কর প্রতিবাদে দাঁড়াইয়া, শঙ্করকে বিধির বিপাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তবে ছাড়িলেন, উল্‌টা বুঝ্‌লি রাম! যদি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনকে একটু 'নাড়াচাড়া' করিতেন, শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত জীবের তবু একটা হাতাহাতি চলিতে পারিত। সে ব্রহ্ম জীবকে ধরিয়া খাইলেও জীব অগত্যা ব্রহ্ম হইয়া যাইত। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের জীব হইতে গুণে পৃথক্ নিঃসম্পর্কীয় ব্রহ্মের সহিত কোন কুটুম্বিতাই চলে না। উপাস্য উপাসক সম্বন্ধের কোন স্থান দেবেন্দ্রনাথের জীব ব্রহ্মে নাই, আর সমাজের বা জাতির কথার আবশ্যক কি? ইহাই দেবেন্দ্রনাথের নব্যবঙ্গের শঙ্কর-প্রতিবাদ।

তারপর মায়াবাদ। কেন না আবার শঙ্কর মায়াবাদেও দেশ উচ্ছন্ন গিয়াছে কি না? আর দেশের উদ্ধার বলাই বাহুল্য। যাহা হউক দেবেন্দ্রনাথ শঙ্কর-প্রতিবাদী।

শঙ্কর কি বলেন? কিরূপে জীবজগতের উদ্ভব হইল! উত্তর—জীবজগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মই সত্য। দড়ি আছে, তাহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইতেছে। ব্রহ্মই আছেন, তাঁহাকে জীব-জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে। দড়ির স্বরূপের অন্যথা না হইয়াও সর্পের ভ্রমাত্মক জ্ঞানের উদ্ভব দেখিতেছি। তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপের অন্যথা হইয়াও জীব-জগতের ভ্রমাত্মক জ্ঞানের উদ্ভব। এই ভ্রমাত্মক জ্ঞানই মায়া বা মায়াপ্রসূত। সুতরাং জগতের সৃষ্টি এবং অস্তিত্বের মূল মায়া। ইহা মায়াবাদও বটে, বিবর্ত্তবাদও বটে এবং সাধারণতঃ ইহাই শাঙ্কর মত বলিয়া প্রচলিত।

রামানুজ কি বলেন? যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হয়, তেমনি ব্রহ্ম হইতে জীবজগৎ হয় এবং হইতেছে। দুগ্ধের স্বরূপ অন্যথা হইয়া দধি হয়। ব্রহ্মের স্বরূপও অন্যথা হইয়া জীবজগৎ হয়। ইহা মায়াবাদের বিরুদ্ধে লীলাবাদ। পরিণামবাদও বটে!

শঙ্কর-প্রতিবাদী দেবেন্দ্রনাথ ইহার কোন বাদী, অথবা এতদতিরিক্ত তাঁহার নূতন বাদই বা কি ? তিনি পরিণামবাদী নহেন, ইহা স্পষ্ট। "পরমাত্মা বিকারবিহীন, তাহার পরিণাম কি প্রকারে হইতে পারে!" উত্তম। তবে আশ্চর্য্য বটে। কেননা, ইহা শঙ্কর প্রতিবাদতো নহেই, ইহা শঙ্করের অন্ধ অনুকরণ।

তিনি কি তবে বিবর্ত্তবাদী! নহে, তাহাও নহে। ব্রহ্মকে না কি "বিবর্ত্ত উপাদান কারণ বলা অনর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র।" তাতো বটেই। ইহা বাগাড়ম্বরী শঙ্করের প্রতিবাদ। তা বুঝিলাম।

কিন্তু জীব-জগৎ বেচারী, বা বিদের উপায় কি ? তাঁহারা আসিল কোথা হইতে ? ব্রহ্ম বিকারবিহীন, কাজেই দুধ হইতে যেরূপ দধি হয় ব্রহ্ম হইতে সেরূপে জীবজগৎ হয় নাই। তবে জীবজগৎ কি রজ্জুতে সর্প ভ্রম—না তাহাও অনর্থক বাগাড়ম্বর! শঙ্করও নহে। রামানুজও নহে। তবে দেবেন্দ্রনাথের নূতন আড়ম্বরটী কি প্রকার ? এক্ষেত্রে তিনি একেবারে আড়ম্বরহীন। অন্যে বাক্য কহে কিন্তু তিনি নিরুত্তর। পরিণাম ও বিবর্ত্ত এই উভয়বাদকে অস্বীকার মাত্র করিয়াই তিনি খালাস। পরিণামবাদ না মানিবার কারণ, দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করানুবর্ত্তী হইয়া কতকটা দিতেছেন। কিন্তু বিবর্ত্তবাদ যে বাগাড়ম্বর মাত্র, তাহার বাগাড়ম্বর ব্যতীত দেবেন্দ্রনাথ অন্য যুক্তি দিতে অক্ষম। এই খুয়েজখালেই তাঁহার দার্শনিক নৌকার ভরাডুবি! বস্তুতঃ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের স্বরূপকে অনুধাবন করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, পরিণামবাদ মিথ্যা এবং বিবর্ত্তবাদ সত্য হইতে আপত্তি নাই। বস্তুতঃ কোন আপত্তি তিনি দেন নাই। এক বাগাড়ম্বর ছাড়া।

তবে বিবর্ত্তবাদ যে মায়াবাদ ? অথচ প্রতিবাদ করিতে হইবে যে, ঐ মায়াবাদকেই ?

আমার বিবেচনায় বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথ আসিয়া পড়িয়াছেন মায়াবাদেই। কিন্তু ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তাই আসিতে আসিতে যখন দেখিলেন, সম্মুখে মায়াবাদ, তখন সহসা পেছন ফিরিয়া বলিলেন, ওঃ, ও কিছু নয়,—তবে হাঁ, তা ত বটেই—কিন্তু ও সব অনর্থক বাগাড়ম্বর,—ঐ বিবর্ত্তবাদ। ইহাই দার্শনিক যুক্তির কারচুপি—যদ্দারা শঙ্কর প্রতিবাদিত।

দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিবাদ করিতে গিয়া, তাহা অপেক্ষাও অনন্তগুণ তফাৎ ব্রহ্মে গিয়া পড়িয়াছেন। মায়াবাদকে প্রতিবাদ করিবার পথে মায়াবাদের সহিত মুখোমুখী হইয়াছে এবং হইবামাত্রই,—পশ্চাৎভাগ দেখহ বলিয়া ফিরিয়াছেন। জীব আর জগৎকে ব্রহ্ম হইতে নিঃসম্পর্কীয় করিয়া, জগৎ হইতে জীবকে পৃথক্ করিয়া, প্রতি জীবে জীবে ব্যবধান করিয়া, সমস্তই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়াছেন।—সমস্ত জীবজগৎ ও ব্রহ্ম কতকগুলি চূর্ণের সমষ্টি মাত্র,—যাহা,—অহঙ্কার নয়,—ফু দিতেছি—আর দেখিতেছি—উড়িয়া যাইতেছে।

ইহাই দেবেন্দ্রনাথের আত্মতত্ত্ববিদ্যার ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের দর্শন।

এই দর্শনের পরে আরো শ্রবণ-দর্শন আছে। তাহার বিস্তারিত খবর আছে—"ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসে।" আর আছে, "ব্রাহ্মধর্ম্মের—ব্যাখ্যানে।" তবে আমি—ইহাদিগের কোন দার্শনিক মূল্য দিই না। যেহেতু ইহা দর্শনের শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। তবে জীবজগৎ ও ব্রহ্মসম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী মত যাহা এই দুই গ্রন্থে আত্মতত্ত্ব-বিদ্যার প্রায় ১০ বৎসরের পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—তাহার সহিত আত্মতত্ত্ববিদ্যার সমালোচিত দার্শনিক সিদ্ধান্তের—আলোচনা চলিতে পারে।

আত্মতত্ত্ববিদ্যার পরে দশবৎসর দেবেন্দ্রনাথ এলোমেলোভাবে ইউরোপীয় দার্শনিকদের ইংরেজী তর্জ্জমা—কিছু কিছু পড়িয়াছেন। এবং যখন যে দার্শনিককে ভাল লাগিয়াছে,—তাঁহারি কথা বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করিয়া—"ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস তৈয়ারী করিয়াছেন। একটু অনুধাবন করিয়া পড়িলে রামেন্দ্র বাবুও তাহা বুঝিতে পারিতেন। ধর্ম্মমত এইরূপে তৈয়ারী হয় বলিয়া আমাদের জানা ছিল না। এবং এবংবিধ উপায়ে তৈয়ারী ধর্ম্মমত, কোন একটা প্রাচীন জাতি তাহার মধ্যে আর্য্য অনার্য্যের মিশ্রণ যতই উদ্ভট হউক, আর সম্প্রতি অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজাগত 'গ্রীগের' প্রাদুর্ভাব যতই বেশী হউক,—গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। রাজা রামমোহন শাস্ত্র-মীমাংসার ব্যাপারে বেদমান্যকারীদের জন্য তাঁহার ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তগুলি বুদ্ধিবিচারপূর্ব্বক দিয়া গিয়াছেন,—তাহা কতক বুঝিতে পারি, এবং বেদমান্যকারীরা তাহা একদিন আলোচনা করিবেন,—এমনও আশা করা যায়। তবে বেদ-অমান্য-কারী ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস যে আলোচনা আমাদিগ্যের করিতে হয়,—সে কেবল,—ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে! কেননা—বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার হইতেই মুক্ত হইতে হইবে কি না, তাই—?

আত্মতত্ত্ববিদ্যার দর্শনে জীব ও ব্রহ্মে কোন সম্পর্ক নাই—দেখা গিয়াছে। 'ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে' দেখিতেছি জীবের আত্মা ব্রহ্মের "সঙ্গে সংসৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।" কোন্ যাদুমন্ত্রে? "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসে" ঈশ্বর প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধন তাহাও কি প্রকারে? আত্মতত্ত্ববিদ্যার বিকারবিহীন —'অপরিণামী' জীবের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক শূন্য পরব্রহ্ম, দশ বছরের মধ্যেই কি করিয়া এতটা প্রতিজীবের নিজস্ব ধন হইয়া উঠিলেন—আর জীবাত্মার সহিত এত ঘনিষ্ঠরূপে সংসৃষ্ট হইয়া থাকিতে রাজী হইলেন, তাহার কোনরূপ দার্শনিক যুক্তি দেবেন্দ্রনাথ দেন নাই। আত্মতত্ত্ববিদ্যার দার্শনিক ভূমি কোন্ কোন্ যুক্তির উপর দাঁড়াইয়া ত্যাগ করিলেন এবং কেন করিলেন, তাহার কোনরূপ দার্শনিক বিচার না করিয়া, প্রতি দশ বৎসর অন্তর কথা উল্টাইলেই দার্শনিক চিন্তার ক্রমোন্নতি হয় না। বস্তুতঃ দেকার্ত্ত অনুকরণেও

নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া যায় না, কুঁজো অনুকরণেও দার্শনিক ক্রমোন্নতি হয় না। বস্তুতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের এবং তদীয় ব্যাখ্যানের উক্তি-গুলিকে আমি দার্শনিক যুক্তি বা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করি না। উহা ইউরোপের খণ্ড দর্শনের অনুকরণকারী অন্ধতা। এবং ঐ সমস্ত যুক্তিহীন উক্তি আত্মতত্ত্ব বিদ্যার ক্রমোন্নত দর্শন কোন মতেই নহে।

যে এই 'সংস্পৃষ্ট' আর নিজস্ব 'ধন' ব্রহ্ম কেন যে বিকারগ্রস্ত হইলেন, তাহার এ অধঃপতনের কারণ ভাবিয়া আমিত কিছুই স্থির করিতে পারি না।

আত্মতত্ত্ববিদ্যায় পরিণামবাদ নাই, বিবর্ত্তবাদ বাগাড়ম্বর অথচ নূতন বাদও কিছু নহে। মায়াবাদকে পশ্চাৎ ভাগ দেখাইয়া ত—এক দৌড়! সেখানে সে গোঁজা-মিলের আজব কারখানা দেখিয়া আসিয়াছি।

আত্মতত্ত্ববিদ্যায় দেবেন্দ্রনাথ সৃষ্টিতত্ত্বের কোন সিদ্ধান্তেই আসিতে পারেন নাই। মত ও বিশ্বাসের যদিও স্থিরতা নাই, তথাপি দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, ঈশ্বরের শক্তি ব্যক্ত হওয়ার নাম সৃষ্টি, ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরেতেই প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার নাম প্রলয়, কিন্তু এই ঈশ্বরের শক্তি জিনিসটি কি, তাহা বিশদ করিলেন না। পাশ কাটিয়া গেলেন। অথচ এই শক্তির ব্যাখ্যার তারতম্য অনুসারে ইহা পরিণামবাদও হইতে পারে, বিবর্ত্তবাদও হইতে পারে। ইহা পরিষ্কার না করায় আত্মতত্ত্ববিদ্যার ভূমি হইতে সৃষ্টিতত্ত্বে এক পদও অগ্রসর তিনি নহেন। তাঁহার দার্শনিক চিন্তার কোন গতি আছে কি না, কোন লক্ষ্য আছে কি না, আমার তাহাই সন্দেহ। অসংবদ্ধ অসংলগ্ন উক্তিমাত্রই দর্শন নহে। ব্রহ্ম কোন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেন নাই, ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। কি এই ইচ্ছা, কাহার ইচ্ছা? থাকে কোথায়? দেবেন্দ্রনাথ নীরব। ইহা খৃষ্টানী তাহা বুঝিতেছি। শঙ্কর বেদান্ত হইতে ক্রমে খ্রীষ্টান ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌দের দিকে তাঁহার গতিকে আমরা বেশ লক্ষ্য করিয়াছি। 'খৃষ্ট বিভীষিকা' সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারে খ্রীষ্ট না হউক্ খৃষ্টানী যথেষ্ট প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। রামেন্দ্রবাবু যেন দয়া করিয়া বিবেচনা করেন।

রামমোহনের শাস্ত্রমীমাংসার ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিশ্বাসের বা ব্যাখ্যানের কোন তুলনা চলে না। যেহেতু ইহা এক বস্তু নহে। এবং ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর অযথা তুলনায় আমরা সমালোচনা সাহিত্য আবর্জ্জনায় পূর্ণ করিতে চাহি না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর "ব্রাহ্মণোত্তম" ধর্ম্ম ও দর্শন মীমাংসায় ইউরোপকে নকল করিতে গিয়া, এমনি নাকাল হইল বটে। তার এ বুদ্ধি ঘটে আসিল না যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর

পূর্ব্বের দুই তিন শতাব্দীর বাঙ্গালী কি করিয়াছে একবার দেখিই না কেন?

কিসে এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল? কেন এমন হইল? জিজ্ঞাসা কর, ফেরঙ্গ বাঙ্গালার ফেরঙ্গ বুদ্ধিকে। আমরা কি কহিব? কি-ই বা কহিতে পারি? যে যাহা নয়, জোর করিয়া তাকে তাই হওয়াইতে গেলে এই রূপই হয়। সকলেই দার্শনিক হইয়া জন্মে নাই। এবং দার্শনিক হইয়া না জন্মাটা খুব বেশী লজ্জার কথা বলিয়াও কেহ মনে করেন না। কিন্তু যিনি দার্শনিক নন, তাঁহাকে দার্শনিক সাজাইবার সখটা নিছক্ লজ্জার কথা, কলঙ্কের কথাও বটে। দেবেন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন না। তাঁহাকে জোর করিয়া দার্শনিক সাজাও কেন? সাজা ত অনেক হইয়াছে আর কেন?

শুধু দেবেন্দ্রনাথ নয়। ইহা তাঁহার কালের দোষ। ইহা তাঁহার যুগধর্ম্ম। কি এই যুগধর্ম্ম? যে যাহা যতটা নয়, তাহাকে ততটা তাহাই সাজান হইয়াছে,—এই একশত বৎসব ধরিয়া।

আজ উনবিংশ শতাব্দীর পালা শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই সংস্কার-যাত্রার সাজা রাজারা, তাহাদের ইউরোপ বিশ্বের ভাড়াটিয়া পোষাক, আসরেই ফেলিয়া রাখিয়া, এই আসন্ন প্রভাতকালে কোথায় যে একে একে সরিয়া পড়িতেছেন—দিশাই পাইতেছি না।

যাত্রা ভঙ্গে সবই যেন ছত্রভঙ্গ দেখিতেছি। অথচ আবার গরম করিয়া আসর জমাইবার সুত্রপাতও দেখিতেছি। কেন না শুনিতেছি, দেশবাসী নাকি অসহ্যরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এক যায় আর আসে। গান চলে, পালা ফুরায় না। এমনি করিয়া যুগের পরে যুগ—অনন্ত যুগ। তথাপি বাঙ্গালী উনবিংশ শতাব্দীতে কি পালা রচিয়াছিল,—কি গাওনা গাহিয়াছিল, খড়ো খড়ের মাটীর দাওয়ায় বসিয়া আজ একবার তাই ভাবিয়া দেখিব—এই দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে—মনে করিয়াছি।

বাঙ্গালী বিভীষণ সাজিয়াছে, সুগ্রীব সাজিয়াছে। বড় বড় বাঙ্গালী বড় বড় বিভীষণ, বড় বড় সুগ্রীব। আমরা গরীব। পদ্মার ওপারের, যাকে বলে নিতান্ত বঙ্গজ। তথাপি সর্ব্বোত্তম নরলীলার প্রকাশ যে, বাঙ্গালীর মধ্যে সহস্রসূর্য্যের দীপ্তি লইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল,—সেই মহাপ্রভু একদিন আমাদের পদ্মাবতী তীরে বঙ্গদেশে চরণধূলি দিয়াছিলেন।

"সেই ভাগ্যে অত্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥

(চৈঃ, ভাঃ আদিখণ্ড ১৯ পৃঃ)

পদ্মাতীরের বঙ্গদেশ সেই সূর্য্যের তেজকে বরণ করিয়াছিল, ধারণ করিয়াছিল, সে শক্তি তার ছিল। আমাদের ব্রাহ্মণেরা সেদিন দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের 'টিপ্পনী' পড়িয়াছিল; 'সহস্র সহস্র শিষ্যকে' পড়াইয়াছিল। বাঙ্গালী সেদিন তার স্বভাবধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াই নকল না করা সত্ত্বেও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইত। শ্রীশঙ্করের ব্যাখ্যা যে ব্যাসসূত্রের মুখ্য ব্যাখ্যা নহে, আর মায়াবাদ যে ভ্রম, পরিণামবাদই যে সত্য, ইহা চারি ধামের লোককে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং মহাপ্রভু স্বয়ং—বেদান্তের ভূমিতে দাঁড়াইয়াই বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিত। আজ হয় ত স্বপ্ন বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু বাঙ্গালীরও একটা দর্শন ছিল, বেদান্ত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বা কতটুকু? স্বয়ং রামমোহন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর সে দর্শনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অপারগ হইয়াছেন। ইহা নিন্দা নহে, বিদ্বেষ নহে; ইহা লজ্জা, মনস্তাপ ও আক্ষেপ।

বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও দর্শন সত্যি ছিল। সেই ধর্ম্ম ও দর্শন সেদিন বাঙ্গালার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সূর্য্যরশ্মির মত ছড়াইয়া পড়িত। পদ্মাতীর তাই সেদিন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্যকে

> "সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন।
> সুরঙ্গ কম্বল, বহুপ্রকার বসন॥"
>
> (চৈঃ, ভাঃ আদিখণ্ড ৮০ পৃঃ)

উপঢৌকন দিয়া তার ঐশ্বর্য্যে, তার প্রাচুর্য্যের, তাঁর আতিথেয়তা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু পদ্মাতীরবাসীর আজ আর তা নাই। পদ্মার সেই ভীষণ ভাঙ্গন ও প্লাবনেও যে দেশ অটুট ছিল,—আজ তাহা স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া গিয়াছে। আজ আমাদের ধানের গোলা শূন্য, দীঘি পুষ্করিণী পঙ্কপূর্ণ,—চালে খড় নাই,—তুলসীমঞ্চ ধসিয়া গিয়াছে,—শিবমন্দিরের ফাটালে ফাটালে অশ্বত্থ শিকড় গাড়িয়া মাথা তুলিয়াছে। তবু আমরা বিভীষণ সুগ্রীব সাজি নাই। আমরা পাছ দোহারে গাহিয়া আসিয়াছি,—সংস্কারযুগেও—স্বদেশীযুগেও। আর আমরা—তোমাদের—তামাক সাজিয়াছি। কিন্তু সীতার উদ্ধার হইল কি না, লক্ষণের শক্তিশেল ঘুচিবে কি না—আজ তামাক সাজি যারা—আমরা,—জিজ্ঞাসা করিতে বসিয়াছি; তোমাদের,—সুগ্রীব বিভীষণ সাজ যাহারা—তা 'ব্রাহ্মণ উত্তমই' হও আর চণ্ডাল অধমই হও, কিছু আসে যায় না, বাঙ্গালী আজ তাহার একশত বৎসরের হিসাব করিবে।—ছাড়িবে না।

হিসাব করিবে, কেন—দুই শত বৎসরের ফরাসী দর্শনের অসার তর্জ্জমার গায়ে শঙ্কর ভাষ্যের দু একটা গিল্‌টির তকমা পরাইয়া, বাঙ্গালী তাহাকেই বাঙ্গালীর দর্শন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; লক্ষ্য তাহাই, দেবেন্দ্রনাথ উপলক্ষ্য মাত্র। দেবেন্দ্রনাথ যুগের মধ্য। এই মধ্য বুঝিতে গিয়াই আদি ও অন্তকেও বহু পরিমাণে

বুঝিতে হইবে। দেবেন্দ্রচরিত বিশ্লেষণে, ক্ষয় অপচয় হইয়া যাহা দাঁড়াইতেছে, তজ্জন্য আমিও সাতিশয় দুঃখিত। কিন্তু সেই সঙ্গে জাতির শত বৎসরের সংস্কার প্রয়াসের যে মানচিত্র, আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, তাহা আমি অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিতে পারি না।

শতবর্ষ পরে চাহিয়া দেখি বাঙ্গালাদেশে আজ আর বাঙ্গালী নাই। বাঙ্গালী যে কি ছিল, কে ছিল, কাহারা ছিল, তাহার কোন চিহ্নও যাহাতে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া এ কেবল তাহারই চেষ্টা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অভূতপূর্ব্ব মিশ্রণের ধূয়া ধরিয়া, কেবল ফেরঙ্গানুকরণ ও ফেরঙ্গের ভাব-দাসত্ব। ইহার নাটের গুরু কে—এবং কাহারা? বিরাট মহত্বে প্রতিষ্ঠিত সংস্কার যুগের "বিদেশী পরিচ্ছদ, বিদেশী আচার ও বিজাতীয় ভাষার" ব্রাহ্মণোত্তম (?) দিগ্যে আমাদের তাহাই জিজ্ঞাস্য। জিজ্ঞাস্য এই যে—যাহা করিলে তাহাতে কি হইল? এবং কেন ইহা করিলে? হে বিরাট, হে মহত্ব, একটুখানি ক্ষান্ত দাও,—জাতি যে জাহান্নামে যাইতে বসিয়াছে। আর ত ন্যাকামী আর ভাঁড়ামীর সময় নাই, এবং তাহা ভালও লাগে না। আমায় কেহ বলিতে পার, কেন বাঙ্গালাদেশ হইতে বাঙ্গালী চলিয়া গেল? কোন্ পাপে? কি সে বাঙ্গালী সব হারাইল? এত যদি সংস্কার, এত যদি বিরাট্ এবং ইত্যাদি, তাব এবং তবু অর্থাৎ তথাপি, আজ সে বাঙ্গালীর এ দশা কেন?

নারায়ণ রথে উঠিয়াছেন। তাঁহার রথ চলিবে। পদ্মসূতা, এমন কি মিনিসূতার টানেও এ রথ চলিবে। থামিবে না। যদি বিরাট প্রতিষ্ঠা গত শত বৎসরে কিছু হইয়াই থাকে, তবে এই রথচক্রের নিম্নে তাহার পরীক্ষা হউক্। অগ্রে নহে।

সংস্কার যুগের ফেরঙ্গ পাপে, বাঙ্গালা দেশ হইতে যে বাঙ্গালী সে চলিয়া গিয়াছে। সে আর বাঙ্গলাদেশে নাই। জটাকেশরে মস্তক ছাইয়া পড়িয়াছে, নগ্নদেহে, নগ্নপদে বাঙ্গালার সিংহ বাঙ্গালার বাহিরে কোন্ বনে আজ নিঃশব্দে একলা বিচরণ করিতেছে? সেকি আর বাঙ্গলায় ফিরিবে না? হায় উনবিংশ শতাব্দী, তুমি কি করিয়াছ? কি করিয়াছ? বাঙ্গালীকে তুমি শুধু লক্ষ্মীছাড়া কর নাই, তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া তবে ছাড়িয়াছ। সংস্কারের অছিলায় তুমি একটা জাতিকে প্রায় উচ্ছন্ন দিয়াছ। তোমার শতবর্ষের অত্যাচারের ফল দেখ, বাঙ্গালা দেশে আজ আর বাঙ্গালী নাই।

এবং কেন? তাহাও জিজ্ঞাসা কর, ঐ উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার ধর্ম্ম, সংস্কার দর্শন আর সংস্কার সাহিত্যকে। বাঙ্গালীর স্বভাব-ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফেরঙ্গ যুগ, এই সংস্কারযুগ বাঙ্গালীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছে। কাহারও সর্ব্বনাশ করিতে হইলে যে, আগে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে হয়। তাই সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, কে এবং

কাহারা? তারপর, পরে পরে, বাঙ্গালীর দর্শন অন্ধ হইয়াছে, বাঙ্গালীর সাহিত্য কেবল উচ্ছিষ্ট বমন করিয়াছে। তাই 'মেঘনাদকে বধ' করিয়া, 'বৃত্রকে সংহার' করিয়া বাঙ্গালী 'পলাশীর যুদ্ধে' হারিয়া গিয়াছে।

কেন এই একশ বৎসরের—

"পিতলকি কাটারি কামে নাহি আওল
উপর কি ঝক্‌মকি সার।"

কারণ, বাঙ্গালী তাঁহার স্বভাব-ধর্ম্ম ভুলিয়া ভয়াবহ পরের ধর্ম্ম ভিক্ষা করিতে পথে বাহির হইয়াছিল। তাই আজও বাঙ্গালীর পরের ধর্ম্মকেই আমার ধর্ম্ম বলিয়া আস্ফালন করিতে লজ্জায় মাথা নত হইয়া পড়ে না। বাঙ্গালীর একটা ধর্ম্ম ছিল, সে ধর্ম্ম কথায় বুঝান যায় না। বাঙ্গালীমাত্রেই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারে।

কিন্তু আজ কি না বাঙ্গালী নাই, তাই আশঙ্কা হয়, তার প্রাণধর্ম্মের অস্তিত্বেও বুঝি বা বাঙ্গালার নর-কঙ্কালেরা বা আস্থাহীন হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, দর্শন ও সাহিত্য একে একে ধাপে ধাপে কি করিয়া সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এই এক শতাব্দী কাল ধরিয়া, শতাব্দীর আলোচনায় দেবেন্দ্রচরিত ব্যাখ্যানে আমি গাধার চীৎকারে বাঙ্গালীকে তাহাই শুনাইতে দাঁড়াইয়াছি। এই আমার অপরাধ।

* * * * * * *

স্বজাতীয়ের স্বর কি বাঙ্গালী চিনিবে না?

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

নারায়ণ

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]   [বৈশাখ, ১৩২৫ সাল।

নারায়ণ

নারায়ণ !

তুমি প্রভু কৃপা করি,   যুগে যুগে অবতরি,
অবনীর পাপভার করিলে হরণ,—
দুষ্কৃত করিয়া নাশ,   ঘুচাইয়া ভয়-ত্রাস,
দয়ায় করিলে ত্রাণ সাধু মহাজন !
ঘুচায়ে ধর্ম্মের গ্লানি,   তুমি দেব চক্র-পাণি,
যুগে যুগে করিয়াছ ধর্ম্ম সংস্থাপন,
হে মধুসূদন !

নারায়ণ !

যখন নিখিল-বিশ্ব,   লুপ্ত গুপ্ত, নহে দৃশ্য,
অদ্বৈত অনধিগম্য আত্ম-নিমগন,—
নহে সৃষ্টি নহে লয়,   কি জানি তাহারে কয়,
তুমি সেই—তুমি সেই অবাঙ্মনন !

এ অনন্ত বিশ্বভরা, অনন্ত জীবন-ধরা,
অলক্ষ্যে তোমার বক্ষে করে সন্তরণ,
তব সে বিশাল ছায়া, ও নীল গগন কায়া,
প্রকাশিলে কবে তুমি লীলা-নিকেতন!
কি বিপুল বহ্নিরাশি, উল্লাসে উঠিল হাসি,
আবর্ত্তিয়া মহাকাশে প্রথম পবন,
বাষ্পময় বিন্দু বিন্দু, কত পৃথ্বী রবি ইন্দু,
কত মরু গিরি সিন্ধু—নব আয়োজন!
তাহে তুমি হয়গ্রীব, মৎস্যরূপে নবজীব,
উদ্ধারিলে জগতের প্রথম জীবন,
জীবনের সারধর্ম্ম, শ্রুতিরূপে বেদমর্ম্ম,
প্রথম করিলে তুমি বিশ্বে বিতরণ!

নারায়ণ!

তোমার চরণ তলে, বসি রমা সিন্ধুতলে,
অঞ্চলে চরণ-রেণু করিয়া চয়ন,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য-শোভা, গাঁথে মালা মনোলোভা,
কত মরকত মণি মুকুতা রতন!
তোমার চরণামৃত, চন্দ্রে হ'ল উচ্ছলিত,
বিশ্বের বাঞ্ছিত সুধা মৃত-সঞ্জীবন,
পুণ্যপদ মদ গন্ধে. ফুটিল মন্দার ছন্দে,
ভুবন-আনন্দ সে যে ভবিষ্য-নন্দন!
হে প্রভু ক্ষীরোদশায়ী, রাজ্য নিলে আততায়ী,
দীনবেশে সোমপায়ী ফিরে সুরগণ,
হিংসা দ্বেষ অত্যাচার, সে দ্বন্দ্ব-মন্দর ভার,
অবনী পারে না আর করিতে বহন।
সে জল তরল তনু, কম্পিত শিথিল অণু,
টলমল কল কল উছলে সঘন,
নাশি সে পাপের ভীতি, সে কাঁচা কোমল ক্ষিতি,
কূর্ম্মরূপে ধর্ম্ম পৃষ্ঠে করিলে ধারণ!

দেবতারে দিলে জয়, শশী-সুধা সমুদয়,
রাজলক্ষ্মী রাজদণ্ড রাজ-সিংহাসন,

যখন ধরণী জাগে, প্রথম সে স্থলভাগে,
নাহি তরু নাহি লতা তৃণ গুল্ম-বন,
অনুর্ব্বরা মরুভূমি, উর্ব্বরা করিলে তুমি,
বরাহ বিশাল দন্তে করিয়া কর্ষণ!
শ্যামশস্পে বসুন্ধরা, ফল-পুষ্পে হ'ল ভরা,
হৃষীকেশ, কৃষিদেশ—প্রথম নূতন,
রক্ষিতে জীবের স্থিতি, তোমার কল্যাণ নীতি,
কত কি কালের গর্ভে রয়েছে গোপন!

যখন পশুর বলে, হিরণ্যকশিপু দ'লে,
সরল বিশ্বাস-ভক্তি প্রীতি অতুলন,
দৈত্যের চরণদাপে, পৃথিবী ভরিল পাপে,
শূন্য করি মর্ত্ত্য করে পুণ্য পলায়ন!
অবিধি বিধির আখ্যা, বিচার-বর্জ্জিত সাক্ষ্য,
কণ্ঠে হ'ল রুদ্ধ বাক্য—রসনা শাসন,
অটল আদেশে তার, গৃহ হ'ল কারাগার,
কত অত্যাচার আর কত নির্য্যাতন!
ক্ষিপ্ত ফণী দৃপ্ত রোষ, দংশে বুকে বিনা দোষ,
অবিশ্বাস অসন্তোষ করে উদ্গীরণ,
উন্মত্ত পাপ-স্পর্দ্ধা, বিনাশিল ভক্তি-শ্রদ্ধা,
কৃপাণ কৃপার স্থলে হ'ল নিয়োজন।
না হইতে সোণা-ভোর, আঁধারি উষার ক্রোড়,
অরুণের মত কত তরুণ জীবন,
নাশিতে উন্মত পাপী, সাম্রাজ্য উঠিল কাঁপি,
লুণ্ঠিত চরণতলে কুণ্ঠিত ভুবন।
কত কি হইল জানি, জগতে ধর্ম্মের গ্লানি,
ম্লান হইয়া গেল গ্রহতারাগণ,

নিশির শিশির মত, দিনে রেতে অবিরত,
ঝরিতে লাগিল কত অজস্র নয়ন!
সে শোকাশ্রু পুণ্যতমা, স্ফটিকের স্তম্ভে জমা,
হে কৃষ্ণ তোমার তাহা দেব-নিকেতন,—
ধর্ম্মের উদ্ধার তরে নরসিংহ কলেবরে,
অবতীর্ণ তুমি তাহে শ্রীমধুসূদন!

দৈত্যের তপস্যা যোগ, উদ্দেশ্য বিলাস ভোগ,
পূরাইতে পাপাকাঙ্ক্ষা—পাপ আকিঞ্চন,
তাই এক পদে দলি, রসাতলে দিলে বলি,
রক্ষিলে দু'পায়ে ঢেকে ভূতল-গগন!

যখন রাক্ষসচয়, ত্রিভুবন করে জয়,
নারীর লুঠিয়া লয় পবিত্র যৌবন,
পরিতপ্ত তিন লোক, সাগরে উছলে শোক,
গর্জ্জে ক্রোধ নীলজলে দ্রব হুতাশন!
পত্নীহারা পতি দিলা, বুক পেতে সেতুশিলা,
জলধি লঙ্ঘিলা তাহে বন-সৈন্যগণ,
পোড়াইলা স্বর্ণলঙ্কা, নাশিলা ত্রিলোক-শঙ্কা,
পাপদেশ ভস্মশেষ অশোকের বন।

জীবহত্যা মহাপাপে, পৃথিবী যখন কাঁপে,
পরিতাপে করুণা করিল পলায়ন,
তুমি বুদ্ধ পৃথিবীতে, আসিলে নির্ব্বাণ দিতে,
শোক-দুঃখ জরা-মৃত্যু করিতে বারণ!
ছাগ তরে দিতে প্রাণ, হে মহান্! হে মহান্!
কি করুণা বরষিলে এই ধরা'পরে,
আজো পৃথ্বী কেঁদে মরে, তোমারে তোমারে স্মরে,
কোথা দেব চক্রপাণি। আছ কোথা সরে!

এস নারায়ণ!

যুগ-যুগান্তের পাপ, যত দুঃখ পরিতাপ,
দুঃসহ অসহ প্রভু সহনে না যায়,

মহাকাল চক্রধারে, ব্যোমভেদী হাহাকারে,
ঘূর্ণ্যমান মহাবিশ্ব প্রলয়ের প্রায়।
যায় ধর্ম্ম রসাতলে, পুণ্য-তপোবন-স্থলে
রাক্ষসী মায়ার বলে সব ধ্বংসে যায়,
কনক উষার রেখা, আর সে যায় না দেখা,
দিক্‌চক্র মহাব্যোমা অন্ধকারে ছায়—
তপোবনে সামগানে, আর সে জাগে না প্রাণে,
গেছে ধ্যান, গেছে প্রাণ, নিভিয়াছে দীপ,
সাঁঝের দেউটী ঘরে, জ্বালিব কেমন ক'রে,
এ আকাশে সন্ধ্যা-মণি পরে নাক' টিপ।
পঙ্গু জড় মূক সম, আছি ডুবে অন্ধতম,
কি ত্রিতাপে! এ প্রদেশে আলোক না ভাতে,
এস তুমি শক্তিধর! আলো করি চরাচর,
প্রাণ-সরেঃ দাও আলো হৃদিপদ্ম-পাতে।
বুভুক্ষিতে অন্ন দাও, বস্ত্রহীনে বস্ত্র দাও,
ভাষা দাও, বাণী দাও, মূকের এ মুখে,
পঙ্গুতে লঙ্ঘিবে গিরি, তব নাম লয়ে ফিরি,
মহানন্দে, দেশে দেশে বিলাইবে সুখে।
শূদ্রের শূদ্রত্ব যাবে, তব নামে শক্তি পাবে,
যাবে অবসাদ, গাবে আলোকের জয়,
নর, নরোত্তম হবে, আবার জাগ্রত ভবে,
আত্মস্থ হইবে সবে হবে পাপ ক্ষয়!
অধর্ম্মের যত গ্লানি, দূর কর দণ্ডপাণি,
মহারুদ্র! শূলদণ্ডে কর বিদারণ—
টুটে যাক্ তন্দ্রাঘোর, সে আলোকে হোক্ ভোর,
সংহারে নূতন সৃষ্টি হোক্ আবাহন।
হে লীলা-চঞ্চল সখা, দাও দেখা, দাও দেখা,
রাঙা-পায়!—ধরি পায় এস নারায়ণ!
জীবের শরেণ্য তুমি, দেবের বরেণ্য ভূমি,
ভক্তের জীবন-বাঞ্চা শ্রীমধুসূদন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

স্বাগতম্! *

হে আমার মা আনন্দময়ী বাঙ্গলার সন্তানগণ, আজ গঙ্গা-পদ্মা-করতোয়া-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র-নদ বারি-বিধৌত সেই প্রাচীন গৌড়-বঙ্গের অতীত সমৃদ্ধির স্বপ্নময় পুরীতে মা আমাদের ডাকিয়াছেন, তাই আজ আমরা মার কথা কহিবার জন্য এখানে মিলিত হইয়াছি। 'বন্দে মাতরম্'—সুজলা সুফলা নদীবহুলা এই আমার মাতৃভূমিকে বার বার বন্দনা করি! জননী আমাদের যে বাণী দিয়াছেন, মাতৃকণ্ঠের সেই গীর্ব্বাণী—সেই মা মা ধ্বনি, পবনে গগনে ধ্বনিত হইয়া পদ্মার পারে পারে যেন সেই বাণী তুলিতে থাকে, মাও যেন প্রাণমন ভরিয়া সন্তানের এ বাণী শুনিয়া আকুল হন।

আজ সংক্রান্তির ক্রান্তিপাত পড়িয়াছে, বর্ষ ওই চলিয়া যায়, 'নূতন' তাহার রাগোজ্জ্বল বিভায় মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আমাদের ঘরে অতিথি হইতে আসিয়াছে; সেই কবেকার পুরাতন নূতন হইয়া আসিয়াছে, আর সেই কবেকার গৌড়ের আঙ্গিনায় সেই পুরাতন আবার নূতন হইয়া আসিয়াছে। তাই আজ বলিতেছি, হে আমার পুরাতন, হে আমার নূতন স্বগৃহে স্বাগতম্! এই গৃহের রজে পিতৃপিতামহের পদারবিন্দের রেণুকণা আছে, এই ধূলি মস্তকে গ্রহণ কর, এই আয়ুষ্মন্ বায়ুতে তাঁহাদের নিঃশ্বাসের গন্ধ আছে, প্রাণ ভরিয়া মাখিয়া লও, এই পদ্মা গঙ্গার জলধারায় তাঁহাদের তর্পণ হইয়াছে, তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন, আজি আমরা তাঁহাদের সেই স্মৃতির স্মরণে ধন্য হইব।

কত দিনের এ দেশ! কত সভ্যতার কাহিনী এই ধূলিতে তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া গেছে, কত দান-সাগর এই পদ্মা-সাগরের তীরে তীরে ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ছড়াইয়া গেছে, কে আজি তাহার সে স্মৃতির ধ্যান করে। কিন্তু স্মৃতি আত্মস্থ হইতে শিখায়, প্রতি ব্যষ্টিতে চৈতন্যের আভাস জাগাইয়া দেয়, তাই স্মৃতির স্মরণ পুণ্যকথা। সেই পুণ্যকথার শ্রবণে মনুষ্য-জন্ম ধন্য হয়, তাই আজ মাতৃ-মন্দিরে সেই পুণ্যকাহিনী শুনিতে আমরা মিলিত হইয়াছি। মাতৃরূপা এই শ্যামলা জননীকে আমরা বার বার নমস্কার করি!

আপনারা আজ যে গৃহের আঙ্গিনায় সবে সমবেত হইয়াছেন, কত ইতিহাস তাহার আছে। কত আলোকোজ্জ্বল প্রভাত, কত ঘোরা অমানিশার কাহিনী, তাহার অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া আছে। দুর্দ্দাম দুর্ব্বার পদ্মার ভাঙ্গন, কত রাজ্য গড়িয়াছে, কত ভাঙ্গিয়াছে। পদ্মার ভাঙ্গন ও গড়ন আজিও থামে নাই; কিন্তু যে ইতিহাস সে

* ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

একবার গড়িয়াছে, সেই পৃষ্ঠা সে নিজেই আবার ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। আপনারা আজ যেখানে আসিয়াছেন, অশ্রান্ত-বারি-বিস্তার পদ্মা আপনাদের বুকে করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু পদ্মার সে গৌরবের দিন নাই, হে অতিথি! হে নারায়ণ! সে—

* * * * * জলপাত্র, দিব্যাসন,
সুরঙ্গ-কম্বল, বহুপ্রকার বসন,
উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে -

তাহা আর নাই।

কাল আমাদের ভাগ্যহীন করিয়াছে। চিরদিনই কিন্তু আমরা এমন ছিলাম না। ইতিহাস আলোচনার অবসব এখন নয়। আর আমি ইতিহাস ব্যবসায়ীও নহি। আমি সেই পরশমণির খোঁজেই ছুটিয়াছি। বাঙ্গালীর প্রাণধর্ম্মের আমি কাঙ্গাল। ইতিহাস সেই প্রাণধর্ম্মেই ভিত্তি করে, সেই প্রাণধর্ম্মেব ইতিহাসেই জাতির প্রাণের সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। দেশ-মাতৃকাব ক্রোড়ে সন্তান চিরদিনই সেই প্রাণের স্নেহরসে জীবিত থাকে। সেই প্রাণধর্ম্মের পরিচয় মার আশীর্ব্বাদে প্রাণের অনুভূতিতেই জাগে, হৃদয়ের তন্ত্রীতে সে সুর ধ্বনিয়া উঠে, সন্তান মার স্নেহের সত্য পরিচয় লাভ করে। সেই প্রাণধর্ম্মের দিক হইতেই এই ডাক আমার আসিয়াছে; মা আমাকেও ডাকিয়াছেন, আপনাদের সেবার জন্য; মা আপনাদেরও ডাকিয়াছেন, মিলিবার জন্য। প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে, ভাবে ভাবে। এ এক বিশাল প্রাণযজ্ঞ, যে যজ্ঞের হবিঃ প্রাণ, যে যজ্ঞের চরু জীবন, যে যজ্ঞের কামনায় মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, যে যজ্ঞেব হোমধূমের মাঝে সাহিত্যের মিলন বাণী ও মন্ত্র ধ্বনিত হয়, জাতি আপনাতে আত্মস্থ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ দেখিতে পায়। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে হে আমার পুরাতন, হে আমার নূতন অতিথি! ব্রীহি, যবধান্য সকলি প্রস্তুত, আপনাবা যজ্ঞে বৃত হউন। আজ পূর্ব্ববঙ্গ দবিদ্র হইলেও,

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

দারিদ্র্যের জন্য অন্নদানে অক্ষম হইলেও, অতিথির শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, চরণ প্রক্ষালনের জন্য জল, আর চতুর্থতঃ প্রিয়বচন—স্বধর্ম্মপরায়ণের গৃহে এ সকলের উচ্ছেদ বা অভাব কদাচ সম্ভব নয়।

অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথির ভক্তি॥

এ অকিঞ্চন যেন চিত্ত-সুখে সেই অকৈতব ভক্তি নারায়ণের জন্য সাজাইয়া রাখিতে পারে। তাই আজ পূর্ব্ববঙ্গ—

শিরে ধরি বন্দে নিত্য কঁস্লো তব আশ।

আমাদের আয়োজন অতি স্বল্প। সে দিন আর আমাদের নাই। কিন্তু আপনারা যে ভূমিতে আজ চরণ-চিহ্ন আঁকিতে আসিয়াছেন, সে ভূমি বহু পুরাতন; হে নূতন! সে পুরাতনের স্বপ্নঘেরা মোহ-তমাচ্ছন্ন দিনের পরপারে সে যবনিকা একবার সরাইয়া দেখিবে না কি—কাল যে অবগুণ্ঠনে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এ সেই ঢাকা নগরী। শুনা যায়, এই নগরীর নাম ঢাকা হওয়ার দু'একটা প্রবাদ কথা আছে। 'ঢাক' বলিয়া এক রকম গাছ এ দেশে প্রচুর ছিল, তাই সেই গাছের নাম হইতে এই নগরীর নামকরণ হইয়াছে। যদিও সে 'ঢাক' গাছ এখন আর মিলে না। কেহ বলে, সম্রাটশেখর বল্লাল, বুড়িগঙ্গার উত্তরে যে অরণ্যানী ছিল, সেই অরণ্যে দশভুজার এক ধাতুমূর্ত্তি পান। অরণ্যের অন্ধকারে সে সিংহবাহিনী ঢাকা ছিল। বল্লাল পিতৃসিংহাসন পাইবার পর, সম্রাট বল্লাল ঢাকেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এই ধাতুমূর্ত্তিকে—দুর্গামূর্ত্তিকে নগরের অধিশ্বরীরূপে স্থাপিত করেন, তাঁহার নাম ঢাকেশ্বরী। তাই এই নগরের নাম ঢাকা। আবার কেহ বলেন, ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে বুড়িগঙ্গায় আসিয়া, এই নদীবহুলা ভূমিকে মনোরম দেখিয়া, এইখানে রাজধানী করিবার সঙ্কল্পে স্থিরনিশ্চয় হন। আজ যেখানে ঢাকা অধিষ্ঠিত, সেই স্থান হইতে ঢাক বাজাইলে যতদূর অবধি শুনা যায়, ততদূর পর্য্যন্ত সহরের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ইহার নাম ঢাকা রাখেন। কীর্ত্তিনাশার বক্ষের উপর দিয়া আজ আপনারা সেই ঢাকা নগরীতে আসিয়াছেন।

শতাব্দীর সেই যবনিকা যদি সরাইয়া দেখেন, তবে দেখিবেন যে, সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এই বিশাল জনপদই বঙ্গদেশ—এখন সচরাচর যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলে, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগের সময় হইতে গৌড়ের সেনরাজগণের রাজত্ব পর্য্যন্ত তাহাকেই বঙ্গ বলিত। পদ্মা মেখলা এই চিরশ্যামা একদিন কি মহিমার কোটী সূর্য্যকিরণভাতিতে দীপ্তিময়ী ছিল। ঢাকা, বিক্রমপুর বলিতে সেই পুরাতন গৌড়-বঙ্গের কেন্দ্র বলিয়া মনে পড়ে। গৌড়-বঙ্গ ও মগধের কত না কাহিনী, কত সভ্যতার সংঘর্ষণের ইতিহাস ওতঃপ্রোতভাবে চলিয়াছে। মগধের কণ্ঠলগ্ন হইবার পূর্ব্বে গাঙ্গেয়গণের বিপুল বলশালী রণকুঞ্জরসজ্জিত অসংখ্য বাহিনী-শোভিত এই দেশের প্রাসাদশিখরে গগনস্পর্শী স্বাধীনতাধ্বজা সূর্য্যকিরণে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিত। সপ্তম শতাব্দীতে সে গৌড়-বঙ্গ কালের ঝঞ্ঝায় আঁধারে ডুবিয়া গেল। তারপর একদিন উত্তরাপথের আলোড়নে যুগ বিপর্য্যয় হইল। অবিরাম রাজ্যবিপ্লবে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। এই যুগব্যাপী ঘোর অরাজকতার ভিতরে বাঙ্গালার প্রাণ লুকাইয়াছিল, সে তাহার ধর্ম্মত্যাগ করে নাই। সুপ্ত প্রজাশক্তি সহসা স্বপ্নোত্থিতের মত আঁখি কচলাইয়া ভোরের আলোকে সব দেখিয়া লইল। সিংহপ্রতিম প্রজাশক্তি সমবেত হইয়া সেই "মাৎস্যন্যায়" সেই দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ও

অরাজকতার চরম দুর্দ্দশাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। এই যুগেই গৌড়-বঙ্গের শিল্প-প্রতিভায় বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্মের বিকাশ অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুরণ হইয়াছিল; জগতের ইতিহাসে সে কাহিনী সোনার নিকষে রেখা টানিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে। আজ সে দিন গিয়াছে, কালের যবনিকা তাহাকে শুধু তমগূঢ় অন্ধকারে ঘেরিয়াছে। তারপর, কুক্ষণে বঙ্গ গৌড়-বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিচ্ছিন্ন বঙ্গ ও গৌড় এই বিচ্ছেদে হীনবল হইয়া পড়িল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে ভেদবুদ্ধি আসিয়া উভয়কেই নষ্ট করিল। সে দিন বঙ্গ যে মহামণি প্রাণের মণিকোঠায় রাখিয়াছিল, তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। বাঙ্গালার মহানাগ অনন্তের মাথার মণি সেই দিন হারাইয়া গেল। তাহা আর মিলিল না। হায়! গৌড়, কেন এমন মণি হারাইয়া ফেলিলে! তাই সেই বিচ্ছেদের দিনে—সেই বিরহের দিনে—বাঙ্গালীর রাজার মাথার শ্বেতছত্র কে কাড়িয়া লইল? সে উত্তর ইতিহাস আর দিবে কি?

এইরূপে সেই যে দিন গৌড়ের স্বাধীনতা গঙ্গার জলে ভাসিয়া গেল, সে দিনেও এই পদ্মামেথলা শ্রীবিক্রমপুরের প্রাসাদশীর্ষে স্বাধীনতা-সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখাটুকু বঙ্গের ভাগ্যাকাশ হইতে একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। আজ সে শ্রীবিক্রমপুরের সে শ্রী নাই,বুকের উপর দিয়া পদ্মা চলিয়া গেছে, সে ভূভাগকেও টুক্‌রা করিয়া দিয়াছে। সেই স্বপনের দেশ, কোথায় গেল? সুখের সে স্মৃতি আছে, আর কিছু নাই!

আজ পূর্ব্ববঙ্গ শ্মশান—গাঢ়তর অন্ধকার, দিবসে নিশীথ! প্রেতের মত আমরা কয়টী আছি। তবু এই আমাদের ভিটা। তৈল বিনা সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিতে পারি না, ঘরের চালে খড় দিতে পারি না, দেউলে দেবসেবা হয় না! কীর্ত্তিনাশা ভাঙ্গে গড়ে, দুর্ম্মদা মাতঙ্গিনী একবার করিয়া কাঁদে, আরবার গরজি আস্ফালন করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। পেটে অন্ন নাই, কটিতে বস্ত্র নাই, জলাশয়েও জল নাই। যে মহাবীর্য্যের কেন্দ্র হইতে গৌড়-বঙ্গ একদিন প্রয়াগ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিত, যে কেন্দ্র হইতে একদিন বঙ্গ জগতের বিলাস যোগাইত, যে কেন্দ্র হইতে গৌড়ীয় রীতি ভারতে চলিয়াছিল, এ সেই ভূমি! যে ভূমিতে আদিশূর একদিন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এ সেই ভূমি! এই ভূমিতেই সেই সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; যাঁহাদের আশীষমন্ত্র ও শান্তিবারিতে শুষ্ক গজারী বৃক্ষ নব মুঞ্জরায় মুঞ্জরিত হইয়াছিল, এ সেই দেশ! সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে যে বাণিজ্যলক্ষ্মী অর্ণবপোত বোঝাই করিয়া ধন আনিত, সে ধনেশ্বরী আজ নাই। শতাব্দীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘান্ধকারে সে সব কোথায় মিলাইয়া গেছে। তাই আজ মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য নিজ গৃহে পরান্নভোজী, নিজ গ্রামে চিরপরবাসী, জীবন মরণের সন্ধির মধ্যে না-বাঁচা না-মরা হইয়া আছি। কি দিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিব। কবির সে কণ্ঠ

আমার নাই, তাহা হইলে আজ শুনাইতাম—এই অরণ্যানীমুখরিত ঘনভূম শ্যামতমাল ক্রম-সুশোভিত দেশের রূপের কথা; শুনাইতাম—এই অতল জলরাশির অতল তলে কি সৌভাগ্য ও বৈভব নিমজ্জিত; শুনাইতাম—যদি আমার এই প্রিয় সুহৃৎ গোবিন্দদাসের মত আমার কণ্ঠ থাকিত, তবে "আদিশূরের যজ্ঞভূমি"—বল্লালের অস্থিভস্মে পরিণত যে দেশের 'পথের ধূলি'—সে দেশের বিগত সমৃদ্ধির কথা ও কাহিনী আপনাদের শুনাইতাম; আর শুনাইতাম—অরণ্যের তমাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারে, অতল নদীতলে ও ভূগর্ভে মহাসমাধিতে লীন কি কীর্ত্তি, কি বিজয়কাহিনী! কি দারুণ অদৃষ্টের পরিহাস, কি করুণ কাহিনী এই কীর্ত্তিনাশার। আর শুনাইতাম,—সেই দানসাগরের কথা, কামরূপ-কলিঙ্গ-কাশী-বিজয়ীর পলায়ন-কলঙ্ক অপনয়ন করিতাম। গাইতাম,—হরিশ্চন্দ্রের কথা, অদুনা-পদুনার সেই প্রাণমনবিমোহনকারী মধুর কাহিনী; সেই চাঁদ রায় কেদার রায়ের বীর্য্যগাথা! হে বাঙ্গলার সন্তান! এ সেই সোনার দেশ, এই দেশে আজ আপনারা আসিয়াছেন। আজ সে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সে সাম্রাজ্য নাই, সে গৌরবের স্মৃতি আছে; সেই স্মৃতিই আজ আমাদের পুণ্যকথা, তাঁহাদের সেই পুণ্য-কাহিনী আজ যদি আমাদের আত্মস্থ করিয়া দেয়, যদি এই অসীম জলরাশির বুকে তেমনি করিয়া, আবার পাল তুলিয়া, জীবন-যাত্রায় যাত্রা-গান গাহিতে পারি।

সেই স্বপ্নের দেশে, আজ দেখুন, আমরা কি হইয়া আছি! দিন গিয়াছে, এই দেশ একদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মে কত উন্নত ছিল, সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশে যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শীলভদ্র জন্মিয়াছিলেন, তিনিই চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াংএর গুরু। ভারতেতর দেশের পরিব্রাজকেরা জ্ঞানলাভের জন্য এই দেশে আসিতেন। সেই জগদ্বিখ্যাত—সেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই দেশেই জন্মিয়াছিলেন। আজিও লোকে নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী বলিয়া দেখাইয়া দেয়। এই গৌড়-বঙ্গের বীরদেবই একদিন জগদ্বিখ্যাত নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য্য ও সংঘস্থবির ছিলেন। আপনারা আজ সেই দেশে আসিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বাঙ্গলার প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। সে যুগের পরিচয়, কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই বিশিষ্টভাবে যুক্ত; তবুও সেই শতবৎসরের মাঝে ব্রাহ্মসংস্কার ও স্বদেশীর মহা-আন্দোলনের দিনে এই আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী কতভাবে কতদিক দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্রশক্তিতে যাহা পারিয়াছি, তাহাই করিয়াছি। কবে আমাদের সব আয়োজন সার্থক হইবে, কবে আমাদের সব চেষ্টা যথার্থ মাতৃপূজায় পরিণত হইবে। কবে সেই মহাযজ্ঞের ধূম নদীপ্রান্তে, অরণ্যশীর্ষে, বনানীর অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিবে! বড় দুঃসময়ে আপনাদের ডাকিয়াছি—আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে, দেখিয়া যান,—এ সেই পূর্ব্ববঙ্গ।

এই বঙ্গে শুধু আজ আমরা একলা নই, আমাদের আর এক ভাইরা এখানে আছেন। তাঁহাদেরও গৌরবের কথা আছে, তাঁহাদেরও দুঃখের কাহিনী আছে। আজ এই আমাদের মুসলমান ভাইরা। অতিথিপরায়ণ বঙ্গ কখন অতিথিকে ফিরায় নাই। বুদ্ধকে সে স্থান দিয়াছে, মুসলমান ধর্ম্মকেও স্থান দিয়াছে। সে দিন যে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা হাতে করিয়া, গৌড়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাহারা আমাদের প্রতিবেশী। আমাদেরই মত সমদুঃখী। একই মাতৃস্তন্যপানে আমরা বাঁচিয়া আছি, বাঙ্গলা তাহাকে তাহার বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে। ভাই ভাইয়ে কলহ কোন্ দেশে না হয়, তাহা হইলেও তাহারা আমাদের ভাই। সেই ইস্‌লাম পতাকাবাহীর বংশে মহাপ্রাণ সোলেমান কিরাণী জন্মিয়াছেন; সেই যবন হরিদাস একদিন হরিধ্বনিতে বঙ্গ মাতাইয়াছে; সেই মুসলমান আলোয়াল একদিন পদ্মাবতী রচনা করিয়াছে; সেই মুসলমান কত কবির কত গান, কত ফকির, কত সাধু এই বঙ্গদেশের জন্য ভগবানের কাছে দোয়া করিয়াছে; সেই মুসলমান কবি চাঁদ কাজির গানে আছে—

ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি।
আর অভাগীয়া নারী হাম সে সাঁতার নাহি জানি॥

মুসলমান কবি এ গান বাঁধিবার সময় বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই এ গান বাঁধিতে পারিয়াছিলেন। এই ঢাকা নগরীতে সেই ইস্‌লামের বিজয়-তোরণ আজিও দাঁড়াইয়া আছে। একই জমির পাশে পাশে লাঙ্গলের ফলকে হিন্দু-মুসলমান, আপনাদের ক্ষুধার অন্ন যোগাইতেছে। তাহাদের মর্য্যাদা আমরা যেন কখন লঙ্ঘন না করি। সে দিনেও টাকায় আট মণ চাউল মিলিত, এ দারিদ্র্য সে দিনেও আসে নাই।

হে অতিথি! ওই সেই রামপাল, ওই সেই প্রাচীন যজ্ঞবেদী আপনাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে, সে ত মূক নয়, যজ্ঞের মন্ত্রের প্রতিধ্বনি এখনও তাহার প্রাণের তারে ঝনন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছে। ওই সেই ভস্মসুপ্ত অগ্নি, বুঝি বা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আছে অতিথি, আছে! যে বেদধ্বনি এই যজ্ঞভূমে উঠিয়াছিল, যে ধ্বনি অরণ্যানী শুনিয়াছে, যে ধ্বনি পদ্মায় একদিন ঘোর করিয়া ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও আছে; আকাশে বাতাসে এখনও তাহার সুর বাজিতেছে। এই সেই প্রাচীন হব্যভস্ম মাটী বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই ভস্ম আজি আপনাদের ললাটদেশ শোভিত করুক্। এ ভূমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছে। হে ঋত্বিক! আবার তারস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করুন, অগ্নি জ্বলিয়া উঠুক, দেখিবেন,—এই এতকালের সহিষ্ণু মাটী শতধা দীর্ণ হইয়া, সেই জ্বলিতজ্বলন মহান্ ধূর্জ্জটীকে জ্বলজ্জাল-জটাজাল দীপিয়া

তুলিয়াছে। যিনি সহস্র সহস্র বৎসরের বাঙ্গলার মৃতসতীকে স্কন্ধে করিয়া প্রলয়কালের তাণ্ডব-নর্ত্তনে সব রিষ ঈর্ষা অক্ষমতা পরানুকরণের মতিচ্ছন্ন অহঙ্কার জ্বালাইয়া, সেই সৃষ্টিপারাবারের একাকার আনিয়া দিবেন—সংহারের পর আবার নীহারিকায় নূতন বাঙ্গলার সৃষ্টি হইবে। বাহান্ন পীঠের মত সারা ভারতে আবার পীঠস্থানে মন্দির উঠিবে। হে তপনিষ্ঠ সত্যসন্ধ সাহিত্যের রথিগণ, জীবনে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে একাত্ম হইয়া সেই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি আসুন; স্বাহা স্বধা বিবিধ অগ্নিই জ্বলিয়াছে! পূর্ব্ববঙ্গের শ্মশানে, বল্লালের ভিটায় সেই শব-সাধনায় অগ্রসর হউন্। তাই বাঙ্গালরা আপনাদের ডাকিয়াছে! এই শ্মশানে মড়ার হাড়ে ফুলের মালা পরিয়া, কি ভুলে ভুলিয়া আছি, সেই ভুল একবার ভাঙিয়া দিউন।

আমি দেখিতেছি, ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, সেই বাঙ্গলার প্রাণধর্ম্ম ধীরে ধীরে কেমন লীলাচঞ্চল স্রোতের মত চলিয়াছে। 'মাৎস্যন্যায়ের' অরাজকতার যুগে বাঙ্গলা যে গর্জ্জন করিয়াছিল, সে সুর বাঙ্গলা ভুলিয়া যায় নাই। আজ ফেরঙ্গ যুগেও বাঙ্গলা সেই ধর্ম্মের আন্দোলন ভুলে নাই। কত শতাব্দী পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্ম, যে প্রাণমূর্ত্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই সময়েই এই নগরোপান্তে সেই অদ্বৈতবংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গেণ্ডেরিয়ার গহনবনে সেই প্রাণধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেখিতেছি, পদ্মা-গঙ্গার লীলার স্রোত একই প্রাণের আন্দোলন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন এই পদ্মাবতী তীরে তাঁর সেই অরুণ রাঙ্গা চরণ দুখানি রাখিয়াছিলেন, তাই—

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥

আর—

ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্ব্বলোক পবিত্র করিতে॥

আর—

বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥

আর এই ঢাকা নগরীতে বাঙ্গলার শেষ বৈষ্ণবকবি কৃষ্ণকমল, সেই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ও তাঁহার রাধাভাবের রসে সিঞ্চিত 'রাই-উন্মাদিনীর' প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন। আমরাও আজ কৃষ্ণকমলের রাধিকার মত—

তব পথ নিরখিয়ে ব'সে আছি সই!
তুমি চন্দ্রে! একা এলে, প্রাণনাথ কই?

চন্দ্রা রাইকে বলিয়াছিলেন,—

অঘটন ঘটাতে পারি—কৃপা হ'লে তোর—

চন্দ্রা অঘটন ঘটাইয়াছিলেন, আপনারাও 'কৃপা হ'লে' অঘটন ঘটাইতে পারিবেন না কি?

তারপর, এই ঢাকায় প্রথম 'নীলদর্পণ' হইয়াছিল, সে কথা বোধ হয় আপনাদের কাহারও অজ্ঞাত নাই।

এই প্রদেশের কাছে ভাওয়াল, সাভার ধামরাই প্রভৃতি যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড ভূভাগে স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাদের কত না কাহিনী, কত না দুঃখ-সুখ এই মাটীর ধূলিতে মিশাইয়া আছে। হায়! তাহার কাহিনী কে আজ গাহিবে। যদি সেই সুপ্ত ইতিহাসের বাণী কোন দিন কেহ সজাগ করিয়া তুলেন, তবে দেখিবেন,—কি শক্তিমান্ এক মহাপ্রাণ জাতি কি গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছে।

সুখ-দুঃখের অনেক কথা আপনাদের শুনাইতে চাই, সব শুনাইতে পারি কই, কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে—বুক ফাটিয়া যায়। বুঝি আজিকার দিনের মত বাঙ্গলার ঘরে এমন দুর্দ্দিন কখনও আসে নাই। এত কালের দীর্ঘ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও এত অন্ধকার, দীর্ঘনিশ্বাস ও হা-হুতাশের নিষ্ফল বাণী ফোটে নাই। এমন বিপন্ন আমরা আর কখনও হই নাই। এক রামচন্দ্রের বনবাসে সারা অযোধ্যা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ভাগ্যহীন, কত শত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বনবাসে দিয়া একহাতে চক্ষু মুছিতেছে, আর অন্য হাতে আপনাদের জন্য পাদ্য ও অর্ঘ্য আনিয়াছে। দয়া করিয়া আমাদের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। সুদিন গেছে, কুদিনে আসিয়াছেন। আপনারা দুর্দ্দিনের অতিথি, দুঃখী বিদুরের খুদ আছে, আর কিছুই নাই। পূর্ব্ববঙ্গ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাই আপনাদের নিবেদন করে—শ্রদ্ধার হবিঃ গ্রহণ করুন, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ধন্য হউক্, কৃতকৃত্য হউক।

দরিদ্র সেবক মোরা আছি জন্ম জন্ম।

হে সাগ্নিক! আসুন, তবে সমস্বরে মাকে ডাকি। মা যদি গঙ্গায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি পদ্মায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরের স্থির গম্ভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তিনি শুনিতে পাইবেন। মার ভাষা দিয়াই মাকে ডাকি, আসুন! মা ত আমাদের আর কোন বাণী শিখান নাই। মা আছেন, আবার মা উঠিবেন, আবার আমরা এই ভাগ্যবতী পদ্মাবতী-তীরে মাতৃপূজা করিব। আবার সেই সহস্রদলবাসিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্তচরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবিঃ দান করিব। আর গললগ্নী-কৃতবাসে বলিব,—জননি জাগৃহি!

সভাপতির অভিভাষণ *

বঙ্গবাণীর সেবকগণ, বন্ধুগণ!

মধু-অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা সঙ্গত না হইলেও শাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু মধুর স্থলে নিম—মিঠের স্থলে তিত—এ ব্যবস্থার কে অনুমোদন করিতে পারে? অথচ বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্‌যোগকারী ঢাকার অভ্যর্থনা-সমিতি সভাপতি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই সম্মিলনে সভাপতির সম্মানের আসন অলঙ্কৃত করিবেন—এইরূপ স্থির হইয়াছিল। যিনি বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের যুগব্যাপী অক্লান্ত সেবার দ্বারা নিজের শরীরে অকালবার্দ্ধক্য আনয়ন করিয়াছেন, যিনি দর্শন বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব তথ্যপূর্ণ বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে দর্শন বিজ্ঞানের ব্যোমবিহারী সুপর্ণকে আমাদের পৃথিবীর মাটীতে নামাইয়া আনিয়াছেন, বঙ্গবাণীর সেই একনিষ্ঠ সেবক, সৌম্য শান্ত সুধী রামেন্দ্রসুন্দরকে এই আসনে সমাসীন দেখিলে আমরা সকলেই ধন্য হইতাম এবং বর্ত্তমান যজ্ঞের প্রজাপতি অভ্যর্থনা-সমিতির উদ্দেশে কালিদাসের ভাষায় বলিতে পারিতাম—

চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ।

কিন্তু 'নরে করে আশা, পুরান জগদম্বা'। রামেন্দ্র বাবু এমন পীড়িত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার পক্ষে সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করা অসম্ভব হইল। তখন অভ্যর্থনা-সমিতির সানুগ্রহ দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হইল—মধুর অভাবে নিমের ব্যবস্থা হইল। ইহাকেই বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর স্থলে আমি! এ যে 'স্বর্গ হ'তে রসাতলে দারুণ পতন।' অভ্যর্থনা-সমিতি উদারতার যথেষ্ট পরিচয় দিলেন বটে, এবং Any port in storm (তুফানে বন্দরের বাচ্‌বিচার নাই) এই প্রাচীন নীতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। কিন্তু আমি প্রমাদ গণিলাম। প্রথম প্রথম নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া বিশেষ দ্বিধা অনুভব করিতে লাগিলাম এবং আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে আমার সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতি নানা অজুহত জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু বন্ধুবর আদ্যোপান্ত সুকবি—

---

* ঢাকায় সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ।

তিনি কবিতা-রস-মাধুর্য্য মন্থন করিয়া গৈরিশী ভাষায় বলিলেন, 'অতিক্রত—অতিক্রত ধাও বীর !' অর্থাৎ যদিও এক অষ্টাহমাত্র সময় আছে, ইতিমধ্যেই তোমার অভিভাষণ লিখিত পঠিত মুদ্রিত করিয়া শীঘ্র ঢাকাভিমুখে অগ্রসর হও। বন্ধুবর ভুলিয়া গেলেন যে, আমি বীর নই—ধীরবিলম্বিত পাদক্ষেপই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অবশেষে ভাবিলাম, আমি রন্ধ্র-শোধক মাত্র—যাহাকে stop-gap বলে—কি লাগে আমার। সেই ভাবেই আমি এখানে আসিয়াছি এবং সেই ভাবেই আপনারা আমাকে গ্রহণ করিবেন। আমার অক্ষমতা, আমার দোষ ক্রটী, আমার এই অভিভাষণের ভ্রম-প্রমাদ, চিন্তার তরলতা, নীরসতা, পল্লবগ্রাহিতা, গাম্ভীর্য্যের মৌলিকতার অভাব ইত্যাদি যখনই আপনাদিগকে পীড়িত করিবে, তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিবেন যে, এই নিয়মের জগতে উৎকট কর্ম্মের ফল হাতে হাতে ভোগ করিতে হয়—তা সে কর্ম্ম ব্রহ্মহত্যাই হ'ক অথবা অযোগ্য সভাপতির নির্ব্বাচনই হ'ক। আর পারেন যদি, তবে উপনিষদের প্রাচীন উপদেশ স্মরণ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের বাসে আমাকে আবৃত করিয়া আমার ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হইবেন—

ঈশা বাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

এই সাহিত্য-সম্মিলনের ভাব-জগতে সূচনা হইবার পর, সুকবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্রের শেষে সাহিত্যসেবিগণ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত করিবার জন্য বরিশাল নগরে সমবেত হন। কিন্তু রাজনীতির কল কোলাহলে, বিশেষতঃ পুলিশ-পুঙ্গবদিগের সুদীর্ঘ 'রেগুলেসান' লাঠীর গুরুগম্ভীর নিনাদে, ঐ মিলিত-প্রায় সাহিত্য-সম্মিলনের বোধন না হইতেই বিসর্জ্জন হইয়া গেল। পরে ১৭ই কার্ত্তিক ১৩১৪ সাল, রবিবারে কাশিমবাজার রাজবাটীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাঙ্গনে বদান্যবর বিদ্যোৎসাহী বঙ্গজননীর সুসন্তান শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রনাথ নন্দী মহোদয়ের উদ্‌যোগ আমন্ত্রণ ও আয়োজনে এই 'সাহিত্য-সম্মিলন' প্রথম সমবেত হইলেন। ঐ দিন বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন প্রথম সর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী সুধীগণ এক বিরাট যজ্ঞশালায় সমবেত হইয়া এক শুভ বাণী যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর বঙ্গ ও বিহারের নানা স্থানে এই সাহিত্য সম্মিলনের পর পর নয়টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে—আজ আমরা ঢাকাবাসীর আহ্বানে সাহিত্য-সম্মিলনের এই একাদশ অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছি। প্রথম অধিবেশনের উদ্‌বোধন-স্বরূপ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহার একাংশ আপনাদের শুনাইতে চাই—"সাধকভেদে যেমন জননীর মূর্ত্তিভেদ হয়, সেইরূপ দেশভেদে ও কালভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন।

'বন্দে মাতরম্' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীকে যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মায়ের এই মূর্ত্তি এমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই, এবং সেই মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তদুপযোগী সাধনার সময় পান নাই।"

* * * *

"অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি? বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্যসেবিমাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে। প্রত্যেকের পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্যসেবীর মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞানপ্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তিপথের উপদেষ্টা, কেহ কর্ম্মমার্গের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না, যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন সে সকল ফুলই সেই রাঙ্গাচরণের রক্তজবার সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়, যাহা আহরণ করিবেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। "যজ্জুহোসি, যদশ্নাসি, যৎ করোষি, দদাসি যৎ", - ভগবতীর আদেশ—সেই সমস্তই সেই এক চরণে অর্পণ করিতে হইবে।" আমিও রামেন্দ্র বাবুর এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—আজ নহে কাল নহে, 'যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে নিত্য নিরন্তর' আমাদের সমস্ত সাধনার লক্ষ্য, সমস্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার গম্য ঐ শ্যামাঙ্গিনী জননী, ঐ সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, ঐ কাননকুন্তলা, ঐ নদীমেখলা, ঐ সাগরসুতলা, ঐ সুস্মিতা ভূষিতা জননী। আসুন মাকে প্রণাম করিয়া বলি—"বন্দে মাতরম্"॥

শোকপ্রকাশ।

১৩২৩ সালের পৌষ মাসে বাঁকীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনের পর সাহিত্য-সম্মিলনের দুই জন ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার। উভয়েই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন,—তাঁহাদের অভাবে বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যের যে আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার পথপ্রদর্শক এই দুই মহাত্মা। তাঁহারাই প্রথমে সহযোগে চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম প্রভৃতির কবিতা ও কাব্যের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে আজ বহু

বৎসরের কথা। তার পর সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ব্যবহারক্ষেত্রে বহু ধনাগম ও পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ক্রমশঃ হাইকোর্টের জজিয়তী প্রাপ্ত হন; কিন্তু তথাপি কোন দিনই বঙ্গবাণীর সেবায় উদাসীন হয়েন নাই। তাঁহারই কর্ণধারতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ উন্নতির পর উন্নতির সোপান অতিক্রম করিয়াছে এবং এই সাহিত্য সম্মিলন সংবদ্ধ ও সুস্থিত হইয়া সাহিত্যসেবীর গৌরবের বস্তু হইয়াছে।

সাহিত্যগুরু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বিষয় আমি বলিতে পারি? বঙ্গমাতার এমন একনিষ্ঠ সেবক আমরা আর কবে দেখিতে পাইব? প্রথম যৌবনের আরম্ভ হইতে স্থবিরত্বের শেষ দিবস পর্য্যন্ত সমান আদরে সমান গৌরবে সমান নিষ্ঠার সহিত কে এমন বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিয়াছে? কে এমন অবহিত সতর্ক প্রহরীর মত বঙ্গজননীর মন্দিরদ্বারে দিনের পর দিন সজাগ পাহারা দিয়াছে? চুঁচুড়ার ও চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল, তাঁহারা এই প্রবীণ সাহিত্যিকের সাগ্রহ আন্তরিক অমোঘ মর্ম্মবাণী সহসা বিস্মৃত হইবেন না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের কথা।

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সম্মিলন-পরিচালনের জন্য কোন নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা হয় নাই; ববং সম্মিলনের শৈশব-দোলায় নিয়মের বজ্রবন্ধনী নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; এবং প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে ঘোষিত হইয়াছিল যে—"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অন্নাশন-সংস্কার সম্পাদিত হইলে চূড়াকরণ-কালে তাহার ভবিষ্য জীবনের অনাময় নিমিত্ত উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থার আস্থাপন করা যাইবে।" কিন্তু অচিরেই বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। তদনুসারে দ্বিতীয় অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণের নিমিত্ত পাঁচজন ব্যক্তির উপর ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা খসড়া নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে উহা উপস্থিত করিলে, ঐ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়া উক্ত নিয়মাবলী তৎপরবর্ত্তী সম্মিলনে বিবেচিত হইবে, এইরূপ স্থির হয়। কিন্তু ঐ তৃতীয় অধিবেশনেই ভবিষ্যৎ সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান, এই তিন বিভাগের জন্য তিনটী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। জাতীয় সাহিত্যের গঠনে দর্শনের স্থান সংকীর্ণ বিবেচিত হওয়ায় বোধ হয় ঐ অধিবেশনে দর্শনের জন্য কোন ভিন্ন শাখা-সমিতি-গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। পরবর্ত্তী অধিবেশন, যাহা ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই অধিবেশনে নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি গৃহীত হয়। ঐ নিয়মাবলীতে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছিল,—

"বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা, প্রচার ও সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময় সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিসম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্যনির্ণয় উক্ত উদ্দেশ্যের বিশিষ্ট অঙ্গরূপে গণ্য হইবে; তজ্জন্য এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য ও স্থানীয় লোকদিগকে তৎসম্বন্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতি বর্ষেই সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হইবে।"

পরে সংশোধিত হইয়া সম্মিলনের উদ্দেশ্য এখন এই ভাবে প্রকাশিত হইতেছে,—

"সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময়, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার, বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী-জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্যনির্ণয় এবং জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

প্রথম প্রথম দর্শন সাহিত্যিক শাখার অঙ্গীভূত ছিল, কিন্তু পরে দর্শন স্বতন্ত্র শাখায় নিজের যোগ্য আসন লাভ করিয়াছে। এখনকার নিয়মে কার্য্যের সুবিধার জন্য সম্মিলনের কার্য্য নিম্নলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে। (ক) সাহিত্য শাখা (খ) দর্শন শাখা (গ) ইতিহাস ও ভূগোল শাখা (ঘ) গণিত ও বিজ্ঞান শাখা।

চুঁচুড়ায় সাহিত্য-সম্মিলনের যে পঞ্চম অধিবেশন হয়, ঐ অধিবেশনে প্রথম বিজ্ঞান শাখার স্বতন্ত্র সভার অনুষ্ঠান হয়। তৎপরবর্ত্তী চট্টগ্রামের অধিবেশনেও ঐ প্রণালী অনুসৃত হইয়াছিল। কলিকাতা নগরীতে সাহিত্য-সম্মিলনের যে বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল, ঐ অধিবেশনেই প্রথমতঃ সম্মিলনের কার্য্য উক্ত চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখার স্বতন্ত্র সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তদবধি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধারণ সভাপতি ব্যতীত চারি শাখার চারি জন বিভিন্ন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেছেন, এবং প্রত্যেক সভাপতি স্ব স্ব শাখার উপযোগী স্বতন্ত্র অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন। ইহার ফলে সমাগত সুধীবৃন্দ অনেক সময় ইচ্ছা স্বত্বেও সকল শাখার রসাস্বাদে বঞ্চিত হইতেছেন। কারণ, সময়াভাবে প্রায়ই এক সময়েই চারি শাখার ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অধিবেশন করিতে হইতেছে। শ্রোতৃবৃন্দ যোগসিদ্ধির অভাবে কায়ব্যূহ-রচনায় অসমর্থ হইয়া হয় এক শাখায় সুস্থিত থাকেন, অথবা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে বিচরণ করিয়া যুগপৎ শ্রান্তি ও নির্ব্বেদ অনুভব করেন। ইহার একটা সদুপায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে সদুপায়ের প্রধান অন্তরায় পঠিতব্য প্রবন্ধের বাহুল্য।

সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রবন্ধ-সংগ্রহের জন্য সারা দেশময় নারদের নিমন্ত্রণ করেন। তাহার ফলে প্রত্যেক শাখাতে পাঠের জন্য নানা বিষয়ে উত্তম মধ্যম বহুসংখ্যক প্রবন্ধ

উপস্থিত হয়। সময়াভাবে অধিকাংশ প্রবন্ধই পঠিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় এবং যদি বা দু' এক জন সৌভাগ্যবান্ লেখকের ভাগ্যে প্রবন্ধপাঠে সুবিধা ঘটে, তথাপি সেই সকল প্রবন্ধ চারি শাখার যুগপৎ অধিবেশনের হট্টগোলে যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না। এইরূপে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হয়। সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই বিষয়ের প্রতিবিধান করিবার জন্য আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান—এই চারি শাখায় বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা যে সঙ্গত ও সমীচীন, এ বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নাই। এই চারি শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশনও যে বাঞ্ছনীয়, তাহাও বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই সকল বিশেষ অধিবেশন সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দের মিলন-স্থান না হইয়া বিশেষজ্ঞের চিন্তাবিনিময় ও গবেষণা-পরিচয়ের কেন্দ্র করিলে কিরূপ হয়? এবং প্রত্যেক শাখার বিশিষ্ট সভাপতির অভিভাষণ যুগপৎ পঠিত না হইয়া সাধারণ সভায় পর পর পঠিত হইবার ব্যবস্থা করিলে কেমন হয়? যেন সমবেত সুধীবৃন্দ ইচ্ছা থাকিলে কেহই ঐ সকল অভিভাষণের রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত না হন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ প্রবন্ধের বাহুল্য-ঘটা সঙ্কুচিত করিয়া প্রত্যেক শাখার আলোচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক বা দুই জন ব্যক্তিকে সাধারণ শ্রোতার উপযোগী করিয়া স্ব স্ব বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আহ্বান করিলে ভাল হয়। শুনিয়াছি, এমন এমন একটি প্রবন্ধ শুনাইবার জন্য ইংলণ্ডের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক সর্ব্বদাই এটল্যান্টিক সমুদ্র পার হইয়া আমেরিকায় যান, এবং আমেরিকার বিশিষ্ট লোক ইংলণ্ডে আসেন। আমাদের বিশিষ্ট মহোদয়েরা এক জেলা হইতে অন্য জেলায় আসিতে পারিবেন না কি?

এইরূপ করিলে প্রতিবর্ষে সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত প্রত্যেক শাখায় সেই শাখার সভাপতির অভিভাষণ এবং একটি কিংবা দুইটি বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সম্মিলনের গৌরবের সামগ্রী হইতে পারিবে এবং ঐ সমস্ত প্রবন্ধই সাধারণ সভায় সমবেত সকল সুধীবৃন্দের বিনোদন ও শিক্ষণের উপায়স্বরূপ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের বৈঠকে কূট প্রশ্ন ও সমস্যার আলোচনা চলিবে। তৎসঙ্গে প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রালিপি, আলেখ্য শাসন মূর্ত্তি প্রভৃতির প্রদর্শন, আলোকচিত্রের সাহায্যে সরল ও সরসভাবে জ্ঞানবিস্তার এবং সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভাববিনিময় দ্বারা সাহিত্য-সম্মিলনের এই আনন্দের মেলা শুধু হাসিখেলা ও হট্টগোলে শেষ না হইয়া সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করিবে।

আপনাদের স্মরণ হইবে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিগত দশম অধিবেশনে সম্মিলনকে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী দ্বারা বিধিসিদ্ধ বৈধতা

প্রদান করিবার জন্য সেই সম্মিলনের সভাপতি মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং আমাকে লইয়া একটী শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতি বর্ত্তমান নিয়মাবলীর আদর্শে কতকগুলি নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়া সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যকরী সমিতি প্রভৃতির নিকট বিবেচনার্থ পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত প্রাপ্ত হইলে রেজেষ্টরীকারী-সমিতি আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া বোধ হয় সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিতে পারিবেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ।

দশম অধিবেশনের সভাপতি-রূপে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী যে আশা ও উদ্দীপনাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার ধ্বনি নিশ্চয়ই আপনাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে এখনও ঝঙ্কৃত হইতেছে। "দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব। আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব। আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশ জন অন্য মায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে।" এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে আমাদিগকে অভিষিক্ত হইতে তিনি উপদেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধনির্ম্মাণকল্পে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনি উদ্দীপনার ভাষায় বলিয়াছিলেন, —"বাঙ্গালী জাতির ইতর ভদ্র সকলের মনে একবার কোন ক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের, তথা মদীয় জাতির অভ্যুদয় গ্রথিত; বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট, বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতর ভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যে অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন ঋতুরাজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে, এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে, একমনে সকলে মধুর বাসন্তীমূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে এক ভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননী বঙ্গভাষার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির বিমল প্রভায় বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভুজা বঙ্গভারতী, দশভুজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণা। দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। 'বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জলে' পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।"

আমরা সমস্বরে দেবভাষায় বলি—বাঢ়ম্, বাইবেলের ভাষায় বলি, Amen—আরও বলি "সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

কিন্তু সরস্বতী মহাশয় ধ্যাননেত্রে ভাবরাজ্যে যে মহনীয় চিত্র দর্শন করিয়াছেন, যদি তাহাকে আকার দান করিয়া বাস্তবে পরিণত করিতে হয়, তবে প্রথমেই বঙ্গভাষাকে বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করিতে হইবে—তাহা না পারিলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে, সমস্ত আশা ভগ্ন হইবে।

কথাটা এত গুরুতর যে, একটু বিস্তার করিয়া বলি। বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিতে অনেকগুলি নিপুণ কর্ম্মঠ স্থপতির দরকার—এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এখন প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা ঐরূপ স্থপতির উদ্ভব হইতেছে কি না? আমার এক পরিহাসরসিক বন্ধু বলেন যে, গবর্মেণ্টের প্রবর্ত্তিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণোদিত শিক্ষার ফলে কেবল দুই শ্রেণীর জীব তৈয়ারী হইতেছে—এক গোলাম, অন্য গুণ্ডা। কথাটা যে একেবারে অমূলক তাহা নহে; কিন্তু হয় ত ইহাতে কিছু অত্যুক্তি আছে। অতএব যাঁহারা আমার বন্ধুর মত চটুল নহেন, যাঁহারা গম্ভীর ভাবুক দায়িত্ব-জ্ঞানী লোক, তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাউক। প্রথমতঃ, আমাদের সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর উপর এমন বিরক্ত ছিলেন যে, আমাদের শিক্ষিতদিগকে ভারবাহী গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—"খরো যথা চন্দনভারবাহী"। তার পর যিনি বিধিদত্ত অধিকারে বঙ্কিমবাবুর সাহিত্য-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলেন? তিনি আমাদিগকে চলন্ত নোটবুক্ ও স্ফুরন্ত ফণোগ্রাফ বলিয়াছেন, এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মৌলিকতা ও সজীবতার অভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মুখে এই কবিতাটী বসাইয়াছেন:—

"ভয়ে ভয়ে যাই ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে সুধু পুঁথি আওড়াই!"

পূর্ব্ব ও পশ্চিম—যুক্ত-বঙ্গের গৌরব কবিবর নবীনচন্দ্র সেন আত্ম-জীবনচরিতে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীকে শিশুমুণ্ডমালিনী মহাকালী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এবং ঐ শিক্ষার ফলে অকালে কত শিশুহত্যা হইতেছে, তাহার বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার ভাব অবলম্বন করিয়া আমার এক অভিন্নকলেবর বন্ধু একটী ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাদের শুনাইতে চাই—

নিজ শিব পদে দলে,
শিশু মুণ্ডমালা গলে,
সংহার-রূপিণী, ঘোরা, মুখে অট্টহাস।

লোল রসনা লকে,
রুধির ঝলকে ঝকে,
পূতনারূপিণী বামা বঙ্গে পরকাশ ॥

ইহা আপনাদের নিকট কবিতার অত্যুক্তি মনে হইতে পারে। অতএব, এক জন ধীর স্থির প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি শুনুন। ইনি দেশপূজ্য মারাঠা জননায়ক জষ্টিস্ রাণাড়ে। তিনি এই শিশুহত্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ;—

"The chief of the causes leading to the premature deaths of our students is over study and the strain caused by the stiff system of frequent competitive examination in subjects which have to be mastered in a foreign language and which tax the powers of students beyond their endurance * * *

* * * Attempting to secure thoroughness, as it is called, the University system directly produces the unhappy result of ***killing many of the brightest students*** who come within its influence * * * * The true etiology of what I call nervous or vital exhaustion and atrophy of energies must be sought in the deeper recess of the educational system. The bow is too much bent, and when it is relaxed it refuses to unbend again except under pressure and enforced order" দেহক্ষয় অপেক্ষা এই যে মনের অপচয়—মানসিক পঙ্গুতা— ইহা আরও মারাত্মক।

আমাদের দেশমান্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি আজীবন শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন, এবং যিনি স্বভাবসুলভ ধীরতার বশে প্রত্যেক শব্দ ওজন করিয়া উচ্চারণ করেন, তিনি এ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন,—

"The existing system of English Education in this country h s failed to produce satisfactory results * * The time for change of met' od has certainly arrived" আমার স্মরণ আছে, একবার কলিকাতার সেণ্টজেভিয়ার কলেজের অধ্যক্ষ Father Lafont, যাঁহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তিনি আমাদের শিক্ষা-প্রণালীকে huge sham বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জানত এমন কয়েকটী ছাত্র আছে, যাহারা উপাধি-পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ সেই সেই বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এ কথায় বোধ হয় আমরা অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে সমর্থন করিতে পারি। আমি একজন দর্শনশাস্ত্রের এম-এর কথা জানি, যিনি কেবল নোট পড়িয়া পাশ হইয়াছেন, একখানিও দার্শনিক গ্রন্থ উল্টাইয়া দেখেন নাই! সম্প্রতি

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, এক জন Astronomy-সংযুক্ত গণিত বিভাগে এম এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, অথচ কোন দিন গগনবিহারী গ্রহনক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দূরবীক্ষণে চক্ষুঃ-সংযোগ করেন নাই। অনেকেই শিক্ষিতদিগের পঙ্গুতা ও শিক্ষার বন্ধ্যাত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশের ডাক্তার ভাণ্ডারকর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন—"the languid interest which our graduates feel in literary pursuits in after life"। দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই জ্ঞানস্পৃহার অভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয়সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপন ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেন না, ইংরাজীতে একটী কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকটে আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন পাশ যেথানকার ছাত্রদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেথানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতিবিধান কিংবা যে কোন প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়-মূলক কার্য্যের সাফল্যসম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত।"

ডাক্তার রায়ের বহু পূর্ব্বে মনস্বী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধে" আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দেশে বিজ্ঞানশালার প্রতিষ্ঠা করিলে কি হইবে, দেশের মধ্যে এখনও বৈজ্ঞানিকতার অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। এই সকল গুরুকল্প ব্যক্তিদিগের কথার পর আমি কি বলিতে পারি? আর যদিই বা বলিতে যাই, হয় ত কিছু কটু কঠোর বলিয়া ফেলিব। তবে আমার যাহা বক্তব্য, এক জন আইরিস্ লেথক আয়ারল্যাণ্ডের শিক্ষা-বিভ্রাটের বর্ণনায় তাহা যথাযথ বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিই—আপনারা ঐ উক্তিতে আয়ারল্যাণ্ডের স্থানে ইণ্ডিয়া বসাইয়া লইবেন :—

"Education in Ireland encumbers the intellect, checks the fancy, debases the soul and enervates the body. It cuts off the Irishman from his tradition and by denying him a country debases his soul ; it stores his mind with lumber and nonsense ; it destroys his fancy by cutting him off from his traditions and enervates his body by denying him physical culture."

যে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এত দোষ, তাহার আমূল সংস্কার না হইলে আমাদের জাতির কি ভরসা আছে? যদি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ গড়িয়া তুলিতে হয়,

তবে তাহার জন্য অনেকগুলি মানুষ চাই—কয়েক জন অতিমানুষও চাই—মেষের দ্বারা সে কার্য্য হইবে না, মহিষের দ্বারাও হইবে না। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যাহার ফলে স্বতন্ত্র স্বাবলম্ব স্বনিষ্ঠ স্বাধীন সামাজিক প্রস্তুত হইবে; যাহাদের দেহে বল থাকিবে, মনে দৃঢ়তা থাকিবে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিবে, এক কথায়, যাহারা এই মৃতকল্প দেশকে সজীব সজাগ করিতে পারিবে,দেশে নূতন শিল্প নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে,নূতন সাহিত্যের নবগঙ্গা আনয়ন করিবে; নূতন বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা রচনা করিবে; নূতন দর্শনের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলিবে। কেন বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে এইরূপ মানুষ প্রস্তুত হইতেছে না? বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, অধ্যবসায়ের অভাব নাই, তথাপি এইরূপ হইতেছে কেন? আমাদের দেশে শিক্ষা কেন বন্ধ্যা হইতেছে, শিক্ষিত কেন পঙ্গু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, বাঙ্গলাকে শিক্ষার বাহন না করিয়া বিদেশী ভাষার দ্বারা শিক্ষা-দান। এইরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর কোথায়ও কখনও ছিল কি না, তাহাও জানা যায় নাই। কেবল কিছুদিনের জন্য ছিল নরম্যান-বিজয়ের পর নিপীড়িত ইংলণ্ড দেশে। কিন্তু ইংরেজ জাতি প্রকৃতি-সুলভ অমোঘতায় শীঘ্রই নরম্যানকে আত্মসাৎ করিয়া নিজের শিক্ষা স্বাভাবিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিল। এদেশে কত দিনে এই শুভ ঘটনা সংঘটিত হইবে?

আমাদের শিক্ষার্থীদিগকে cram-কারী বলিয়া বিদ্রূপ করা হয়। তারা মুখস্থ করিয়া পাশ করে; বস্তু শিখে না বাক্য শিখে, ভাব শিখে না ভাষা শিখে; তারা গতানুগতিক—তাহাদের মৌলিকতা নাই, স্বাধীন চিন্তা, আত্মনির্ভর নাই, গবেষণার প্রবৃত্তি নাই। তাহারা কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে, বাস্তনিষেবন করে। তাহারা নিজের পথ কাটিয়া লইতে পারে না, জাতীয় জীবনের প্রদীপ্ত হোমানলে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সুবিধা আহুতি দিতে পারে না। সমস্তই স্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ইহার জন্য তাহারা দায়ী, না তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী দায়ী? আমার স্মরণ আছে, যখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বারে উপনীত হইবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলাম, তখন ইংরাজী ভাষায় ইতিহাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার জন্য কি গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে পরাভূত হইয়া কিরূপে key ও catechismএর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অথচ যাদের 'ভাল ছেলে' বলে, মেধাবী পরিশ্রমী তীক্ষ্ণবুদ্ধি সচ্চরিত্র আমি তাহাদের একজন ছিলাম। অবশ্য আমার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনাদের একথা বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আমার যে বর্ত্তমান আমি, সেটা পুরাতন আমির ধ্বংসাবশেষ মাত্র—এ আমি পরীক্ষা-ঘানির ঘর্ষণ-নিষ্পিষ্ট নিঃসার জীব। কিন্তু চিরদিন এমন ছিলাম না! তবে জানেন ত'—পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার।

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—নিজেরা ছাত্র দশায় যে সকল মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলাম, এখন শিশু পুত্রদের মধ্যে তাহার পুনরভিনয় দেখিতেছি। আমার একটী নয় বৎসরের পুত্র আছে। সে সখ করিয়া বিনা সাহায্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পড়ে। অবাধে পড়িয়া যায়, নিঃশেষ না করিয়া নিরস্ত হয় না। কিন্তু দেখিতে পাই ইংরাজি পড়িতে হইলে তাহার হৃৎকম্প হয়। দুই বৎসরের বিবিধ চেষ্টাতেও সে এখনও first book সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিল না। শিক্ষা এ দেশে কত সুখের কত আনন্দের প্রস্রবণ হইতে পারিত, যদি না বিদেশী ভাষা-শিক্ষার বিকট ছায়া শিক্ষাঙ্গনে নিপতিত হইয়া শিশুদের হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার করিত। বাঙ্গালি জাতি নাকি অজেয় অমর জাতি, তাই এত শিক্ষা সঙ্কটের মধ্যেও বাঙ্গালীর প্রতিভা একেবারে ম্লান হইয়া যায় নাই; এবং তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একেবারে ভোতা হইয়া যায় নাই। এই প্রণালী সত্ত্বেও যে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রাসবিহারী ঘোষ, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনস্বী পুরুষ (বিদেশে যাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ধরিলাম না) আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাতে আশা হয় যে বাঙ্গালীকে কেহই পরাভূত করিতে পারিবে না। সার আশুতোষও গতবারে বলিয়াছিলেন—'সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই একটা সঞ্জীবনী-শক্তি আছে যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না, হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না। তবে এ কথা আমি বলিতে বাধ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে যদি আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিতে হইত, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতেন কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। কিন্তু শ্বেতভুজা শতদলবাসিনী নাকি তাঁহার হৃৎপদ্মে আপনার রক্তচরণ চিহ্নিত করিবেন পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন, সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা অবধি পঁহুছিতে পারিলেন না। ধরণী স্বস্তিশ্বাস মোচন করিলেন, দেবতারা দুন্দুভি নিনাদ করিলেন, দিক্‌বালারা অম্লান পারিজাত-মালা হস্তে লইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, বঙ্গদেশ আর একজন মহাকবির সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হইল। বাস্তবিক ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে যাহারা উপেক্ষিত, অনেক সময়ে তাহাদের মনীষাই দেশকে সুবাস বিতরণ করে। সকলেই জানেন ডব্লিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় এন্‌ট্রেন্‌স পাশ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ ইংরাজীতে ফেল হইয়াছিলেন। সম্প্রতি যে ২৬ বর্ষীয় মান্দ্রাজী যুবক কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিষয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে

প্রথম এফ্., আর, এস্, রূপ জয়-টীকা ললাটে ধারণ করিয়াছেন, তিনি ৬বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় গলাধাক্কা খাইয়া পোর্টইঞ্জিনিয়ার আফিসে কেরাণীগিরি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু দুষ্ট সরস্বতীর এমনই প্রেরণা এবং প্রতিভার এমনই অপ্রতিহত গতি যে, সেই কেরাণী যুবক অপ্রত্যাশিত ভাবে কেম্‌ব্রিজে নীত হইল এবং অনুকূল অবস্থার গুণে তাহার মনীষাপুষ্প বিকসিত হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালাকে যে সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করা উচিত এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে ইহা আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু দেখিয়াছি যে, সকলে এ সম্বন্ধে এক মত নহেন। সেই জন্যই এ বিষয়ে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে হয়। সে যুক্তি তর্ক নিজের কথায় না দিয়া কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে না, তাঁহাদের কথাতেই দিব। প্রথমতঃ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁহার মত যোগ্য কে? তাঁহার উক্তি শুনুন।

"Except in the lowest forms, the different subjects of study have at present, all to be learnt in our schools and colleges in English, and this throws no small burden on our students. English is a very difficult language for a foreigner especially a Bengalee, to learn, because English and Bengali differ so widely, not only in their vocabularies but also in their grammatical structures and idioms And this difficulty is really so great that it not only overtaxes the energy of our students, but also cramps their thought * * . The ignorance of the middle ages was not dispelled and the Revival of learning was not complete until knowledge began to be disseminated through the modern languages. Nor can we expect any revival of learning here until it is imparted not merely in its primary stage, but in the higher stages as well, through the medium of the vernaculars"

অনেক বৎসর হইল বঙ্গদর্শনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—

"যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন, অতি দূরবর্ত্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটী মোটামুটী শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট দশ বৎসর লাগে। ভাষা শিক্ষাটী অথচ কিছুই নহে, ভাষা শিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায় —উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় ব্যয় ও এত পরিশ্রম! তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি?

* * *

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজীতে আঁক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা

দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন? ইংরেজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজী মুখে শিখিতে হয়।"

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচয়িতা Vincent Smith একজন সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার কি অভিমত শ্রবণ করুন :—

"The Indian universities suffer from the want of root. They are merely cuttings,—struck down in an uncongenial, and kept alive with difficulty by the constant watering of a paternal Government.

As a consequence of their extraneous origin is the necessity that all instruction has to be given in the English language. Only Indian teachers can realise what an impediment to real culture is the system of making foreign language the medium of all instruction."

আর একজন সুযোগ্য ব্যক্তির অভিমত শুনুন। ইঁহারও শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ইঁহার নাম Sir Henry Craik.

"We might surely endeavour to link intellectual training which we give most closely to their life and their tradition and to abandon the senseless attempt to turn an oriental into a bad imitation of a western mind. Why should we teach them that education is impossible without acquiring the English language? * * * It is not a triumph for our education—it is, on the contrary, a satire upon it—when we find the sons of leading natives expressly discouraged by their parents from acquiring any knowledge of their vernacular."

কিন্তু বিদেশীর নিকট ধার করা বাণী সংগ্রহ করিতে যাই কেন? আমাদের দেশের জন্য যাঁহারা ভাবেন, দেশকে যাঁহারা চিনেন, যাঁহারা দেশের অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাজন, তাঁহাদের মত ত শুনিলাম। যদি আরও অভিমত সংগ্রহ করিয়া পুঞ্জীকৃত পাহাড় রচনা করা দরকার হয়, তাহাও পারি। কিন্তু তাহাতে বিরত থাকিয়া কেবল আর একটীমাত্র অভিমত উদ্ধৃত করিব। কারণ আমার বিশ্বাস এ অভিমতের পর অন্ততঃ সাহিত্য-সম্মিলনে আর দ্বিমত হইবে না। এ অভিমত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—"বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজী ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তা'রা কোনোমতে এণ্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়—উপরের সিঁড়ী ভাঙ্গিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এমনতর দুর্গতির অনেকগুলি কারণ আছে। একে ত যে ছেলের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, তার পক্ষে ইংরেজী ভাষার মত বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভাল শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজী শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়,—গরীবের ছেলের ত হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়;—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজী বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানেরা এমনতর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে, তারা শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়—কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না, তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য। * * * ভালোমত ইংরেজী শিখিতে পারিল না, এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাঙ্গালা দেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?"

আপত্তি উঠিবে যে, বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক কোথা যে আমরা বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিব? উত্তরে বলিতে চাই যে, প্রবেশিকা ও আই, এ, পরীক্ষায় তোমরা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ইংরেজী কেতাব পড়াও, তাহার সমতুল্য গ্রন্থ বাঙ্গালাতে এখনও প্রচুর আছে। রবীন্দ্রবাবু 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে এই আপত্তির যথেষ্ট খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি শুনুন—

"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চ শিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় উচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই, সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারী করিবে,—কিম্বা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয়, তবে পাতার যোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাঙ্গালায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাঙ্গালার জন্য যোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং

প্রবেশিকা ও এফ, এ পরীক্ষায় যাহাতে ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বাঙ্গালার বাহনে বিতরিত হয় তজ্জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা বোধ হয় আপনাদের অবিদিত নাই। আপনাদের স্মরণ হইতে পারে যে, ১৩০১ বঙ্গাব্দে যখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন, সেই সময় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া এই বিষয়ের উপায় বিধান জন্য একটী কমিটী গঠিত হয়। ঐ কমিটীর আমিও একজন সদস্য ছিলাম। ঐ কমিটী অনেক আলোচনার পর নিম্নলিখিত মন্তব্যদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন :—

1. That the University be moved to adopt a regulation to the effect that at the F.A. Examination and in the A Course of the B. A. Examination where a classical language is taken as the third subject, one paper should be set containing—(i) passages in English for translation into one of the vernaculars of India, recognised by the Senate,—(ii) a subject for original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style.

II. That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics at the Entrance Examination the answer may be given in any of the living languages recognised by the Senate.

কমিটির মন্তব্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পর পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে দত্ত মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"In accordance with the resolution of the Parishad just referred to, I beg, under para. 12 of the Bye-laws relating to the Syndicate, to propose for the consideration of the syndicate the following regulatoin :—

That at the F. A. Examination and at the B. A. Examination in the A course where a classical language is taken as the third subject, paper be set containing (i) passages in English for translation into one of she vernaculars of India recognised by the Senate, (ii) a subject of original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style.

And I beg further to request that the Vice-Chancellor and the Syndicate will be pleased to consider how far under present circum-

stances the second recommendation referred to in the preceding paragraph may be given effect to."

বলা বাহুল্য যে এই উত্তম সফল হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা ঐ সময়ে হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন, দ্বিতীয় প্রস্তাব তাঁহারা বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদের পর মহাপ্রাজ্ঞ সেনেট-মণ্ডলী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী এইরূপ স্থির করেন যে, এফ এ ও বি এর পরীক্ষার্থীদিগকে বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে বিকল্প দেওয়া হউক এবং সুযোগ্য পরীক্ষার্থীদিগকে একখানা করিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হউক। * ইহার কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার জন্য লর্ড কর্জ্জন সম্মার্জ্জনী হস্তে আসরে অবতীর্ণ হন। তিনি যে ইউনিভারসিটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের ১৯০২ সালে প্রকাশিত রিপোর্টের ৯৪-৯৫, প্যারায় দেশীয় ভাষাসমূহের প্রতি কিছু কৃপা-কটাক্ষ দৃষ্ট হইয়াছিল "The vernacular languages should be introdnced in combination with English as a subject for the M. A. Examination. The M. A. Examination in the vernacular should be of such a character as to ensure a thorough scholarly study of the subject. The encouragement of such study by graduates who have completed their general course should be of great advantage for the cultivation and development of vernacular* languages." পুনশ্চ:—We hope that the inclusion of vernacular languages in the M. A, course will give an impetus to their scholarly study, and * * we consider that the establishment of professorships in the vernacular languages is an object to which university funds may properly be devoted. We also think that vernacular composition should be made compulsory in every stage of the M A. course, although there need be no teaching on the subject. Furthe encouragement might be given by the offer of prizes for literary and scientific books of merit in the vernacular languages." ইহার পর ১৯০৪ সালের এক গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ১৩ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে ইংরাজীদ্বারা শিক্ষা দেওয়া অনুচিত এবং ইহাও বলা হয় যে প্রবেশিকা স্কুলের ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা হইতে একেবারে বঞ্চিত করা অনুচিত।

* An optional examination be held in original composition in Bengali and other vernaculars for the F A. and B. A. candidates, proficiency in it entitling candidates to a special certificate. (Minutes of the Calcutta University 1895—96 p. p. 63—64 and 1896—97 p. p. 288—90 & p 38—59.

বিস্ময়ের কথা নহে কি ? এই স্বতঃসিদ্ধ কথাও গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যের দ্বারা প্রচারিত করিতে হইল। আমাদের দেশের অনেকই বিশেষত্ব, কিন্তু বোধ হয় সকলের চেয়ে বিশিষ্ট বিশেষত্ব ইহাই।

ইহার পর প্রধানতঃ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার একটু বিশিষ্ট স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর এক কোণায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন প্রবেশিকা, এফ্.এ, বি-এ পরীক্ষার্থী সকল বাঙ্গালী ছাত্রকে বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়। এবং রচনার নীতি শিখাইবার জন্য models of style রূপে কয়েকখানি পুস্তকের নাম নির্দ্দেশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা কবিতার কোনও বই পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে না। এমন কি বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যও কোন পরীক্ষার বা প্রশ্নপত্রের বিষয় হয় না। এ সম্বন্ধে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। জানি লোহার বাসর ঘরে ছুঁচ হইয়া ঢোকাও শক্ত; কিন্তু ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট নহি। এ যেন বড় মানুষের ভোজের টেবিলে দরিদ্র আত্মীয়ের ধিক্কৃত কষ্টাসন। সেইজন্য আপনাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় 'বাঙ্গালার কথায়' দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, উদ্দেশ্য - সুধু বাঙ্গালা লিখিবার রীতি শিখান হইবে, আর কিছু হইবে না। এ কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষার যে অশেষ সম্পদ্, তাহাতে কি বাঙ্গালী ছাত্রের কোন আবশ্যক নাই ? বাঙ্গালা ভাষার যে অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যের যে একটা অতল প্রাণ আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া কি আমাদের শিক্ষা প্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে ? আমার বাঙ্গালা ভাষা যে রাজরাণী, আপনার গৌরবে সে যে গরবিণী। এই যে তোমরা বল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রবেশ করিয়াছে, মনে রাখিয়ো, তাহার যে নিজস্ব গৌরব, সে গৌরবে তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও নাই, সামান্যা দাসীর মত তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটা কোণায় তাহাকে বসিবার একটু ঠাঁই দিয়াছ মাত্র।"

আমি জানি কেহ কেহ অল্পেই সন্তুষ্ট। তাঁহারা বলেন, "নেই মামার অপেক্ষা কাণা মামা ভাল। অল্পেই তুষ্ট হও বেশীর তৃষা ত্যাগ কর।" একথা কিন্তু এদেশের শিক্ষা দীক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা কখনই অল্পে সন্তুষ্ট নই, অল্পে সন্তুষ্ট হইব না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" আমরা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া এখনও বলি "মারি ত হাতী"। সেইজন্য দেখিতে পাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলন অল্পে তুষ্ট না হইয়া অধিক পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণীতে দেখিলাম, প্রায় সর্ব্ব-সম্মতি-মতে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি গৃহীত হইয়াছিল। "বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ধন্যবাদ জানাইতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিশ্বাস,—বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব আরও প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি আপাততঃ সত্বর অবলম্বন করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা গ্রহণে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে।

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষাবিজ্ঞান এম এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত-ভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সুখের বিষয় এ সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের সকরুণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। বিগত আগষ্ট মাসে সিমলা-শৈলে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষগণের যে সম্মিলন হয়, সেই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে আমাদের বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমস্‌ফোর্ড এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

Lastly I come to the subject of the media of instruction. As you all know the vernaculars and English are both the media of instruction in our schools and it sometimes overlooked to what a large extent the Vernacular figures at the present time as a medium of instruction. But it is certainly worth our while to examine from the educational stand-point what the relative position of these media should be to each other, having in view the one object viz, that the pupil should derive the greatest possible advantage from his schooling. * * * I recognise the value of large and generous ideals in the sphere of education, but we must never forget the need from time to time of examining and making sure of our foundations. And what

more important, what more practical task in this connection could be laid upon you than the duty of devising means whereby students may be enabled to obtain a better grasp of the subjects which they are taught and to complete their secondary course with more competent knowledge than at present ?

বড়লাটের এই সকল বাণীতে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতিকে লইয়া একটী শাখা-সমিতি গঠিত করেন। আমিও ঐ শাখা সমিতির একজন সভ্য আছি। শাখা-সমিতির আলোচ্য বিষয় এই ছিল যে "উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় অথচ বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা যাহাতে রীতিমত হয় এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে বঙ্গভাষা রীতিমত পুষ্টিলাভ করিয়া পরিণামে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা-প্রদানের উপযোগী হইতে পারে, ইহার জন্য আমাদের বর্ত্তমানে কি কর্ত্তব্য ?" শাখা-সমিতি বহু আলোচনার পর যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম :—

(১) শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষার উন্নতি ইংরাজী শিক্ষার বাধাজনক হইতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষা ইংরাজীতে লাভ করা যাইতেছে ও যাইতে পারে, সে সকল শিক্ষা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে—এ আশঙ্কা অমূলক।

(২) কি নিম্ন, কি উচ্চ সকল প্রকার শিক্ষাই যতদূর সাধ্য শিক্ষার্থীর মাতৃ-ভাষাতে দেওয়া উচিত। যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্দেশ করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরেজী সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গ্রন্থের কোন অভাব নাই এবং পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ভাষা-বিভ্রাটেরও আর কোন আশঙ্কা নাই। মধ্য (Intermediate) পরীক্ষাতেও অধিকাংশ বিষয়েরই আবশ্যক গ্রন্থের অভাব নাই। আর যে যে বিষয়ের গ্রন্থের অভাব আছে, তত্তদ্‌বিষয়ের গ্রন্থের অভাব অতি সহজেই পূরণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় এবং সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও বাধা দেখা যায় না যে, বিএ, এম্ এ পরীক্ষার বিষয়ও এক দিন বাঙ্গালা ভাষাতে বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। দুই বৎসর পরে হউক, আর ৫ বৎসর পরে হউক, বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় অধীত হইবে—এই ঘোষণা কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক একবার প্রচারিত হইলে অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে রচিত হইবে।

৩। আর একটি বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা কেবল রচনা শিক্ষার জন্য এক্ষণে পঠিত হয়। সে নিয়মের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য উভয় বিষয়ই পঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই পরীক্ষা হয়, ইহা প্রয়োজনীয়।

৪। এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গ-ভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা বঙ্গভাষায় প্রদানের প্রথা—যাহাতে আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এ সম্পর্কে এই সাহিত্য-সম্মিলনের কিছু কর্ত্তব্য আছে কি না, সমবেত সুধীবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত উপাধি বিতরণ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস্ চ্যান্সলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত Research বা অনুসন্ধান কার্য্য যে বাঙ্গালাতেই হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। সে কথাগুলি আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

With the field of research daily expanding, the question of its vehicle must come to the fore. No country has done real research work on a large scale and with lasting results that has been handicapped by the language difficulty, aswe have been. Though a knowledge of other languages, preferably modern, is essential for research, and though results of research in many subjects, may for the time being have to be published in English, the place of vernaculars regard to many other subjects, must be clearly and at once recognised. We have begun recognition of the vernacular at one end and have done well so far. Unless, however, we recognise and encourage it at the other end, neither it nor research will really thrive. This is a larger bid, in some sense, on behalf of our Vernaculars than has hitherto been made ; but I hope it is not unreasonable, nor untimely.

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আমাদের গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে মহোদয় বিস্ময় মুখে কয়েকটি আশার বাণী শুনাইয়াছেন।

"The first fundamental fact that stares one in the face is that in India all higher education is imparted in a language which is not the student's mother tongue. I am not going to enter into the well worn controversy as to whether University teaching should be in the Vernacular or in English ; so far as that goes, I take things as I find them ; and, assuming that the medium for imparting Western learning must be the English language, I made

early enquiries as to what steps were taken to give the Indian boy a sound working knowledge of the English tongue. The general tenour of the replies which I received to my enquiries was that English is the worst taught subject in our secondary schools. I have found, indeed, a disconcerting consensus of opinion to this effect and I also found this general view endorsed by the Dacca University Committe from whose report I learned that though 'the young undergraduate must be treated as a University student, and not as a school boy, yet he is hardly ripe for a course of true University lectures, nor in many cases is his knowledge of English sufficient to enable him to profit by them."

শুনিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধন জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, আমাদের বিগত সম্মিলনের সভাপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাহার একজন প্রতাপী সভ্য—সেই কমিশন বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কমিশনের সদস্যদিগের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তাঁহাদের শিরে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। আমরা তাঁহাদের আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। কালিদাসের সময়ে আশা-বন্ধ কুসুমসদৃশ সন্তঃপাতী প্রণয়ী হৃদয়কে বিপ্রয়োগে নিরুদ্ধ রাখিত। এখন ইহা দুঃশিক্ষা-পীড়িত সাত কোটী নরনারীর অবসন্ন হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিবে।

শিক্ষালয় ও শিক্ষা-প্রণালী।

কিন্তু শুধু বাংলাকে শিক্ষার বাহন করিলেও চলিবে না—শিক্ষালয়গুলির আব্‌হাওয়া বদ্‌লাইতে হইবে, শিক্ষা-প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে। এখনকার স্কুল-কলেজ নামধেয় বিদ্যাবিপণিগুলিকে বিদ্যামন্দিরে - অন্ততঃ বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে, এবং তাহার অঙ্গনে প্রাচীন ভারতের গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধের মিষ্ট বাতাস প্রবাহিত করিতে হইবে, এবং শান্ত তপোবনের মুক্ত আকাশ বিলম্বিত করিতে হইবে। দেখুন, অশ্রদ্ধার দানে দাতা ও গৃহীতা—উভয়েই পতিত হয়। আমাদের ছাত্রেরা যে ইঁহাদের প্রদত্ত বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তাহার অন্যতম কারণ শিক্ষকের প্রতিকূল ভাব। পূর্ব্বকালে শিক্ষক সেবক ছিলেন—বিদ্যাকে সেবার ভাবে শ্রদ্ধার সহিত সম্ভ্রমের সহিত সংযমের সহিত ভয়ের সহিত দান করিতেন। 'শ্রদ্ধয়া দেয়ং হ্রিয়া দেয়ং ভিয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ং অশ্রদ্ধয়া ন দেয়ম্'। সেইজন্য বিদ্যা বিদিতা হইয়া ছাত্রকে গরীয়ান্ করিত।

আচার্য্যাদ্ধৈব বিদিতা বিদ্যা সাধিষ্ঠং গময়তি

কিন্তু এখন? কদর্য্য দাতা যেমন অবজ্ঞার সহিত ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দেয়, অনেক

স্থলে বিদেশী অধ্যাপক তেমনি অবজ্ঞায় ছাত্রদিগকে বিদ্যার ক্ষুদ বিতরণ করেন। আমরা একজন অধ্যাপকের নিকট পড়িতাম। তিনি প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন—কত বিদ্যা তাঁহার বিখোদরে নিহিত ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু তিনি কোন দিন আমাদের মুখের দিকে তাকান নাই— তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা স্বীয় বুটের উপর সংলগ্ন থাকিত—কদাচিৎ কেতাবের উপর পড়িত—কিন্তু কোন কারণে কোন দিন আমাদের উপর পড়ে নাই। আমরা সে সময়ে রঘুবংশে বাল্মীকির তপোবন হইতে আনীতা সীতার বর্ণনা পড়িতাম—কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা, এবং মনে মনে তাঁহার সহিত আমাদের অধ্যাপকের তুলনা করিতাম। ইনি যদিও 'কষায়-পরিবীত' ছিলেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই 'স্বপদার্পিতচক্ষু' থাকিতেন।

এই শ্রদ্ধার ও অশ্রদ্ধার দান লইয়া একবার দেবলোকে তুমুল কলহ হইয়াছিল। শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধার দান বড়, না পতিতের শ্রদ্ধার দান বড়। উভয় পক্ষের বক্তৃতার পর ভোট লওয়া হইল। দেখা গেল, দুই দিকের ভোট-সংখ্যা সমান। তখন দেবলোকের সভাপতি প্রজাপতি ঠাকুর উঠিয়া বলিলেন, "মা কৃধ্বং বিষমং সমম্"। অসমান জিনিসকে সমান করিও না—কারণ, "শ্রদ্ধাপূতং বদান্যস্য হতমশ্রদ্ধয়েতরৎ।" পতিতের শ্রদ্ধাপূত দান শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধার দেওয়া হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। আমরাও এই কথা বলি। আমরা দিগ্‌গজ পণ্ডিতের অশ্রদ্ধার বিদ্যা-বিতরণ চাই না, অপণ্ডিতের শ্রদ্ধাপূত দানই আমাদের শিরোধার্য্য।

আরও দেখুন, প্রাচীনকালে গুরু চাহিতেন যে, যেমন দিক্‌বিদিক্ হইতে নদনদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ দশ দিক্ হইতে ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহার আশ্রমে মিলিত হউক।

"যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরং
তথা মা ব্রহ্মচারিণঃ ধাতর্ আয়ান্ত সর্ব্বতঃ"

আমরা কিন্তু বিদেশী ভাষার এবং বিকট রেগুলেশনের লৌহময় প্রাচীর রচনা করিয়া শত প্রাকার-বেষ্টনীর মধ্যে বিদ্যা-বধূকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি। যদি কোন দিগ্‌বিজয়ী বীর ঐ সকল আয়সী পুরী ভেদ করিয়া অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সে হয় ত বিদ্যার চকিত চমৎকৃতি কোন দিন প্রত্যক্ষ করিবে।

এদেশে যদি বিদ্যার প্রকৃত আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হয়, এবং সেই সোনার অলঙ্কার রচনা করিয়া বঙ্গবাণীর বর অঙ্গের শোভা-বর্দ্ধন করিতে হয়, তবে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর হাব ভাব আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ইয়ুরোপের বিশেষত্ববর্জ্জিত হীন অনুকৃতি না করিয়া, ইহাকে ভারতীয় বিদ্যা, ভারতীয় ভাব, ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস দর্শন-চর্চ্চার

কেন্দ্রস্থান করিতে হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, আমরা পাশ্চাত্য culture হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত করিব। আমরা য়ুরোপের সাহিত্য, দর্শন, কলা-বিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভূতপরিমাণে শিক্ষা ও গ্রহণ করিব। কিন্তু পূর্ব্বকালে যেমন করিয়া গ্রীক্, হূণ, শক, পহ্লব প্রভৃতিকে আপনাদিগের মধ্যে হজম করিয়াছিলাম, সেইরূপ পাশ্চাত্য বিদ্যা ও জ্ঞানকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিব। তাহারা আমাদের 'ওদন' হইবে, 'উপসেচন' হইবে, তাহারা এখনকার মত আমাদিগকে অভিভূত পরাভূত করিতে পারিবে না। ঐ সকল বিদ্যা ও কলাকে আমাদের ভারতী সরস্বতীর সম্রাজ্ঞী হইতে দিব না, শুদ্ধদাসী করিয়া রাখিব।

এ সম্বন্ধে কয়েক জন অভিজ্ঞ ইংরাজের উক্তি ও উপদেশ আপনাদিগকে শুনাইতে চাই। আপনারা দেখিবেন যে, আমরা যাহা অবাধে উপেক্ষা করি, দূরদৃষ্টিশীল এই সকল বিদেশীয়েরা তাহাকে কি চক্ষে দেখে। প্রথম সার জর্জ্জ বার্ডউড্-এর কথা শুনুন। তিনি অনেক দিন বোম্বাই প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার সহিত সুপরিচিত ছিলেন।

"I hail with delight any symptom of the spontaneous revival of the indigenous and traditional, literary and artistic, and philosophical and religious life of India—India of the Hindus. The first thing to do is to take the whole of your higher education more into your own hands. * * Science is almost the exclusive creation of modern Europe It is to modern Europe, therefore, that you must directly look for your scientific culture, and in the present economic condition of India you cannot have too much pure and applied (technical) scientific instruction in all youı schools, primary, secondary and higher. But for your literary and artistic and your philosophical and religious, in a word, your spiritual culture, you already possess your own the indigenous growth of 4000 years of Aryan supremacy in India ; and you must never surrender it, but to the utmost of your ability and power, strengthen it and extend its influence."

ভূতের মুখেও রামনাম শুনিতে পারা যায়, এই নীতি অবলম্বন করিয়া বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড সিডেনহ্যাম—যিনি সম্প্রতি ইঙ্গ-ভারতীয় সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের বিদেহ-মুক্তির ব্যবস্থা করিতেছেন—তাঁহার একটা উক্তি আপনাদিগকে শুনাইব।—

"We cannot, by education, transform the intellect of an ancient

people or reconstruct their tastes and opinions in exact accordance with foreign models. Even if such proceeding were practicable, it would be eminently undesirable, because a process of artifical conversion, which take no account of inherent genius and aptitude, is more likely to in ure than to elevate a native populat on."

এই উক্তির মধ্যে দুইটা খুব দরকারী শব্দ আছে— "artificial conversion।" আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর যেটা বিশিষ্ট ব্যাধি—বিদ্যা-অজীর্ণ (mental dyspepsia) তাহার নিদান ঐখানে। যন্ত্রসিদ্ধ ভোজন দ্বারা একটা সমগ্র জাতিকে কখনও পীন ও পুষ্ট রাখা যায় না।

আর এক জন অভিজ্ঞ ইংরাজের কথা শুনাইব—ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ। অন্য প্রসঙ্গে ইহার কথা একবার বলিয়াছি, তাঁহার কথাগুলি অতি সারগর্ভ এবং আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কেন দেশের হৃদয়ে শিকড় পাতিয়া সজীব মহীরুহে পরিণত হইতেছে না, তাহার কারণ আমরা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহোদয়ের কথার মধ্যে পাইয়াছি। গাছের ডাল কাটিয়া যদি উষর ভূমিতে প্রোথিত কর, তবে রাজকীয় জলসেক দ্বারাও তাহার কিছু বিকাশ হইবে কি?

"When an Indian student is bidden to study Philosophy he should not be forced to try and accommodate his mind to the unfamiliar forms of European speculation, but should be encouraged to work on the lines laid down by the gre t thinkers of his own country, who may justly claim equality with Plato, Aristotle and Kant.

The lectures and examinations in philosophy for the student of an Indian University should be primarily on Indian Ethics and Metaphysics, the European systems being taught only for the sake of contrast and illustration. So far as I know, the courses prescribed by the Indian Universities are not on these lines. * * * * * * * * * History too, should be treated in the same way, and be approached from the Ea tern, not the Western side. This change also would impose no small strain on the present staff, and require extensive alterations in the prescribed books and in the whole spirit of the teaching. It is usless to ask an Indian University to reform itself, because it does not possess, the power. Some day perhaps, the man in power will arise, who is not hide-bound by the University traditions of his youth, who will perceive that an Indian University deserving of the name must devote itself

to the development of Indian thought and learning, and who will care enough for true higher education to establish *a real University in India."*

আমরা ঐরূপ শক্তিধর মহাপুরুষের আশাপথ চাহিয়া আছি—যাঁহার আগমনে ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং যিনি ভারতবাসীর স্থগিত ভাবধারা এবং স্তম্ভিত চিন্তাস্রোতকে আবার গতিদান করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত উপাধি বিতরণ উপলক্ষে রেক্টর মহোদয় লর্ড রোণাল্ডসে ইউনিভারসিটী কর্ত্তৃক ভারতীয় দর্শনের বয়কট প্রসঙ্গে এরূপ কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, যাহাতে আমাদের হৃদয়ে কিছু আশার সঞ্চার হইয়াছে।

"Now let me touch on only one other feature which caused me some surprise. I have made some attempt when visiting the colleges of Bengal to ascertain which subjects are the most popular with the students. The result of such limited enquiries as I have been able to make seem to show that philosophy takes a high place in general favour. I am not surprised at that, for the genius of India has always lain in the direction of abstract speculation. What did surprise me was to learn that up to the B. A. degree Indian philosophy finds no place in the curriculum. It is Western philosophy only that is taught. And it is only those who proceed with their studies beyond the B. A. degree who receive at the hands of their University a draught from those springs of profound philosophic thought which have welled up in such rich measure from the intellectual soil of their own country. Frankly, that strikes me as a stupendous anomaly. * * * *

For him the study of the systems would surely be a task of love and burning interest—a study of things congenial to his national genius Yet he may leave his own University after taking a course of philosophy as one of his subjects (and indeed if he pursues his studies no further than the B. A. degree will do so) without so much as hearing of these things. That an Indian student should pass through a course of philosophy at an Indian University without even hearing mention of shall I say Sankara, the thinker who perhaps has carried idealism farther than any other thinker of any other age or country or of the subtleties of the Nyaya system which has been handed down through immemorial ages and is today the pride and glory of the Tols of Navadwip does indeed appe-

ar to me to be a profound anomaly. I should have expected to find the deep thought of India, which has sprung from the genius of the people themselves, discussed and taught as the *normal course* in an Indian University; and the speculations and systems of other peoples from other lands introduced to the students at later stage after he has obtained a comprehensive view of the philosophic wisdom of his own country.

লর্ড রোণাল্ডসে যাহাকে stupendous anomaly বলিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বিরাট বেখাপ্পাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপুরুষদের চক্ষে এতদিন পড়ে নাই; একেই বলে চক্ষু থাকিতে অন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রেক্টর মহোদয়ের উক্তিতে উৎসাহিত হইয়া কেহ কেহ আশা করিতেছেন যে, হয় ত এবার একটা কিছু সদুপায় হইবে। এই সকল উক্তি লক্ষ্য করিয়া ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় সেদিন কলিকাতার এক সভায় বলিয়াছিলেন যে, ঐদিন বোধ হয় অদূরবর্ত্তী, যে দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ভাবে ভাবিত হইবে এবং জাতীয় সৌরভে বাসিত হইবে। বিধাতা সে শুভ দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের কয়েকটি কবণীয় আছে। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিগত অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে,—"বঙ্গের যে অশিক্ষিত জনরাশি, তাহাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যতদিন না করিতে পারিব ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" এরূপ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষার বিবাদ মিটাইতে হইবে। আমরা "কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ-নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"— ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এরূপ বাঙ্গালা চাই না "আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম, ফাষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্টন্যাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় "হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল" —এইরূপ ইঙ্গ-বঙ্গীয় ভাষাও আমরা চাই না। এবং "মোরা হলাম পত্তিবাসী, সারাখুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি লেগেচি, নূন না থাক্‌ল নুন চেয়ে আনচি, তেলপলাডা তেলপলাডাই আন্‌লাম, ছেলেডা কান্তি নাগ্‌লো গুড় চেয়ে দেলাম;- বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ থেয়ে মোরা আর ওনাদের খবর থাকিনে।"—সাহিত্যের জন্য এইরূপ গ্রাম্যভাষাও চাই না। আমরা চাই এমন ভাষা, যাহা সাধু হইবে অথচ সরল হইবে, চলিত হইবে অথচ ইতর হইবে না। এই মধ্যপথ অবলম্বন করিলে কিরূপ হয়? এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানে আমাদিগকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ রাখা ভাল। "দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে, অথচ সতা সত্য ইতুরে কথা নয়, যে সকল কথা ভদ্রলোকের কাছে বলিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে।" আর এক জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলেন। "সাহিত্যের ভাষা যেন কথোপকথনের ভাষা হইতে এমন দূরে সড়িয়া না পড়ে যে সাহিত্যের সঙ্গে কথোপকথনের সম্পর্ক লোপ পায়। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে কথোপকথনের ভাষার যত নৈকট্য থাকে, যত ঘনিষ্ঠতা থাকে, ততই ভাল; দুইএর অন্তর যত অধিক হয় ততই মন্দ। বিচ্ছেদ হইলে কেহ কাহারও কোন উপকার করিতে পারে না; একই ভাষা ক্রমে দুইটী পৃথক্ ভাষা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে কেবল যে ভাষার অনিষ্ট তাহা নহে, সমাজেরও বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা হয়।" ইন্দ্রনাথবাবুর শেষ কথাটা মনে রাখিবার কথা। শিক্ষা ও সাহিত্যকে যদি লোকায়ত করিতে হয়, তবে লিখিত ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে একটা পদ্মার প্রবাহ সৃষ্টি করিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাকল্ সাহেব অনেক দিন হইল, আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথার উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—"মহামতি বাকল্ ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণ দেশের শিক্ষাবিস্তার তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণদেশে সর্ব্ববিদ্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে, জার্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক "পণ্ডিতী" ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ 'গণ্ডীর' মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতমস্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে একরূপ একটি অনতিক্রম্য প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিষয়ক সাধারণের বোধগম্য অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও স্থূল মর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের অত্যধিক প্রবল।"

সঙ্গে সঙ্গে টোলের প্রচলিত সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষার মিশ্রণ ও মিলন করিতে হইবে। সংস্কৃতশিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী যে নবীন জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবেন, এবং গরীয়সী বঙ্গবাণীকে তাঁহাদের বিমাতা ভাবিয়া বিমুখ ভাব অবলম্বন করিবেন, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের কথা। আমরা জানি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সেদিনও বঙ্গভাষা যে ভাষাপদের বাচ্য নহে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য নব্য ন্যায়ের

পাঁয়তারা করিয়াছেন। কিন্তু এমন পণ্ডিতও বিরল নহেন, যিনি সংস্কৃত-ভারতীর সহিত মাতৃভাষারও পূজা করেন। আমরা চাই যে, টোলে সংস্কৃত-বিদ্যার্থীকে বাঙ্গালার সাহায্যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছু কিছু পড়ান হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের গদ্য-পদ্যের অমৃতধারায় অভিষিক্ত হন। সংস্কৃতই তাঁহাদের তপস্যার নিধি থাকুক, কিন্তু তাঁহারা যেন দেশমাতৃকার সেবা হইতে একেবারে বঞ্চিত না হন।

পরিভাষা-সঙ্কলন।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে নূতন শব্দ গড়িতে হইবে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্মিলন হইতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে কতক চেষ্টা ও আয়োজন হইয়াছে। সেই আয়োজন এখন সম্পূর্ণ করিবার সময় আসিয়াছে। দর্শনের পরিভাষা-সঙ্কলন সম্বন্ধে আমি বর্দ্ধমান-সম্মিলনে যাহা বলিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে আপনাদের প্রণিধান প্রার্থনা করিতেছি। "যত দিন না বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য-দর্শনের পঠন পাঠন সাধিত হইবে, ততদিন প্রকৃত দার্শনিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সজীব দর্শনচর্চ্চা দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পরিভাষার প্রয়োগ করিবেন। সেই সকলের মধ্যে যাহা যোগ্যতম, তাহাই টিকিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বহু আয়াস ও সময় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত দর্শন-সাহিত্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের সূচী সঙ্কলন করিতে হইবে। ইহা একের সাধ্য নহে, সমবেত চেষ্টা এবং যথেষ্ট সময় ব্যয় ভিন্ন এ কার্য্যে সফলতা হইবে না।"

দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও সেই কথা বক্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, ইংরাজী শিক্ষিতেরা যখন প্রথম বাঙ্গালা লিখিতে সুরু করিলেন, তখন তাঁহারা সংস্কৃত দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, অলঙ্কারে, নীতি-শাস্ত্রে, কলা-শাস্ত্রে যে শব্দসম্পদ্ আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং তাহার সাহায্য না লইয়া মনগড়া কিম্ভূতকিমাকার অনেকগুলি শব্দ রচনা করিলেন। ঐ সকল শব্দ বাঙ্গালীর মুখেও নাই, এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই। এবং ঐ সব কষ্ট-কল্পিত বাক্যই এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিত হইয়াছে। ঘরে টাকা থাকিতে ধার করা যেমন আহাম্মকী, এও সেইরূপ আহাম্মকী—কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার উপায় নাই। এখন আমরা যে সকল পরিভাষা রচনা করিব তৎসম্বন্ধে যেন বাঙ্গালা ভাষার জাতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখি * এবং সংস্কৃত সাহিত্যের খনির মধ্যে সে সকল শব্দ-মণি প্রচ্ছন্ন আছে তাহার সন্ধান লই।

* শ্রীযুত প্রমথনাথ চৌধুরীর রাজসাহীতে পঠিত অভিভাষণ।

যশোলিপ্সা-সংযম।

এখনও দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নূতন আবিষ্কার নূতন গবেষণার ফল ইংরাজী তাষার সাহায্যে বিবৃত ও প্রচারিত করিলে শীঘ্র যশস্বী হওয়া যায়। এই ইংরাজীর দ্বারে যশের লোভ আমাদের সংবরণ করিতে হইবে। দেখুন, আমাদের মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম জীবনে ইংরাজীতে রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল রচনা আজ কোথায়? কোন্ বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। আমাদের যে কিছু প্রতিভা,যাহা কিছু আলোচন, অন্বেষণ, আবিষ্কার, সমস্তই বঙ্গবাণীর চরণ-সরোজে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে। এ সম্বন্ধে গত অধিবেশনে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ বলিয়াছিলেন।—"কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশঃ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে! আমাদের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গলার সম্পত্তি বাঙ্গলার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া ধনের উপচয় করিব, বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না।"

আমরা চাই যে, গীতাঞ্জলির মত, চিত্রার মত, বিষবৃক্ষের মত, আনন্দ-মঠের মত, কাব্য, নাটক বাঙ্গালা হইতে ভাষান্তরিত হইবে। আমরা আরও চাই যে, আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত মনীষিগণ তাঁহাদের মৌলিক চিন্তা, মৌলিক গবেষণা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করিবেন, যেন বিদেশীয়েরা মধুলোলুপ-ভৃঙ্গের মত ঐ সকল অমূল্য বস্তুর আহরণের জন্য বাধ্য হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের তপোবনে সমিৎ-হস্তে উপসন্ন হয়।

উপসংহার।

বাঙ্গালী জাতির এমন দুর্দ্দশার দিন গিয়াছে, যখন বাঙ্গালা দেশনায়কদিগকে বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার দ্রোহ করিতে হইত। আমি এক জনের কথা জানি, যিনি বঙ্গজননীর কৃতী সুসন্তান ছিলেন অথচ ইংরেজমহলে পসারের জন্য তাঁহাকে বলিতে হইত যে, তিনি বাঙ্গালা জানেন না। কি শোচনীয় অবস্থা! অবশ্য যে সকল শাপভ্রষ্ট শ্বেতাঙ্গ বিধাতার ভৌগোলিক ভ্রান্তির ফলে আমাদের এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—

আমরা বাংলা গিয়াছি ভুলি, আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা, আর মুটেদের ডাকি কুলি—

যাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ অনেক দিন হইল বলিয়া গিয়াছেন, I read English, write English, talk English, speechify in English think in English, I dream in English,—বিধাতার আজব সৃষ্টি সেই সকল অদ্ভুত জীব দেশ হইতে বিলুপ্ত না হইলেও বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে যত্ন করা সময়ের অপব্যয়। কিন্তু আমরা—যাহারা বঙ্গবাণীর চিহ্নিত সেবক, আমরাও কি তাঁহার ভাবে মস্‌গুল, বিভোর হইতে পারিয়াছি? আমরা কি তাঁহার সেবায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারিয়াছি। এক কথায়, আমরা কি তাঁহাকে পরায়ণ করিতে পারিয়াছি? এখনও আমাদের সাহিত্য হইতে বিলাতীর বোটকা গন্ধ গেল না। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের এক জন লেখক তাঁহার সহযোগীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ভাব ইংরাজীতে উদয় হয়, তত দিন যেন কেহ বাঙ্গালা লিখিতে না বসেন। বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যেন বাঙ্গালার ভাষা শিক্ষা করা হয়। এই অনুরোধ কি আমরা পালন করিয়াছি? পালন না করার ফল কিরূপ হইয়াছে? অনেক স্থলে বাঙ্গালার অর্থ করিতে হইলে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া তবে বুঝিতে হয়। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা মূঢ়ের মত মূক থাকিয়া অগত্যা অবশেষে লেখকের জয় জয়কার করেন। * এইরূপ অঘটন-ঘটন সম্পাদন করিয়া আমরা কখনই একটা বিশ্ববিজয়ী সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিব না। অথচ ঐরূপ সাহিত্য আমাদের গড়িয়া তুলিতেই হইবে নতুবা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সমস্ত উদ্যম পণ্ড হইবে এবং আমাদের ভাষার নিয়তি ব্যর্থ হইবে। তাহা আমরা কখনই হইতে দিব না।

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আমরা ইংরাজী অথবা হিন্দী কিংবা হয় ত উভয়েরই ব্যবহার করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও আমরা বাঙ্গলারই শরণাপন্ন হইব। ইংরাজী অথবা হিন্দী রাষ্ট্রীয় ভাষা হয় হউক, কিন্তু আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাব অভাব, অনুসন্ধান, আবিষ্কার, আলোচনা, আন্দোলন, সমস্তই বাঙ্গালাতে প্রচার করিব। আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, উপকথা—সমস্তই বাঙ্গালাতে প্রকাশ করিব। যে ভাষার উৎপত্তি সরিদ্বরা গঙ্গার ন্যায় উত্তুঙ্গ, যাহার প্রবাহ যমুনার ন্যায় নির্ম্মল, যে ভাষায় চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে ভাষায় চৈতন্যদেব ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, যে ভাষায় কৃত্তিবাস কাশীদাস রামায়ণ মহাভারত রচনা করিয়াছেন, মুকুন্দরাম, ঘনরাম যে ভাষার পল্লীকবি, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কান্তকবি যাহার ধর্ম্ম-সঙ্গীত-রচয়িতা; যে ভাষার অবসাদ সময়েও ভারতচন্দ্রের মত কবি, দাশুরায়ের মত পাঁচালীকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যে ভাষায় মধুসূদন কম্বুনাদে মেঘনাদ শুনাইয়াছেন, হেমচন্দ্র

* ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার।

উদাত্তস্বরে বৃত্রসংহার গাহিয়াছেন, নবীনচন্দ্র রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া কৃষ্ণলীলা ধ্যান করিয়াছেন; যে ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আছে, রমেশ-চন্দ্রের 'শতবর্ষ' আছে, যে ভাষায় দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ-প্রসাদ নাট্যকবি; যে ভাষার রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার গদ্যকর্ত্তা; কালী-প্রসন্ন,চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র গদ্যলেখক, যে ভাষায় হরপ্রসাদ, রজনীকান্ত, অক্ষয়কুমার, নগেন্দ্র-নাথ, দীনেশচন্দ্র ইতিহাস-রচয়িতা, যে ভাষায় কালীবর, দ্বিজেন্দ্রলাল, চন্দ্রকান্ত দর্শন রচনা করিয়াছেন, যে ভাষায় দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, শিশিরকুমার,বিজয়কৃষ্ণ,বিবেকা-নন্দ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অজেয় ও অমোঘ লেখনী চালনা করিয়াছেন—সেই ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। এমন মায়ের গৌরবে আমরা কে না গৌরবিত, এমন মায়ের মহিমায় আমরা কে না মহীয়ান্? যারা এমন মায়ের সন্তান, তারা অজর, অমর, অক্ষর, তারা মৃত্যুঞ্জয়, তারা বিশ্বজয়ী। এমন মায়ের সেবায় কে না আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারে?

আসুন, আমাদের আরাধ্যা, হৃদয়ের রাণী, বঙ্গবাণীর জয়ধ্বনি করিয়া জীবন সার্থক করি—জয় বঙ্গবাণীর জয়!!

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সুতরাং মনুস্মৃতির সিদ্ধান্ত অধিকাংশ পরস্পর বিরোধপূর্ণ। কিছু কিছু বিরোধপূর্ণ সিদ্ধান্তের উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সর্ব্বেষাং তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

মনু ১ম অঃ ২১।

ইহাতে বেদ শব্দ হইতে সমস্ত নাম ও কর্ম্মের সৃষ্টি বলা হইয়াছে। আবার পরে

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু এয়ম্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞ সিদ্ধার্থ মৃগ্যজুঃ সামলক্ষণম্॥

ইহাতে অগ্নি বায়ু ও রবি হইতে বেদের সৃষ্টি লিখিত হইয়াছে। হয়ত অগ্নি বায়ু রবির নাম ও কর্ম্ম বেদ বাহ্য। যেহেতু ইহারা বেদের পূর্ব্বে ছিলেন। যদি বা বেদ হইতেই অগ্নি, বায়ু, ও রবির নাম কর্ম্ম সৃষ্টি হইয়াছে তবে ইহারা বেদের পরে উদ্ভূত। ইহাদের দ্বারা বেদ সৃষ্টি হইতে পারে না।

লোকানাস্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহু রূপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

ইহাতে ব্রহ্মার মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। আবার পরে—

দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেণ পুরুষোভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাংসবিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥
তপস্তপ্ত্বা সৃজদ্যাংস্তু স স্বয়ং পুরুষোবিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য দৃষ্টারং দ্বিজসত্তমঃ॥

মনু ১।৩১।৩২।৩৩

ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মা স্বদেহকে দ্বি-ভাগ করিয়া অর্দ্ধ দেহে পুরুষ ও অর্দ্ধ দেহে নারী হইলেন ও সেই নারীতে বিরাট্‌কে উৎপন্ন করিলেন। আর সেই বিরাট্ তপ করিয়া সমস্ত জগতের স্রষ্টা যে "আমি" তাহাকে উৎপন্ন করিলেন।

এখন বিচার্য্য এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিটী বর্ণ যখন পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছে, তখন মনু সর্ব্বজগতের স্রষ্টা কিরূপে হইলেন? যদি কেহ বলেন যে মনুষ্য-সৃষ্টির কর্ত্তাই মনু, মনুর পূর্ব্বে মনুষ্য ছিল না; তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারা কি পূর্ব্বে মানুষ ছিলেন না? যদি তাহাই হয় তবে এখন

ইহারা মানুষ হইল কি করিয়া? আর এই চাতুর্ব্বর্ণ পূর্ব্বে অমানুষ হইয়াও যদি বর্ত্তমানে মানুষ হইয়াছেন, তবে উন্নতি ক্রমে না অবনতি ক্রমে? আর একটি সংশয় এই যে, চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টির পরে যখন ব্রহ্মা স্ত্রী-পুরুষরূপে রূপান্তরিত হইলেন, তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বের চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি কিমাকার ছিল? পুরুষ না নারী? না উভয় ভিন্ন?

ইদং শাস্ত্রং তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবৎ গ্রাহয়ামাস মরিচ্যাদিন্‌স্তহং মুনিন্‌।

মনু ১।৫৮

ইহাতে মনু বলিতেছেন যে ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে (মনুস্মৃতি) নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে বিধিবৎ পড়াইলেন। পরে আমি মরিচাদি মুনিগণকে পড়াইলাম। কিন্তু বর্ত্তমান স্মৃতিতে এইরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে ইহার নির্ম্মাণকাল অতি অর্ব্বাচীন কাল বোধ হয়।

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তা ধময়োনিজা সারঙ্গী মন্দপালেন।

মনু ৯।২৩

অর্থ—অক্ষমালা বশিষ্ঠের সহিত ও সারঙ্গী মন্দপালের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিল।

পৃথোরপীমাম্‌ পৃথিবীম্‌ ভার্য্যাম্‌ পূর্ব্ব বিদোবিদুঃ।

মনু ৯।৪৪

পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা এই পৃথিবীকে পৃথু রাজার ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করেন।

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মোবিগর্হিতঃ।
মনুষ্যানামপি প্রোক্তো বেনে রাজ্যম প্রশাসতি।
স মহীমখিলামভুঞ্জন্‌ রাজর্ষি প্রবরঃ পুরা
বর্ণানাং সঙ্করং চেক্রে কামোপহতচেতন।

মনু ৯।৬৬।৬৭

বিধবা স্ত্রীকে অন্য পুরুষে নিয়োগ করা পশুধর্ম্ম। এই পশু ধর্ম্মকে পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা নিন্দা করিয়া থাকেন। পুরাকালে বেন রাজার সময়ে এই পশুধর্ম্ম মনুষ্যদিগের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছিল। সেই রাজর্ষি-প্রবর সমস্ত পৃথিবীকে ভোগকরতঃ বর্ণের সঙ্কর করিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহার চিত্ত কামোপহত ছিল।

অজিগর্ত্তঃ সুতং হন্তুমুপাসর্পৎ বুভুক্ষিত।

অর্থ—বুভুক্ষিত অজিগর্ত্ত আপনার পুত্রকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

শ্বমাংসমিচ্ছন্না তোর্ত্তুং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ।
প্রাণাণাং পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্‌॥

অর্থ—ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচক্ষণ বামদেব ঋষি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, প্রাণরক্ষার জন্য কুক্কুরের মাংস খাইতে ইচ্ছা করিয়াও দোষে লিপ্ত হন নাই।

ভরদ্বাজঃ ক্ষুধার্ত্তস্তু সপুত্রো বিজনে বনে।
বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃধোস্তক্ষো মহাতপা॥

অর্থ—ভরদ্বাজ ঋষি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পুত্রের সহিত বিজন বনে বাসকরতঃ বৃধু নামা তক্ষার কতকগুলি গাভী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্ষুধার্ত্তশ্চাত্তুমভ্যাগাৎ বিশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘনীং।
চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ॥

অর্থ—ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণ বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চণ্ডালের হস্ত হইতে কুক্কুরেব জানুদেশ লইয়া খাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

এই সকল উল্লিখিত বচন দ্বারায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই "মনুস্মৃতি" সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই। কারণ ইহাতে অক্ষমালা ও বশিষ্ঠের বিবাহ, সারঙ্গী ও মন্দপালের বিবাহ, পৃথু রাজার কথা, বেন রাজার কথা, অজিগর্ত্ত ভরদ্বাজ, বামদেব ও বিশ্বামিত্রের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহাদের আবির্ভাবের পরে গ্রন্থ রচনা না হইলে এই সকল ইতিহাস কিরূপে উদ্ধৃত করা হইল? এইরূপ অনেক পরস্পর বিরোধভাব-পূর্ণ সিদ্ধান্ত মনুস্মৃতিতে দেখা যায়।

আর দেখুন—

দশসূনা সমং চক্রম্ দশচক্রসমোধ্বজঃ।
দশধ্বজ সমো বেশো দশবেশসমোনৃপঃ॥
দশ সূনা সহস্রানি যোবাতয়তি সৌনিকঃ।
তেন তুল্যঃ স্মৃতো রাজা ঘোরস্তস্য প্রতিগ্রহ॥

জীবহিংসা করিয়া যে জীবিকা করা হয় তাহার নাম সূনা। দশসূনার সমান একটি চক্র অর্থাৎ তেলি। ও দশ তেলির সমান একটি ধ্বজ অর্থাৎ মদ্যবিক্রয়ী। দশ ধ্বজের সমান একটি বেশ। আর দশ বেশের সমান একটি রাজা। ইহাতে দশ গুণ দশ গুণ করিয়া পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অর্থাৎ দশ হিংসা তুল্য চক্র। শত হিংসাব তুল্য ধ্বজ। সহস্র হিংসার তুল্য বেশ। আর দশ সহস্র হিংসার তুল্য রাজা। ইহার উদ্দেশ্য এই যে প্রতিদিন দশ সহস্র জীব হিংসা করিয়া যে সৌনিক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহার প্রতিগ্রহ গ্রহণে যে পাপ হয়, রাজার প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিলেও তদ্রূপ পাপ হয়। ইহাতে রাজ-প্রতিগ্রহ নিতান্ত পাপ কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আবার অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে রাজার নিকটে ধন-গ্রহণের বিধান করা হইয়াছে।

রাজতো ধনমন্বিচ্ছেৎ সংসিদন্ স্নাতকঃ ক্ষুধা।

স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুধাতে পীড়িত হইয়া রাজার নিকটে ধন যাচ্ঞা করেন, এমন কি মনু-স্মৃতিতে যুক্তিবিরুদ্ধ অনেক কথাও দেখা যায়।

যন্তুং কর্ম্মণি যস্মিন্ স্যযুঙ্ক্ত প্রথমম্ প্রভু।
সত্যদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥

মনু ১।২৮

অর্থ—প্রভু প্রথম সৃষ্টি সময়ে যাহাকে যে কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন, সে বারংবার সৃষ্টি-তেও সৃষ্ট হইয়া সেই কর্ম্মকে ধারণ করিয়া থাকে। কি যুক্তিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত! যদি শ্রীভগবান্ কিংবা ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভেই জীবগণের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব বিধান করিয়া-ছেন, এবং সেই সেই স্বভাব যদি বারংবার তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে জীবের পাপপুণ্য কেন; এবং বিধাতা যাহা বিধান করিয়া দিয়াছেন, তাহা মিটাইবার ক্ষুদ্র জীবের কি শক্তি? তাহা হইলে সমস্ত সাধন ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বৃথা!

এইরূপ অনেক পরস্পর বিরুদ্ধভাব-পূর্ণ সিদ্ধান্ত ও অযৌক্তিক বিষয় সন্নিবেশিত থাকায় এরূপ অনুমিত হয় যে, এই মনুসংহিতা সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মার নির্ম্মিত আদি শাস্ত্র নহে।

মনু স্মৃতির টীকাকার মেধাতিথিও এই মতের পোষণ করেন।

মনুর্বহুভির্বহুঃ শাখাধ্যায়িভিঃ শিষ্যৈরন্যৈশ্চ শ্রোত্রিয়ৈঃ।
সঙ্গতস্তেভ্যঃ শাখাঃ শ্রুত্বা গ্রন্থং চকারতাশ্চ।
মূলত্বেন প্রদর্শ্য গ্রন্থং প্রমাণীকৃতবান্।

মেধাতিথি টীকা মনু ২।৬

অর্থ—মনু বহু শাখাধ্যায়ী বহু শিষ্যগণ ও অন্য শ্রোত্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের নিকটে বেদের শাখা সকল শ্রবণ করিয়া, এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন; ও সেই সকল মূল শাখা দেখাইয়া তাৎকালিক সমাজে এই গ্রন্থকে প্রমাণিত করিলেন।

আমরা যে সমস্ত বর্ত্তমান মনুস্মৃতির পূর্ব্বাপর বিরোধ দেখাইয়াছি, তাহার কারণ এইরূপ অনুমিত হয় যে, বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পণ্ডিতগণ মনুস্মৃতির নামে সংগীত বচন সকল সংগ্রহ করেন; ও পরে তাহা প্রকরণে প্রকরণে সন্নিবেশিত করা হয়। কিন্তু পরিহার-পূর্ব্বক সংশোধন করা হয় নাই।

যো যস্য মাংসমশ্নাতি সতন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদঃ তস্মাৎ মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।

মনু ৫।১৬

অর্থ—যে যাহার মাংসাদ খায়, সে তাহার মাংসাদ হয়। যে মৎস্য খায় সে সর্ব্ব মাংসাদ হয়। এই জন্যই প্রবাদ আছে "মৎস্যানি সর্ব্বভক্ষাণি", সেই জন্য মৎস্যকে

বর্জ্জন করিবে। এ স্থানে মৎস্য-ভক্ষণের প্রবল নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে ২০৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ধান, মৎস্য, পয়, মাংস, শাক যে কেহ দিবে তাহারই নিকট লইবে। নিষেধ করিবে না।

ধানান্ মৎস্যান্ পয়ো মাংসং শাকং চৈব ন নির্নুদেৎ।

ইহাতে মৎস্যকে জগন্নাথের প্রসাদের মতন সকলের কাছেই লইতে বলা হইয়াছে।

স্বসুতায়াশ্চ যো ভুংক্তে সভুংক্তে পৃথিবীমলং।

ইহাতে কন্যার ধন গ্রহণ করা একান্ত নিষিদ্ধ। আবার

মাতামহমাতুলঞ্চ স্বস্রিয়ং শ্বশুরং গুরুং।
দৌহিত্রং বিটপতিং বন্ধুমৃত্বিগ্যার্জ্যোচ ভোজয়েৎ॥

মনু ৩।১৪৮

ইহাতে মাতামহ ও শ্বশুরকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান বিধান করা হইয়াছে। বলিতে পারা যায় না যে, মাতামহ ও শ্বশুর কন্যার অন্ন ভিন্ন দৌহিত্র বা জামাতার কি খাইবে? এইরূপ অনেক বিরোধ মনুস্মৃতিতে দেখা যায়। সে সকলের উল্লেখ করিলে আর এক খানি মনুস্মৃতির সমান গ্রন্থ হয়, সুতরাং দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল।

সম্প্রতি বেদ হইতে যে সমস্ত বিরোধ উঠিয়াছে, তাহা দেখান হইবে।

অপএব সসর্জ্জাদৌ।

মনু ১।৮

ইহাতে ১ম জলের সৃষ্টি লেখা হইয়াছে। কিন্তু বেদে

আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ।
বায়োস্তেজঃ তেজস আপ।

ইহাতে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ ও তেজ হইতে জলের সৃষ্টি লিখিত হইয়াছে। ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত।

অগ্নিবায়ু-রবিভ্যস্ত এয়ং ব্রহ্ম সনাতনং
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্যজুঃ শামলক্ষণং।

মনু ১।২৩

ইহাতে অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য হইতে বেদের সৃষ্টি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বেদে

যোবৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবে বেদাংশ্চ প্রহি নোভি তস্মৈ

অর্থ- যে পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে বিধান করে ও যে ব্রহ্মাকে বেদ প্রেরণা করে, ইহাতে শ্রীভগবান্ হইতে বেদের সৃষ্টি লিখিত হইয়াছে।

বেদে লিখিত আছে যে, বশিষ্ঠ শাক্ত্যঃ অর্থাৎ শক্তির পুত্র ও ভৃগুরৈ বারুণিঃ। ভৃগুকে বরুণের পুত্র লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মনুস্মৃতিতে প্রথম অধ্যায় ৩৫শ শ্লোকে মনু বশিষ্ঠকে ও বরুণকে নিজ পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহাও বেদবিরুদ্ধ।

নো হ্যনা হিতাগ্নের্ব্রতচর্য্যাস্তি মানবোহ্যেবৈষ
তাবৎ ভবতী যাবদনা হিতাগ্নি তস্মাদপি
কামমেব নক্তমশ্নীয়াৎ।

যজুর্ব্বেদ শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।৪।২

অর্থ—অনাহিতাগ্নি পুরুষের ব্রতচর্য্যা নাই। যেহেতু যে পর্য্যন্ত অগ্নি আধান করা হয় না, সে পর্য্যন্ত সে মানুষই থাকে। অতঃ রাত্রিতেও যথা কাম ভোজন করিতে পারে। কিন্তু মনু ইহার ঠিক বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন যে, অহিতাগ্নির ব্রত নাই।

ঋণাণি ত্রিণ্যপা কৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ

মনু ৬।৩৫

অর্থ—তিন ঋণ নির্বৃত্ত করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে। স্মৃতিশাস্ত্রে তিনটি ঋণের কথা লেখা আছে। ইহা বেদবিরুদ্ধ। যেহেতু বেদে চারিটি ঋণের কথা বলা হইয়াছে।

ঋণম্ ইবে জায়তে যোস্তি সজায় মাস।
এব দেবেভ্যঃ ঋষিভ্যঃ পিতৃভ্যঃ মনুষ্যেভ্যঃ।

অর্থ—যে কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার চারিটি ঋণ হয়। দেবগণের একটি, ঋষিগণের একটি, পিতৃগণের একটি, মনুষ্যগণের একটি।

মনো হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয় সুতাঃ।
তেষামৃষীণাং সর্ব্বেষাম্ পুত্রাপিতৃগণা স্মৃতাঃ॥
বিরাটসুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাম্ পিতরঃ স্মৃতা।
অগ্নিষাত্তাশ্চ দেবানাম্ মরীচালোকবিশ্রোতাঃ।
দৈত্যামানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
সর্পাণাং কিন্নরানাঞ্চ স্মৃতাঃ বর্হিষদোত্রিজা।

মনু ৩।১৯৪।১৯৫।১৯৬

হিরণ্যগর্ভের পুত্র মনুর, যে মরীচ্যাদি ঋষিগণ পুত্র সকল আছেন, তাঁহাদের যে পুত্র তাহারই পিতৃগণ। বিরাটের পুত্র যে সোমসদ সাধ্যগণের 'পিতর'। আর মরীচির পুত্র, অগ্নিষাত্ত দেবগণের "পিতৃ"। আর অত্রির পুত্র বর্হিষদ, দৈত্য দানব দক্ষ যক্ষ গন্ধর্ব্ব উরগ রাক্ষস সুপর্ণ ও কিন্নরগণের 'পিতৃপুরুষ'। ইহাতে সোমসদ, অগ্নিষত্ত ও বর্হিষদ, পিতৃগণকে এক একটি ভিন্ন জাতির পিতৃপুরুষ বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইহা বেদ বিরুদ্ধ। বেদে ত্রিবিধ কর্ম্মকর্ত্তা মনুষ্যগণকেই এই ত্রিবিধ পিতৃরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। যাহারা সোম যজ্ঞ দ্বারা যাজন করেন, তাহারা মৃত্যুর পরে 'সোমসদ' বা সোমবন্ত বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। যাহারা পক্ব অন্নাদি দান করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পরে 'বর্হিষদ' নামে অভিহিত হন। আর যাহারা সোমযজ্ঞ করেন নাই ও পক্ব অন্নাদি দানও করেন নাই, কেবল জীবনের শেষে অগ্নি, দাহকত্বতঃ যাহাদিগকে আস্বাদন করে, তাহারা 'অগ্নিষাত্ত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তদ্যে সোমে নেজানাঃ তে পিতরঃ সোমবন্তোথ
যে দত্তেন পক্কেন লোকং জয়ন্তি তে পিতর বর্হিষদোথ
যে ততো নাভ্যতরর্চ্চন যামাগ্নিরেব দহন্
স্বদয়তি তে পিতরোগ্নিষাত্তা এত উক্তে যে পিতরঃ।

যজুর্ব্বেদ শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৬।৪।৭

কেবল কর্ম্মের অনুসারে মানবসকল মৃত্যুর পরে ত্রিবিধ পিতৃগণ নামে অভিহিত হন। ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। এইরূপ বেদবিরুদ্ধ বিষয় সকল দেখিয়াই বোধ হয় মীমাংসা দর্শন বার্ত্তিক এবং বেদান্তদর্শনসূত্রে স্মৃতিকে বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়। আমরা অন্যান্য দুই চারি পাতা পুঁথি স্মৃতিশাস্ত্রের কথা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করি নাই। কারণ স্মার্ত্তজগতে একটি পরিভাষা প্রচলিত আছে যে

'মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে'

অর্থাৎ মনুস্মৃতির বিরুদ্ধে যে স্মৃতি সকল তাহা………………(অপ্রমাণ) মনুস্মৃতি সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের চূড়ামণি, তাহাই যদি বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়, অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় স্মৃতিসকলের কথা কি ?

মনু স্মৃতির প্রাচীনত্ব ও প্রামাণ্য সম্বন্ধে স্মার্ত্তজগতের আর দুইটি প্রবল যুক্তি আছে। কিন্তু বিচার করিলে সেই দুইটি কিছুই নয় প্রথমটি এই যে, রামায়ণ ও মহাভারতে মনু স্মৃতির বচন সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ও দ্বিতীয়টি এই যে, বেদে মনুস্মৃতির প্রামাণ্য সম্বন্ধে একটি বচন দেখা যায়। প্রথমে প্রথমে যুক্তির আলোচনা করা যাইতেছে।

বাল্মীক রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৮ শ্লোক ৩০।৩১।৩২

শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চরিত্রবৎসলৌ
গৃহীতৌ ধর্ম্ম কুশলৈ স্ত…………তৎ চরিতম্ ময়া
রাজভির্ধৃত দন্তাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ
নির্ম্মলম্ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা।
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা স্তেন পাপাৎপ্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্ত তদবাপ্নোতি কিলবিশম্।

অর্থ—মনুর গীত চরিত্র বৎসল দুইটি শ্লোক আছে। যাহা ধর্ম্মকুশল লোককর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, আমিও তদ্রূপ আচরণ করিয়াছি। মানব সকল পাপকর্ম্ম করিয়া রাজা কর্ত্তৃক ধৃত দণ্ড হইয়া সুকৃতির ন্যায় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাজা যদি তাহাদিগকে শাসন করিয়া দেন কিংবা মুক্তিদান করেন, তাহা হইলেও স্তেন জন পাপ মুক্ত হয়। ও অপরাধীকে শাসন না করিলে সেই পাপ রাজা প্রাপ্ত হন। এই প্রমাণের দ্বারা অনেক লোকে বিশ্বাস করেন যে মনুস্মৃতি রামায়ণের অপেক্ষা প্রাচীন। এইরূপ মহাভারতে শান্তিপর্ব্ব অধ্যায়ে ৫৬তে মনুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মনুনা চৈব রাজেন্দ্র! গীতৌ শ্লোকৌ মহাত্মনা
অদ্ভ্যোগ্নিব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতং
তেষাং সর্ব্ব……তেজঃ স্বাসুয়োনিসু শাম্যতি।

অর্থ—হে রাজেন্দ্র এই দুইটি শ্লোক মহাত্মা মনুগান, জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও পাষাণ হইতে লৌহ উত্থিত হইয়াছে। অগ্নি ক্ষত্রিয় ও লৌহের তেজ সর্ব্বত্র কাজ করিতে পারে কিন্তু ইহারা স্ব কারণে শক্তিশূন্য হয়। অর্থাৎ জলের দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, ব্রহ্মতেজের সম্মুখে ক্ষাত্রতেজ পরাভূত হয় ও পাষাণের উপর আঘাতে লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়। ইহাই মহাভারতে মনুস্মৃতির প্রামাণ্য এবং এতদিরিক্ত

"মনুনা বিহিতং শাস্ত্রং ধর্ম্মাত্মা মনুরব্রবীৎ।"

এইরূপে আরও দুই চারি স্থানে মনুর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বচনের দ্বারা মনুস্মৃতির কোনও প্রামাণ্য হয় না। কারণ প্রাচীনকালে ঋষিগণ ও পণ্ডিতগণ এক একটি শ্লোক রচনা করিতেন ও সেই শ্লোকটি সাধারণ লোকেরা কণ্ঠস্থ রাখিতেন।—অনুমান হয় যে, মহাত্মা মনু এইরূপ অনেকগুলি শ্লোক করিয়াছিলেন। তাহাই সেই সময় সাধারণ লোকেরা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। ইহাতে যে এই বর্ত্তমান মনুস্মৃতি হইতেই এই শ্লোক সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। যে হেতু এইরূপ প্রমাণ প্রাচীন ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন গোস্বামী স্মৃতিরত্ন।
বৃন্দাবন।

অগ্নিমিত্রের ভাঁড়

রাজা দুষ্যন্তের ভাঁড়টি একটু বোকা বোকা, এ কথাটি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু অগ্নিমিত্রের ভাঁড়টি সেরূপ নহে, খুব চালাক, চট্‌পটে; চালবাজ ও হুঁসিয়ার। একটা কথা পড়িলেই তাহা তলাইয়া দেখিতে পারে এবং আপনার কাজ কখন ছাড়ে না। আপনার কাজ অর্থাৎ রাজার কাজের জন্য সে সব করিতে পারে। এক-জনকে আজ রাণী করলে, কাল আবার তাঁকেই পায় ছান্‌লে। ভাঁড়রা সব সময়েই রসিকতা করিবার অর্থাৎ লোককে হাঁসাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু এ বিদূষকটির কথা অনেক সময় খরধার বিদ্রূপে পূর্ণ; লোকের মর্ম্ম স্পর্শ করে। ব্যঙ্গ করা, বিদ্রূপ করা ও সেই সঙ্গে বেশ দু কথা শুনাইয়া দেওয়া, তাহার বেশ আসে কখন বাধে না।

রাণী ধারিনীর এক ভাই আছেন। তিনি জাতিতে রাণীর চেয়ে অনেক ছোট, সে কালে ত চারিবর্ণে বিবাহ ছিল। রাণীর বাপ চারবর্ণের বিবাহ করিয়াছিলেন। রাণীর মার চেয়ে ঐ ভাইটির মা জাতে খাট ছিল, সুতরাং তাঁর ছেলেও জাতে খাট হই-য়াছে। সে ভাইটির নাম বীরসেন। তিনি ভগিনীপতির একজন সেনাপতি। তিনি একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে উদ্ধার করেন এবং মেয়েটি সুন্দরী ও শিল্পকার্য্যে দক্ষ দেখিয়া আপন ভগিনীকে উপহার দেন। রাণীর এক চাকরাণী নাচে ও গানে রাজাকে মুগ্ধ করিয়া রাণী হইয়া বসিয়াছে এবং বড়রাণীর উপর চালবাজী করিতেছে, এটা তাঁহার অসহ্য হইয়াছে। কিন্তু তিনি কিছুই করিয়াও উঠিতে পারিতেছেন না। নূতন মেয়েটি পাইয়া বড়রাণীর আশা হইল যে, সে ত সুন্দরী বটেই, তাহার উপর তাকে যদি নাচ গানে তৈয়ার করিয়া তোলা যায়, রাজা তাহাকে দেখিলেই মেজরাণীকে আপনা আপনি ত্যাগ করিবেন, বড়রাণীর একটি কণ্টক দূর হইবে। তাই তিনি একজন ওস্তাদ রাখিয়া নূতন দাসীটাকে নাচ গান শিখাইতেছেন। কিছুতেই তাহাকে রাজার কাছে যাইতে দেন না এবং যাহাতে রাজা নূতন দাসীর সেবা না পান, সে বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকেন।

কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। একদিন রাণী ছবির ঘরে দাঁড়াইয়া নূতন আঁকা একখানি ছবি দেখিতেছিলেন, এমন সময় রাজা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী আসিয়া রাজার সঙ্গে এক আসনে বসিলেন। রাজার নজর ঐ নূতন ছবিখানির উপর পড়িল। রাজা দেখিলেন, ছবিখানি রাণীর। কিন্তু তাহার সঙ্গে তাহার অনেক দাসী আছেন, আর তাহার মধ্যে রাণীর কাছেই যে বালিকা দাসীটী ছিল, তাহাকে দেখিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অপূর্ব্ব দাসীটি কে?"

রাণী সে কথায় কান দিলেন না। রাজা বারবার জিজ্ঞাসা করায় রাণীর ছোট্টট মেয়ে বসুলক্ষ্মী বলিয়া ফেলিল, "বাবা তুমি ওকে জান না, ও যে মালবিকা।" এই ঘটনার পর রাণী আরও সাবধান হইলেন এবং যাহাতে রাজা কিছুতেই মালবিকাকে দেখিতে না পান, তাহার বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাজাকে বিদূষকের শরণ লইতে হইল। সেও খুব মজবুত। মালবিকাকে রাজার কাছে আনাইবার এক অদ্ভুত উপায় বাহির করিল।

রাণী যে ওস্তাদকে দিয়া মালবিকাকে নাচগান শিখাইতেছিলেন, তাহার নাম গণদাস। বিদূষক গণদাসের কাছে গিয়া বলিল, "দেখ রাজার যে গানের ওস্তাদ আছেন তাহার নাম হরদত্ত। তাহার বড় অভিমান যে, নাচগান শিখাইতে তিনি অদ্বিতীয়; তিনি বলেন কি তা জানেন, যে গণদাস আমার পায়ের ধুলার সঙ্গে সমান নয়।" গণদাস এইকথা শুনিয়া বলিল, "হাঁ হাঁ, জানা আছে, আমায় আর তায় তুলনাই হয় না। সমুদ্রের সঙ্গে কি ডোবার তুলনা হয়।" বিদূষক এ কথাটি হরদত্তের কাছে গিয়া শুনাইয়া দিল। এইরূপে দোলাগাগিরি করিয়া দুইজন ওস্তাদে বেশ ঝগড়া বাধাইয়া দিল। দুজনেই একদিন রাগে গরগর্ করিয়া রাজার কাছে গিয়া নালিশ-বন্দী হইলেন। গণদাস বলিলেন, "হরদত্ত আমায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়াছেন।" হরদত্ত বলিল, "উনিই আগে করিয়াছেন, আমি কেবল জবাব দিয়াছি মাত্র।" দুজনেই বলিলেন, "আপনি আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া, আর আমাদের ওস্তাদী দেখিয়া, একটি বিচার করিয়া দিন।" রাজা বিদূষকের উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া কানে কানে তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। ওস্তাদজীদের বলিলেন, "আমি যদি একা বিচার করি, দেবী বলিতে পারেন পক্ষপাত হইয়াছে, অতএব তাঁহাকেও এখানে আনান হউক্।" এই বলিয়া দেবী ও পণ্ডিত কৌশিকীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। রাণী ঝগড়াটা মিটাইয়া দিবার খুব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সব চেষ্টা বিফল হইল। বিদূষক এমনি কলকাটি খাটাইয়াছে যে, রাণীর কোন মতলবই খাটিল না। তিনি প্রথম পণ্ডিত কৌশিকীকে বলিলেন, "আপনি এ ঝগড়াটা কেমন বুঝেন?" অর্থাৎ পণ্ডিত কৌশিকী বলুন যে, ঝগড়া কখনই ভাল নয়, ওটা থামাইয়া দেওয়াই ভাল। কৌশিকী কিন্তু সে দিক দিয়া গেলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমার পক্ষ যে অসপত্ন হইবে, সে আশঙ্কা নাই। গণদাস খুব ওস্তাদ। এখানে মুখ না পাইয়া রাণী গণদাসকে যত থামাইতে চান, সে তত রাগিয়া উঠে; বলে, আপনি যদি আমার পরীক্ষা দিতে না দেন, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন বলিয়া মনে করিব।" সুতরাং রাণী হার মানিলেন। পণ্ডিত কৌশিকী মধ্যস্থ হইলেন। রাণী বলিলেন, "বেশ হইয়াছে তোমরা দুইজনেই তোমাদের ছাত্রীদের নাচ কৌশিকী ঠাকুরাণীকে দেখাও।" কৌশিকী বলিলেন, "তাও কি হয়,

আপনিও দেখিবেন, রাজাও দেখিবেন, একা কি বিচার হয়।" স্থির হইল,—প্রেক্ষাগৃহে ওস্তাদেরা উদ্যোগ করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইবেন, আর ইঁহারা সকলে গিয়া সেখানে উপস্থিত হইবেন, সেইখানে গণদাসের শিষ্যা মালবিকা প্রথম নাচ দেখাইবেন, কেন না গণদাস বয়সে বড় সুতরাং তাঁহার পরীক্ষাই আগে হওয়া উচিত।

এই যে এতক্ষণ, বিদূষক কি চুপ করিয়া ছিলেন? না, তিনি ব্যঙ্গ করিয়া সকলকেই উস্কাইয়া দিতেছিলেন। রাজা যখন বলিলেন যে, রাণী ধারিণী ও পণ্ডিত কৌশিকীর সমক্ষেই বিচার হইবে, তখন গোতম বিদূষক বলিল, "ঠিক বলিয়াছ অর্থাৎ দেবী আসিয়া দেখুন, কেমন কলে তাঁহাকে ফেলিয়াছি, তাঁহার আর লুকাইবার জোটি নাই।" আবার যখন দেবী ও কৌশিকী আসিতেছিলেন, তখন বিদূষক কৌশিকীকে পীঠমর্দ্দ বলিয়া ঠাট্টা করিতেছিলেন। কামতন্ত্রে যাহারা সহায় হয়, তাহাদের পীঠমর্দ্দ বলে। বিদূষক বোধ হয় মনে করিতেন যে, কৌশিকীর সন্ন্যাসিনীর বেশটা ভণ্ডামী মাত্র। ওটা কেবল তাহার আসল কথাটা ঢাকিবার জন্য। তাই সে তাহাকে এরূপ কড়া ঠাট্টা করিয়া ফেলিল।

রাণী যখন বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, ইহাদের বিবাদটাই আমার ভাল লাগিতেছে না—তখন গণদাস একবার বলিয়া উঠিলেন, "আপনি মনেও করিবেন না যে, আমি হরদত্তের কাছে হারিয়া যাইব।" তখন বিদূষক বলিলেন, "দেবি, আমাদের একটু মেড়ার লড়াই দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, এতদিন বৃথা বেতন দেওয়া হইতেছে, একটু মজা দেখিব না?" দেবী বলিলেন, "তুমি বড় ঝগড়াটে।" গোতম বলিলেন, "এ কথাই নয়; দুটা মত্তহস্তী লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে, এদের একটা না হারিলে একেবারে রক্ষা নাই।" কৌশিকী যখন বলিলেন, "কোন ওস্তাদরা নিজে বেশ কর্ত্তোপ দেখাইতে পারেন, আবার কোনও ওস্তাদ সাকরেদ শিখাইতে দক্ষ বৃহস্পতি। যিনি দুই পারেন তিনিই ত বড় ওস্তাদ কি না?" বিদূষকের বড় স্ফূর্ত্তি, সে বলিল, "শুনিলে ইহার অর্থ, এই হইল যে, সাকরেদের নাচ দেখিয়া ও গান শুনিয়া মীমাংসা হইবে।" দেবী আবার যখন গণদাসকে ধমক দিয়া বলিলেন, "নিরর্থক কাজ লইয়া কেন গোল কর।" তখন গণদাসকে খেপাইবার জন্য বিদূষক বলিলেন, "আর ভাই গণদাস, চাকরী ত পাইয়াছ সরস্বতীর প্রসাদী মোয়াও খাইতেছ। ঝগড়া করিয়া কেন সুস্থ প্রাণ ব্যস্ত কর।"

দেবীর শেষ চেষ্টা—যখন রাজাই কৌশিকীকে মধ্যস্থ হইবার ব্যবস্থা করিলেন, তখন কৌশিকী একলাই সাকরেদদের গান শুনুন। তাহাতে কৌশিকী বলিলেন, "তাও কি হয়, সর্ব্বজ্ঞ হলেও একলার কথায় লোকের আস্থা হয় না।" তখন রাণী বুঝিলেন, এ সন্ন্যাসিনীও ঐদিকে অর্থাৎ রাজা যাহাতে মালবিকাকে দেখিতে পান, সেই দিকে তাঁহারও চেষ্টা; তাই তিনি বিরক্ত হইয়া মুখ বাঁকাইয়া মুখ ফিরাইলেন।

রাজা কৌশিকীকে রাণীর ভাব দেখিবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন। কৌশিকী রাণীর রাগের আসল কথা বুঝিতে পারিয়াও বলিলেন, "রাজার উপর আপনি বিরক্ত হইলেন কেন? এ বিরক্তির ত কোন কারণ নাই।" বিদূষক তখন বলিল, "আছে বই কি? আপনার লোকের মান ত রাখিতে হইবে; ওহে গণদাস, তুমি বাঁচিলে; রাগের ছলে রাণী তোমায় উদ্ধার করিয়া দিলেন।" যখন সব ঠিক হইয়া গেল, তখন বিদূষকই বলিয়া দিল, "তোমরা তুই পক্ষই রঙ্গমঞ্চে গিয়া সব উদ্যোগ করিয়া লও, তারপর আমাদের খবর পাঠাইও, অথবা মৃদঙ্গ শব্দ শুনিলেই আমরা যাইব।" রাজা যখন মৃদঙ্গ শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি যাইতেছেন, তখন বিদূষক তাঁহাকে চুপি চুপি সাবধান করিয়া দিল, বলিল, "আস্তে আস্তে যাও, রাণী কাছে আছেন, একটা গোল বাধাইয়া ফেলিবেন।"

এইখানে বিদূষকের প্রথম কীর্ত্তি শেষ হইল। রাণী অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালবিকাকে রাজার সম্মুখে বাহির করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার কোন কৌশলই খাটিল না। তিনি যেন ইঁদুর কলে পড়িলেন। এ সবই গোতমের চালাকি?

নাচ দেখাইয়াই ত মালবিকা চলিয়া যান, বিদূষকই তাঁহাকে থামাইয়া বলিল, "আমার একটা কথা আছে, উত্তর দিয়া যাও।" থামাইয়া রাজাকে মালবিকার স্থির-মূর্ত্তি দেখাইল। আবার যখন "কি তোমার কথা" জিজ্ঞাসা করা হইল, সে তখন বলিল, "কথাটা আর কিছু নয়, প্রথম নাচটা দেখাইলে তাহার আগে ব্রাহ্মণের পূজাটা করিলে না।" শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, মালবিকাও হাসিল। রাজা মালবিকার হাসিমুখও দেখিলেন। বিদূষক দেখিল, রাজার কাজ হাঁসিল, আর কেন। সে বলিয়া উঠিল, "আহারের কোনও উদ্যোগ হইল না। আমি অবোধ চাতক, শুক্‌না মেঘের কাছে জল চাহিলাম, পাইলাম না। অথবা আমরা মূর্খ লোক, পণ্ডিতের কথাই বিশ্বাস করিয়া যাইতে হয়। তাই যাই, তবে এ বেচারা ত বেশ গেয়েছে একে ত কিছু বকসিস্ দিতে হয়, এই দিই।" বলিয়া রাজার হাতের বালা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। রাণী ভারি চটিয়া গেলেন বলিলেন, "আর একজন পরীক্ষার্থী আছে, তাহার গুণাগুণ না জানিয়াই যে একজনকে বকসিস্ দিতে যাইতেছ।" "তা কি জানেন রাণী, পরের জিনিস কি না, তাই দিতে গিয়াছিলাম।" মালবিকা ত নাচঘর থেকে চলে গেলেন। বিদূষক রাজাকে বলিল "আমার বুদ্ধি-বিদ্যার দৌড় এই পর্য্যন্ত।" "না হে, না, এইখানে শেষ হলে চলিবে কেন? সে যে চলে গেল আমার যে ধৈর্য্য থাকে না—" "তোমার দেখ্‌চি দশা খারাপ, যেমন দরিদ্র রোগী বৈদ্যের কাছে ভাল ঔষধ চায় তোমারও তাই।"

রাজা হরদত্তের সাকরেদের গান শুনিতে যাইতেছেন,—এমন সময়ে বৈতালিকেরা গান ধরিয়া উঠিল, বেলা তুই প্রহর হইয়াছে গান শুনিয়াই বিদূষক বলিয়া উঠিল,

"আর কি আমাদের ভোজন বেলা, অবেলায় খাইলে অনেক অসুখ হয়। সকলে চলিয়া গেলে, রাজা মালবিকার রূপ ও গুণের প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন, "একে ত সুন্দরী তার পর এত গুণ, এ যে দেখ্‌চি শুধু মদনের বাণ নয়, তাতে বিষ-মাখান। যাহোক ভাই, আমার ভাবনাটা ভেবো।" "তুমিও আমার ভাবনাটা ভেবো। আমার পেটটা, দোকানের তুন্দুলের মত ভেতরে ভেতরে পুড়ে যাচ্ছে।"

"তুমি আমার কাজ একটু শীঘ্র কর।"

"সেত বুঝলুম, কিন্তু জ্যোৎস্না যেমন মেঘে ঢাকা পড়ে তেমনি রাণী তাকে ঢেকে রাখবে। আর তুমি কি? তুমি মাংসের দোকানের গিধিনীর মত, এ দিকে মাংসের জন্য মরিতেছে, অপরদিকে ভয়ও খাইতেছ। এখন ভরসা করে কাজে লাগ।"

গোতম ঠাকুরের দ্বিতীয় কীর্ত্তিটী অদ্ভুত। তিনি দেখিলেন, বড় রাণী সুস্থ শরীরে থাকিলে ও সকল জায়গায় যাইতে আসিতে পারিলে, রাজার সঙ্গে মালবিকার মিলন দুষ্কর হইয়া পড়িবে। তাই রাণীকে শয্যাধরা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুবিধাও হইল। বসন্তকাল দোলায় চড়ার ধুম পড়িয়া গেল। আমরা এখন দেখি যে বসন্তে কেবল রাধা আর কৃষ্ণই দোল খান। তখন কিন্তু বসন্তে সকলেই দোল খেত। বড় রাণীও দোল খেতেন। বিদূষক একদিন চালাকী করে বড রাণীকে দোলা থেকে ফেলে দিল; পড়িয়া রাণীর পায়ে ব্যথা লাগিল। তিনি শয্যাধরা হইয়া রহিলেন, বিদূষকের দূতীগিরিতে অনেক সুবিধা হইল।

এখন রাণীর একটা বড় পিয়ারের অশোক গাছ ছিল। মালিনী আসিয়া বলিয়া গেল যে, সেটার ফুল ধরিতে দেরী হইতেছে। তাহার 'দোহদ' করা দরকার। যে কার্য্যের দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র ফল ফুল হয় তাহার নাম দোহদ। সার দেওয়া একটা দোহদ। কিন্তু অশোকের দোহদ আর একরূপ। কোন পরমাসুন্দরী যদি পায়ে আল্‌তা এবং নূপুর দিয়া আর অশোকের কচিপাতা কানে ঢুলাইয়া দিয়া বাঁ পায়ে অশোককে লাথি মারে, তবে তাহার ফুল হয়। মালিনী অশোক গাছে দোহদের কথা বলিলে, রাণী বড় বিপদে পড়িলেন। এ সকল কাজ ত তাঁহারই একচেটিয়া কিন্তু তাঁহার ত পায়ে ব্যথা তিনি ত যাইতে পারিবেন না। কাকে পাঠান যায়? ওস্তাদজীদের ঝগড়ায় মালবিকার জন্যই রাণীর পক্ষ জয়লাভ করিয়াছে, সুতরাং মালবিকাকে কিছু বকশীস দেওয়া চাই। রাণী বলিলেন, "আচ্ছা বেশ মালবিকা, আমার পায় ব্যথা, আমি পারিব না, তুমি যাও অশোকের দোহদ করিয়া আইস। যদি পাঁচদিনের মধ্যে অশোকের ফুল ফোটে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" মালবিকার কি মনোবাঞ্ছা রাণী তাহার কি জানেন না জানেন সে কথায় এখন আমাদের কাজ নাই। আমরা গোতমের কথা কহিতে আসিয়াছি, তাই কহিয়া যাই।

রাজা ত অধীর, দেরী সয় না, গোতমকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, বিদূষকও রাজার ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া আর এক কীর্ত্তি করিয়া বসিল। সে মালবিকার সখী বকুলাবলীকে দূতীগিরিতে লাগাইয়া দিল। তাহাকে খুলিয়া বলিল, "রাজার এই অবস্থা, তুমি মিলাইয়া দাও।" সে বলিল, "দেবী অতি সাবধানে মালবিকাকে লুকাইয়া রাখিতেছেন, ব্যাপার সহজ নহে তথাপি আমি যেরূপে পারি ঘটাইয়া দিব।"

ইরাবতী রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, প্রমোদবনে রাজার সঙ্গে দোলায় চড়িবেন। রাজার যাইবার ইচ্ছা নাই। বিদূষক বলিলেন, "তাও কি হয়, তোমার মনে যাই থাক সকলের মন রাখিয়া চলিতে হইবে।" রাজা প্রমোদবনে চলিলেন। গোতম মূর্খ হইলেও বেশ সমজদার লোক। বসন্তের শোভায় সে উন্মত্ত হইল ও রাজাকে বসন্তের শোভা দেখাইয়া তাঁহার মনের যাহাতে তৃপ্তি হয় করিতে লাগিল। কালিদাসের প্রথমকার লেখার স্বভাবের শোভাই বড়, স্ত্রীলোকের শোভা তাহার কাছে লাগে না, এখানেও তাই। রাজা ও গোতম দুজনেই বসন্তলক্ষ্মীর সহিত যুবতীগণের তুলনা করিতেছেন এবং তুলনায় বসন্ত-শোভাই বাড়িয়া যাইতেছে।

এমন সময়ে বড় রাণীর চেলী পরিয়া, নানা অলঙ্কারভূষিতা হইয়া, মালবিকা আসিয়া সেই অশোক গাছের তলায় একখানা বড় পাথরের উপর বসিল। গোতম বলিল, "মাতালের কাছে মিছরির চাট আসিয়া জুটিল।" রাজা বলিলেন "কি? কি?" গোতম বলিল, "আবার কি? মালবিকা একা, বড় উৎকণ্ঠিতা।" রাজা "কোথায়, কোথায়" "গাছের আড়াল থেকে এই দিকেই আসিতেছে, উহাকেও বোধ হয় তোমার রোগে ধরিয়াছে, 'উৎকণ্ঠিত উৎকণ্ঠিত' বলিতেছে।" রাজা—"ও কিসের উৎকণ্ঠা কে জানে?" গোতম—"দূরে যেন ইরাবতী আসিতেছে।" রাজা—"আসুক, হাতী যখন পদ্মবনে পশে তখন কি হাঙ্গরের ভয় করে?"

এমন সময়ে বকুলাবলী পায়ের গহনা লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বকুলাবলীর সঙ্গে মালবিকার যে কথাবার্ত্তা হইল, রাজা ও গোতম দুজনেই সে কথা শুনিতে পাইলেন। মালবিকা স্বীকার করিল যে, রাজার জন্য সে তাহার মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। বকুলাবলীও বেশ দূতীগিবি করিয়া উহার মনস্থির করিয়া দিল, মালবিকার এক পায়ে আল্‌তা দেওয়া হইল, নূপুর দেওয়া হইল। রাজা গোতমকে বলিলেন, "এ পায়ের লাথী খাবার যোগ্য ব্যক্তি কে কে? হয় অশোক, না হয় আমি।" গোতম জবাব দিল, "অপরাধ হইলেই তোমায়ও প্রহার খাইতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "আহা, ব্রাহ্মণের বাণী কবে সফল হবে?"

আবার যখন বকুলাবলী আল্‌তাপরা পা খানি মালবিকাকে দেখাইয়া বলিল, "এ পা তোমার মনে ধরে?" তখন মালবিকা জিজ্ঞাসা করিল,"এ বিদ্যা তুমি কোথায় শিখিলে?"

সে বলিল, "রাজা এতে আমার গুরু।" তখন গোতম বলিল, "আর কি এখন যাও গুরুদক্ষিণাটা আদায় করিয়া লইয়া আইস।"

অশোক-গাছে লাথী মারা হইলে পর রাজা ও গোতম হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইল। গোতম বলিল, "করলে কি, অশোকটী রাজার প্রিয়বয়স্ত, উহাকে লাথি মারিলে? বকুলাবলী তুই ত সব জানতিস্, তুই কেন এমন অন্যায় কাজটা বন্ধ করিয়া দিলি না?" বকুলাবলী বলিল, "আমরা কি করিব, দেবী হুকুম দিয়াছেন, আর আমরা করিয়াছি। আমাদের কোনই দোষ নাই।"

এই মহাসুখের মিলনের সময়েই যখন রাজা মালবিকাকে বলিতেছেন, "তুমি অশোকের দোহদটা ত পূরণ করিলে, আমার আর ধৈর্য্য নাই, আমার মনোবাঞ্ছাটী পূর্ণ কর।" এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে ইরাবতী তথায় উপস্থিত—মালবিকা ও তাহার সখী ত তখনই চম্পট। রাজা গোতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উপায়।" গোতম বলিল, "যখন চোরকে হাতে হাতে ধরে তখনও সে বলে, আমি সিঁধকাটা অভ্যাস করিতেছি।" রাজা তখন ইরাবতীকে বলিলেন, "তোমার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম। মাঝে মালবিকা এল, ওর সঙ্গে দুটী কথা কহিতেছিলাম।" ইরাবতী মর্ম্মান্তিক দুঃখে কাতর হইয়া বলিল, "এমন দুটী কথা কবেন যদি জানিতাম, আমি এ কাজ করিতাম না।" পাষণ্ড গোতম সে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া বলিল, "তা রাজার ত সকলেই সমান, রাণীর দাসীদের সঙ্গে কথা কহাও কি অপরাধ হইল? এই তোমার ব্যাপার লইয়াই বোঝ না কেন?" অর্থাৎ তুমি ত রাণীর দাসী ছিলে, তোমার সঙ্গেও এইরূপ কথাবার্ত্তা তখন হইত, সেটা কি দোষের হইত? ইরাবতী বলিলেন, "তা হোক না, কথাবার্ত্তাই হোক্। আমি আর কেন ক্লেশ পাই।" এই বলিয়া চলিয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু মদের ঝোঁকে পারিল না, কোমরের চন্দ্রহার গাছটা পায়ে জড়াইতে লাগিল। যাহা হউক ইরাবতীর যখন রাজা পায়ে পড়িলেও মান ভাঙ্গিল না ও সে রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেল, তখন গোতম বলিলেন, "আর কি এখন ওঠ। ইরাবতী তোমার উপর খুব খুসী। এত অপরাধের পর সে যে গেছে, এই আমাদের ভাগ্য; এখন এস আমরা পালাই, নইলে মঙ্গলগ্রহের মত আবার বেঁকে রাশির মধ্যে ঢুকিবে।"

গোতমের চতুর্থ কীর্ত্তি আরও চমৎকার। ইরাবতী গিয়া বড়রাণীর কাছে সব কথা বলে দিল। রাণী মালখানার মালবিকা ও বকুলাবলীকে আটকাইয়া রাখিলেন। সেখানে ত যথেষ্ট পাহারা। তার উপর রাণীর এক দাসী মাধবিকা বেশীর ভাগ সেখানে পাহারা দিতে লাগিল। রাণী তাহাকে বলিয়া দিলেন, "আমার আঙটী না দেখিয়া তাহাদের কাহাকেও ছাড়িবে না।" এই সব কথা শুনিয়া গোতম এক মায়াজাল বিস্তার করিয়া বলিল, "মহারাজ বড়রাণীর অসুখ হইয়াছে, চলুন আমরা দেখিতে যাই। আপনি

আগেই যান, আমি একটু পরেই যাইতেছি। শুধুহাতে ত রাজারাজড়ার সঙ্গে দেখা করিতে নাই, তাই আমি একটা ফল কি ফুল, বাগান থেকে নিয়ে আসি।” রাজা গিয়া বড়রাণীর সঙ্গে আত্মীয়তা আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে গোতম কেয়াপাতার কাঁটা ছুটা বুড়া আঙ্গুলে ফুটাইয়া, বুড়া আঙ্গুলটার গোড়ায় পৈতা জড়াইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। কি ব্যাপার? “রাণীর জন্য একটা ফুল হাতে করে আনিব, তাই এক থোলো অশোকের ফুল তুলিতে গিয়াছিলাম, আর কোটরের ভিতর থেকে একটা সাপ এসে আমায় কামড়াইয়া দিল। সে সাপ নয়, সে সাক্ষাৎ কাল! আমার আর নিস্তার নাই। ভাই আমি ছেলে বেলা থেকে তোমার বয়স্য। আমার থাক্‌বার মধ্যে এক মা আছেন, তুমি ভাই তাঁকে খেতে পর্‌তে দিও।” বলিয়াই বেচারা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল; আশীবিষের বেগে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। রাণী বলিলেন, “আহা আমার জন্য বেচারার এই দশা।” রাজা বলিলেন, “ভয় নাই—ভয় নাই, ধ্রুবসিদ্ধি আছেন, তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি আসিয়া বিষ ঝাড়িয়া দিবেন।” “ওরে কে আছে, ডাক ধ্রুবসিদ্ধিকে?” সে বলিল, “গিয়াছিলাম, ধ্রুবসিদ্ধি আসিল না; বলিল, গোতমকে এইখানে লইয়া আইস।” সুতরাং দুই তিন জনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “ধ্রুবসিদ্ধি বলিলেন,—ব্যাপার কিছু কঠিন। জলের কলসীতে সর্পমুদ্রা দিতে হইবে, অতএব একটি সর্পমুদ্রা খুঁজিয়া আন।” রাণী—“আহা তা! তা হোলেই ব্রাহ্মণ বাঁচে, তা এই নাও সর্পমুদ্রা-ওয়ালা আংটী। ওটা আমার হাতেই ফিরাইয়া দিও।” এই আঙটী পাবার জন্যই গোতমের এত ফাঁদ পাতা। আঙটি পেয়েই সে মালখানায় পঁহুছিল। মাধবিকাকে আঙটী দেখাইল। মাধবিকা ত আঙটী দেখাইলেই মালবিকা ও বকুলবালিকাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। তথাপি সে অনেক জেরা করিল। গোতম বলিল, “রাণী ত আর নিজের ইচ্ছায় এদের আটকান নাই, ইরাবতীর মান রাখিবার জন্যহ এ কাজ। তা এখন একজন গণক বলিয়াছেন যে, রাজার নক্ষত্র বড় খারাপ, এখন সকল বন্দীকেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। তা রাজার হুকুম রাণি কি করিবেন, তাই আঙটী দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।”

যেমন ছাড়া পাওয়া, আর গোতম ওদের দুজনকে সমুদ্রঘরে লইয়া গেল। একটা ছুতা করিয়া রাজাকে রাণীর রোগমন্দির হইতে ডাকিয়া আনিয়া সমুদ্রঘরে পঁহুছাইয়া দিল। সমুদ্রঘরে আসিবার সময় দূরে দেখা গেল, রাণীর চন্দ্রিকা নামে এক দাসী আসিতেছে। রাজা অমনি পাশ কাটাইলেন। গোতম বলিল, “চোর আর কামুক দুজনে চন্দ্রিকার হাত এড়াইতে চেষ্টা করে।” ইহার পর সে নিজে দরজায় পাহারা রহিল। সেখানে স্ফটিকের থামে মাথা দিবামাত্র বেচারার ঘুম আসিল, বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইতে লাগিল।

গোতম ঘুমাইতেছে, এমন সময় ইরাবতী ও নিপুণিকা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রিকা তাহাদের বলিয়া দিয়াছে যে, গোতম ঐখানে আছে। গোতমকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া নিপুণিকা বলিল, "বাজারের বলদের মত গোতম বসেই ঘুমুচ্ছে। মুখখানি বেশ প্রসন্ন, বোধ হয় বিষবিকার একেবারেই নাই।" এমন সময়ে গোতম স্বপ্নে বলিয়া উঠিল, "ভবতি মালবিকে ইবাবতীকে ছাড়াইয়া উঠ।" শুনিয়া তারা তুজনেই চটিয়া গেল। নিপুণিকা বলিল. "দেখুন চিরদিন আপনার স্বস্তিকরণের মোয়াখোর, এখন কি না মালবিকাকে স্বপ্নে দেখিতেছে। আচ্ছা, ওকে জব্দ করুচি। সাপকে ও বড় ভয় করে, তাই বাঁকা লাঠী গাছটা উহার গায়ে ফেলিয়া দিই।" যেমন লাঠী গায়ে ফেলিয়া দেওয়া, আর সে সাপ সাপ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে যে পাহারা দিতেছিল, সে সব বিগড়িয়া গেল; রাজা বাহির হইয়া পড়িলেন, মালবিকা দেখা দিলেন, বকুলাবলী দেখা দিলেন। ইরাবতীর সঙ্গে রাজার বেশ একটু টগুাই হইয়া গেল। ইরাবতী আরও জানিতে পারিলেন যে, বড় রাণীকে ফাঁকি দিয়া গোতমই এ সব যোগাযোগ করিয়াছে। গোতম তখন মালবিকার ভাবনায় অস্থির। মনে করিতেছে, কি সর্ব্বনাশ! বাঁধন কাটাইয়া পায়রা কি না বিড়ালের মুখে পড়িল। এমন সময়ে ইরাবতী বলিল,—"তবে রা বামনা, এসব তোমারই নীতি?" সে বলিল, "আমি যদি নীতির এক বর্ণও পডিতাম, তাহা হইলে রাজাকে আমি চালাইয়া লইয়া বেড়াইতাম।" এমন সময়ে একজন খবর আনিল যে, একটা পিঙ্গলবাসা রাজকন্যা বসু-লক্ষ্মীকে বড় ভয় দেখাইয়াছে এবং সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। শুনিয়া সকলেই সেইদিকে চলিল, গোতম বলিয়া উঠিল, "বাহবা রে বানর, তুমি আপনার দলের লোক-টাকে খুব উদ্ধার করিলে।"

গোতমের লেখাপড়া ভাল থাকুক আর নাই থাকুক, সে ভদ্রবংশের ছেলে; তাহার সামাজিকতা বেশ ছিল সে স্বভাবের শোভা বেশ বুঝিত। তাহার মত সমজদার অতি অল্পই পাওয়া যায়। সে রাজাকে বলিয়া দিল, "আজ তোমার নিমন্ত্রণ, সেই অশোক গাছের তলায়। পাঁচদিন না যাইতেই তাহার কি চমৎকার ফুল ফুটিয়াছে, যেন হঠাৎ তার ভরা যৌবন আসিয়াছে,আর সে যেন যৌবনে ঢলঢল করিতেছে। সেখানে মালবিকাও আসিতেছে। কৌশিকীকে রাণী বলিয়াছেন, "তুমি ভারী গুমর কর যে, তুমি বিয়ের ক'নে খুব সাজাতে পার, আচ্ছা বিদর্ভ দেশের ক'নের মত তাহাকে আজ সাজাও দেখি। এ সব দেখে শুনে বোধ হয় আজ বা তোমার কপাল ফেরে।" শেষে যখন সব প্রকাশ পাইল, মালবিকা বিদর্ভের রাজার মেয়ে আর কৌশিকী সেখানকার রাজ-মন্ত্রীর ভগিনী, তখন রাণী বিশেষ আদর করিয়া মালবিকার হাত ধরিয়া রাজার হাতে সঁপিয়া দিতে গেলেন। রাজা একটু লজ্জিত হইলেন। রাণী বলিলেন, "এ কি মহারাজ,

আমার প্রার্থনা আপনি পূরণ করিবেন না।" তখন বিদূষক বলিলেন, "রাণী রাগ করিবেন না, লোক-ব্যবহার এই যে, নব্য বর একটু লজ্জাতুর হয়।" রাজা বিদূষকের দিকে চাহিলেন। বিদূষক বলিলেন, "ইহাঁকে দেবী বলিয়া রাজার হাতে দিলে তিনি লইবেন।" রাণী বলিলেন, "উহার যে বংশমর্য্যাদা তাহাতেই উহাকে দেবী বলিতে হইবে। আমি আবার নূতন করিয়া দেবী বলিব কি?" তাহার পর দেবী যখন ভাল রেশমী কাপড়ের ঘোমটা দিয়া মালবিকাকে রাজার হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন, তখন বিদূষক বলিল, "আহা দেবী আমাদের বড়ই অনুকূল" এই পর্য্যন্ত বিদূষকের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক। ইহা ইহাতেই বিদূষকের চরিত্র বেশ বুঝা যায়; সে যে খুব চালাক চটপটে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু সে যে বেইমান। সে যাহার খায় তাহারও খাতির রাখে না। রাণী ও ইরাবতী তাহাকে কতই খাওয়াইয়াছেন পরাইয়াছেন, কিন্তু আপনার কাজের সময় সে কাহারও এক পয়সার খাতির রাখে নাই। কটকট করিয়া কটু কথা শুনাইয়া দিয়াছে। ইরাবতী যখন সব অন্ধকার দেখিতেছে, তখনই সে যে এককালে দাসী ছিল, সে কথাটা মনে করাইয়া দেওয়াটা কি বেইমানের কাজ নয়? শুধু কি তাই, সে স্বপ্নেও মালবিকা দেখিতেছে, আর ইরাবতীর অমঙ্গল চিন্তা করিতেছে। রাণী ধারিণীর এত খাইয়াও তাহার দেবী শব্দটী কাড়িয়া লইয়া মালবিকাকে দেওয়া, এসব কি কম বেইমানী! কিন্তু একটা কথা ঠিক। সে রাজার খায় রাজার গায়। ধারিণী ইরাবতী, রাজা তাহাকে ভালবাসেন বলিয়াই তাহার খাতির করেন, নইলে করিতেন না। সে তাহা বেশ জানে। সে আলুরও চাকর নয়, বেগুনেরও চাকর নয়, সে রাজার চাকর, রাজার যাতে ভাল হয়, তাই করে। এতে কেহ তাহাকে বেইমান বল নাচার।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কমলের দুঃখ

(মায়া—কমল)

আজ তোমারে প্রণয় বিষের দাহনের কথা বল্‌তে আসি নি ; আজ তোমার কাছে প্রেমের অভিসারিকা হয়ে আসি নি ; আজ এ নববসন্তের বকুলসুবাসে, কোকিলের কুহরে, আম্রমুকুলের গন্ধে, তোমায় জাগাতে আসি নি ; ভোলা কথা, ছেঁড়াফুলের ভালবাসা—যা হাওয়ায় ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছ, তা কুড়িয়ে গাঁথতে আসি নি ; বসন্তের কিসলয়ের উপর পূর্ণিমার হাসিতে নূপুরগুঞ্জন শুনাতে আসি নি ; যে পঞ্চবাণ সহস্র সহস্র হ'য়ে রন্ধ্রভেদ করেছে তার খবর দিতে আসি নি ; যে গৃহে দীপ জ্বেলে সে ঘর ভেঙেছে, তার কথা সুধাতে আসি নি ; মলয় হাওয়ায় প্রাণ কেমন করে গা শিউরে রোমাঞ্চ হয়, কাকে কখন মনে পড়ে, সে সোহাগ রচ্‌তে আসি নি ;—আজ এসেছি অন্তের বার্ত্তা নিয়ে। বসন্তের নূতন হাওয়ায় ফুল ফোটবার দিনে কেমন করে ফুল ঝরে যায়, তাই বল্‌তে এসেছি। যে মাধবীটী সহকারে জড়িয়ে উঠেছিল, সে মাধবী কেমন অনিয়মে শুখ্‌নো মুকুলের আঘাতে মরে যায়, তাই জানাতে এসেছি। কোকিলের গান অর্দ্ধেক ডাক্‌তে ডাক্‌তে থেমে যায়, পাপিয়া তান ভুলে বেসুরো হয়, বিষণ্নমুখে কপোতী কপোতের কথা ভুলে কেঁদে ফেলে, পূর্ণিমার চাঁদ মেঘের আড়ালে ঘোম্‌টা টানে, মলয় হাহা করে ফুলের বনে, তৃষ্ণা শুষ্ক হয়, তারি খবর দিতে এসেছি।—কেমন করে শস্যশ্যামলা মরুভূমি হয়, কেমন করে বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়, তাই বল্‌তে এসেছি। কেমন করে হাস্‌তে হাস্‌তে বুকে ব্যথা ধরে—কেমন করে ফুলশয্যায় মরণ আলিঙ্গন করে—তাই দেখাতে এসেছি। কাঁদ্‌তে আসি নি ; চোখ নিঙড়ে নিশ্বাস বয়ে নিয়ে এসেছি, মৃত্যুর বাণে কেমন করে পাখী স্থির হয়ে চোখ বুজে, তাই জানাতে চাই। যে স্নেহের কাম্যবনে কল্পলতার ছায়ায় কাম্যফল পাব বলে আশার ছলনে ভুলেছিলাম—সে কাম্যবন জ্যোৎস্না রাত্রে কোথায় মিলায়ে গেল। কল্পলতা শুকায়ে গেছে। আশার ফাঁকিতে শুক্‌নো হাসি রচনা হয়েছে—সে স্নেহের ছায়া মরে গেছে—দাবানলের অগ্নি নিয়ে এদের ঘরে এসেছিলাম, এদের ঘরও বুঝি তাই জ্বলে গেল। দাবানল যেখানে জ্বলে, সে বন জ্বলে যাবার আগে যার ভিতর থেকে যে শুক্‌নো কাঠে আগুন জ্বলে উঠে সে আগে নিজে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ বন পুড়ে গেল, ফুল ফুটতে গিয়ে ঝরে তাপে ঝল্‌সে গেল,- পাখী গাইতে গিয়ে দগ্ধপক্ষ হয়ে স্বর বের হতে না হতে মরে গেল—তবু কাঠখানা ছাই হল

না। আমি যেমন তেমনি রইলাম, সবাই বেশ চলে যায়—ইন্দু দিদিও চলে গেল। কেবল আমার যাওয়াই হ'ল না। সকলে নিশ্চিন্ত হয়, আমি কই তা পাইনে।

যেটা ধরে বাঁচতে যাই, সেইটা ডুবে যায়—তবু বেঁচে থাকি। তারা সব মরে বাঁচল। আমি বেঁচে মরে আছি! তোমাকে শেষ জীবনে মরবার সময় দেখতে না পাওয়া তার একটা দুঃখ রয়ে গেল। আশ্চর্য্য, যে দিনে ইন্দু দিদি জন্মেছিল,—ফাল্গুনের পূর্ণিমায়, ইন্দু দিদির বিয়ে হয়—সেই পূর্ণিমায়—ইন্দুদিদি চলে গেল—সেই পূর্ণিমায়। যে কুঁড়িটী এসেছিল চাঁদের আলোয়, ফুটেছিল চাঁদের আলোয়, ঝরে গেল তেমনি ভরা জ্যোৎস্নায়। আমি জন্মেছি আমাবস্তের দিন, কাটাচ্ছি সেই অন্ধকারে, ডুবে যাব—হবেও—বা কোন্ তমোময় ঘুমঘোরে। কি করে কার পরিণতি এমন হয়, জানিনে।

. আজ কয় মাস ধরেই তার একটু একটু জ্বর হ'ত, বললেও গ্রাহ্য করতো না। সুধীর ত আর সেই মিহির যাবার পর থেকে কি হ'য়ে গেছে। কোন খবরই কার, সে নিত না—তোমার ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে কত বললুম, বড়দিদি কত বোঝালে, যে দিনকতক গিয়ে থাক—মনটাও একটু ভাল থাকে—তা শুনলে না—বললে হেসে উড়িয়ে দিত। একদিন কেবল জবা অনেকক্ষণ ধরে বকাবকি করায় বল্লে, "জবা, তোর বাড়ীতে যাব—যাব—" জবা, দিদির সঙ্গে খুব বকাবকি করত। আমায় বললে, "মায়া, এই ঘরটা আমার জগতের মাঝে সব চেয়ে ভাল লাগে; এই ঘরে আমার ফুলশয্যা হয়েছে, এই ঘরে আমার মিহির থাকতো, এই ঘর থেকে আমার মিহির গেছে, এই ঘর থেকে আমার যা হারিয়েছে তা আর মিলবে না—আমি এ ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না—না মায়া, আমি এইখানেই থাকব—আর কোথায় যাব? আর কোথাও যাব না—না!" জবা কেঁদে ফেললে। ইন্দুদিদি বললে, "এঁ্যা তুই আবার কাঁদলি যে" জবা বললে—'না না'—হেসে ফেললে। জবার কান্না দেখলেই দিদি চোখ মুছে ফেলত। কারও কান্না সে দেখতে পারত না। বলত "জবা, ছেলে মানুষে কাঁদে না—শুধু হাসে।" এদানি অসুখ খুব বেড়েছিল, প্রায় উঠতে পারত না, শুয়েই থাকত—তবু খাবার সময় হ'লে, আমাকে জবাকে কাছে বসে খাওয়াত। আমায় বলত আমি সব দেখতে পারি নে বলে, তোদের খাওয়াই হয় না। সুধীরের কোন খবরই পাওয়া যেত না, হয় ত কখন এল টল্ টল্ করতে করতে - কিছু কথাও নেই, বার্ত্তাও নেই, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে একবার তাকালে—তার পর টলতে টলতে চলে গেল। মধ্যে একদিন এসেছিল, ইন্দুদিদিকে দেখে বললে, "এই যে – বাঃ বাঃ --তুমি পথ অনেকটা কমিয়ে এনেছ; বাঃ বাঃ বেশ, তা আমি কি করব—আমি কি করব। আমার দুটো পিদিম ছিল, আকাশ চোখে কাপড় বেঁধে একটা নিভিয়ে দিয়ে কেড়ে নিয়েছে, আর একটারও তেল ফুরিয়ে বুক পুড়ে উঠেছে। বাঃ বাঃ বেশ, তা আমি কি করব—আমি কি করব। ডাক্তার ত আসে

শুনি, তা ওষুধগুলো কি পাশের গলিতেই যায়—তা বেশ তা বেশ—মাটীতেই সব যাবে।" তারপর টল্‌তে টল্‌তে ফির্‌ছিল—ইন্দু দিদি ডাক্‌লে। সেদিন দিদির বড় জ্বর উঠতে পার্‌ছিল না, বল্‌লে "এদিকে এস, বোস তোমার মুখ অত শুক্‌নো কেন? তুমি কি হ'য়ে গেছ! একটু বোস, জবাকে ডাকি, চাকরদের ডেকে দিক্‌।" তখন দেখি পাগলের মত দরজার গোড়ায় বস্‌ল—বসে বল্‌ছে, "আমার মুখ শুকিয়ে গেছে—না? ঠিক ঠিক—দেখ—এই বাড়ীটাও শুকিয়ে গেছে, হাসে না; ওই ফুল গাছগুলো মরে গেছে, ফুল ফোটে না; ওই দেখ পায়রাগুলোর খোপ খালি হয়ে গেছে—আর তারা ডাক্‌চে না। শুকিয়েছে দেখ না, বাড়ীটার ছাদের বার্ণিশ অবধি ধুলোয় ছেয়েছে। শুকিয়েছে, শুকিয়েছে,—যেটা স্বপ্ন সেটা সত্যি হয়েছে; যেটা সত্যি, সেটা স্বপ্ন হয়েছে। তা আমি কি কর্‌ব—তা আমি কি কর্‌ব! যাক্‌—যাক্‌, এই যে তুমিও শুকিয়েছ, হাহা—হাহা—তা আমি কি কর্‌ব—কি কর্‌ব!" তার পর ধড়মড় উঠ্‌ল—উঠে কোথায় চলে গেল। মাঝে মাঝে সহিসটা খবর দিত -বাগান থেকে আস্‌ত। তার পর এই তিন মাস আর আসে নি।

তার পরদিন দিনের বেলা ইন্দুদিদি উঠ্‌লো, জবাকে ডাক্‌লে—আমাকে ডাক্‌লে, লোকজন দরোয়ানদের ডেকে বলে দিলে, সমস্ত বাড়ী ঘর দোর সব পরিষ্কার ক'র্‌তে। তার পর দুদিন ধরে যত ভিখিরী ছিল, তাদের পয়সা চাল ডাল সব দিলে। ওই বাগানের পাশের জমীতে কত কাঙালী ভোজন করালে। একটা কাণা ছেলের হাত ধরে একটা মাগী এসেছিল, তাকে একশ টাকা দিলে—মাগী টাকা পেয়ে কেঁদেই অস্থির; বলে, 'মা এত টাকা আমি কোথায় রাখ্‌ব?' এত গরীবও আছে। তার পর থেকে রোজই সব পরিষ্কার—সব দেখা শোনা করত।

পূর্ণিমের রাত্রিতে চাঁদ উঠেছে—আমায় ডেকে বল্‌লে, 'মায়া, দেখ কেমন চাঁদ উঠেছে, এমনি দিনে আমার বিয়ে হয়েছিল, আর এমনি দিনেই আমি যাচ্ছি; পূর্ণিমার রাত্তির আজ আর পালাতে পাচ্ছে না, আমিই আজ পালাব, রোজই পালিয়ে যায়!'—আমরা কেঁদে ফেল্‌লাম, জবা যেন কেমন হয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে উঠ্‌তে লাগল। ইন্দুদিদি তখন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, আপনার মনে চাঁদের পানে চেয়ে বল্‌ছে—'কি দেখছ চাঁদ, আমার জন্ম দেখেছিলে, আমার ফুলশয্যা দেখেছিলে, আজ কি দেখ্‌ছ চাঁদ,—আবার যে দিন ফিরে আস্‌ব সেদিনও কি এমনি করে তাকিয়ে দেখ্‌বে, তুমি বুঝি কেবল তাকিয়েই দেখ। একটু পরে যেন কেমন হয়ে এল,—ঠিক সেই সময়ে সুধীর এল—একেবারে যেন উন্মত্ত--মাথার চুলগুলো রুক্ষ, খালি গা, টল্‌তে টল্‌তে ঘরে ঢুক্‌ল—হাতে একখানা চিঠির মত কাগজ, আর এক হাতে একটা মদের গেলাস। ঘরে ঢুকেই 'ইন্দিরা, ইন্দিরা' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"যেয়ো না, এত শীগ্‌গির যেয়ো না—এই দেখ পানপাত্র

ফেলে দিলাম, ইন্দিরা ফিরে চাও।' গেলাসটা ছুঁড়ে ঘরের মেজেতে ফেলে দিলে, ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হোল, রক্তের মত লাল মদ মাটীতে ফেণা তুলে গড়িয়ে গেল। ইন্দুদিদি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে ছিল, তারপর আস্তে আস্তে বল্লে,—"এসেছ—কাছে এস, আমি তোমায় কি বল্ব মনে করে রেখেছিলুম, ভুল হয়ে যাচ্ছে, সে যেন আমায় 'মা' 'মা' করে ডাকছে, আমি সব ভুলে যাচ্ছি - দেখ আমার গলার ভেতর যেন ঠাণ্ডা জমাট কুয়াশায় দম বন্ধ হয়ে আস্ছে, চোখে যেন কেমন সব ঘোর হয়ে আস্ছে,—দেখ সেই চাঁদ কি—এই চাঁদ! সেই রাত্তিরের আর—এই যে? দেখ তোমায় এখন, সব থেকে তফাৎ করে দেখ্ছি, তুমি সত্যি বড় সোন্দর—তুমি—তুমি।" তারপর আর কথা কইলে না, হঠাৎ চারিদিক থেকে কোকিল ডেকে উঠ্ল, দুটো তিনটে পাপিয়া চেঁচিয়ে উঠ্ল, ঘরের ভেতর বাতিদানের কাছে কার্পা থেকে গোলাপ-ফুলের পাপড়ি ঝরে গেল, একটা হাওয়া এল—বাতিটা নিভে গেল। সুধীর উন্মাদের মত হাহা হাহা হাহা করে ছুটে বেরিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি,—ফুটন্ত ফুলের মাঝে ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার মত চাঁদের আলোয় সে ঘুমিয়ে পড়েছে, নিমীলিত আঁখির দুই কোণে দু ফোঁটা জলের রেখা লেখা রয়েছে—শুকোয় নি।

আজ কত বছর কেটে গেল—বেশ ত কেটে যায়, নদীর স্রোতের মত চলেছে। কি দ্রুত চলে—চলেই যায়—বাধা মানে না; কোন কথা শুন্লে না,—দিব্যি উথলে হেসে দুকুল ভাসিয়ে স্রোত খর হয়ে চলে গেল। তারও আশা থাকে সাগরে মেশ্বার। উঃ! মাগো! পৃথিবীটা কি! আমার কিসের আশা। সকলেরই মরণের তীরে সাগরের আশা, সকলেই দিনের শেষে সংসারের আপনার প্রাণের লোকের কাছে, প্রাণের ভাষায় তার বল্বার যা তা বলে যায়,—আমার সে আশা মেটাবার আশাও মরে গেছে। সমুদ্রের তীরে গিয়ে বালুর ঘর করেছিলাম,—প্রবল তরঙ্গে কোথায় ধুয়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে গেল। আজ শুধু সূর্য্যাস্তের পানে চেয়ে থাকি, আঁধার নেমে আস্ছে জানি, কতক্ষণে আস্বে তাই ভাবছি। চারিধারে অথৈ জল কল্ কল্ করছে, সামনে ডুব্ছে সূর্য্যি, পিছনে আঁধার। ঢেউগুলো লক্ষ ফণা নাগিনীর মত খেলা করছে, ঘাটে একখানিও নৌকা নেই—তাই ভাব্ছি। শুধু জনহীন নির্জ্জন নীরব দ্বীপে দাঁড়িয়ে—চারিপার্শ্বে কেবল জলের কোলাহল।

আজ ক'দিন হল আমরা এখানে এসেছি, জবাও এসেছে, কেবল কাঁদ্ছে—খেতে চায় না, ওঠে না, কেবল কাঁদে।—এখন আমার স্থান কোথায়? সুখের আশা তো করেছিলুম—কিন্তু সত্যি দুঃখের কতটা নিয়ে আছি। দুঃখ এই—আজ অধিকার দেবার জন্যে প্রাণ ছটফটিয়ে মর্ছে—তবু ত—হায়! কেউ নেই যে অধিকার করে। আমার কথা আর তোমায় বল্বার অধিকার রাখতে দাও নি, আমার কথা কভু তোমায় বলতে

চাই না, আর শ্রাবণে মেঘের দৌত্য রচনা হবে না ; কিন্তু জবা যে তোমার আশ্রয়ের জন্তে এসেছিল, সে আশ্রয়ের তুমি কি কর্‌লে ? যে পিতৃহীনা মাতৃহীনা তোমাকে আশ্রয় নিলে, তাকে কোথায় রাখ্‌বে ? আমার কাছে ? যদি আদেশ দাও, অনুমতি কর, তবে আমার কাছেই রাখব। ইন্দু দিদি যেমন বুকে করে করে রেখেছিল, তেমনি করে রাখতে দ্বিধা কর্‌ব না। আমি নারী, জানি নারী সব সইতে পারে,—ভাগ সইতে পারে না। তবুও যে দিদির আশ্রয় পেয়েছে - তাকে, সে যদি হলাহল উগারে দেয়, তবু তাকে বুকে করে রাখ্‌ব। আমার বিষের দাহন দিদি যদি সয়েছিল, তবে আমি কেন সইব না। সইতে পারব না কেন,—সইব—সকলই সইব।

(অমর—কমল)

কমল দাদা,

কখন তোমায় চিঠি লিখি নি, কখন তোমার অভাব বোধ করি নি, আজ জগতের শ্রেষ্ঠ স্নেহ হারিয়ে তার অভাবে তোমার অভাবও জেগেছে। আমি কখন কাঁদি নি, আজ আমার কাঁদ্‌তে ইচ্ছা রোধ করেও চখের জল আট্‌কাতে পাচ্ছি নি। কারো কাছে কেঁদে ভার নামাতে সাধ হচ্ছে, কে আছে—এখন আর আমার তুমি ছাড়া। আমি কখন 'মা নেই' তা মনে আন্‌তে পার্‌তুম না, আজ আমি সত্যই মাতৃহীন ! দিদি - আমার মার মত দিদি—আমায় তার স্নেহের কোল থেকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। আমি মাতৃহীন হলাম। মৃত্যু যে এত বড় ভীষণ, এত ব্যথা দিতে জানে, এমন করে মুর্ম্মুর দাহ আন্‌তে পারে, মিহিরের মৃত্যুতে তা আমি বুঝিনি। আজ তা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌ছি। বুকের রক্তে গিয়ে আঘাত কর্‌ছে—প্রাণের সমস্ত তারগুলো ঝন্‌ ঝন্‌ কর্‌ছে—যেন মাঝে মাঝে আর বাজে না—সব কেমন যেন হয়ে আসে। দর্শনশাস্ত্র এখানে মূক, সে ব্যথার ঔষধ দিতে পারে না। সমগ্র জগতের দর্শনশাস্ত্র স্তূপীকৃত করে আমার দিদিকে—আমার মার মত দিদিকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারে না। এত দিন ধরে এ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে আমার লাভ ! শুধু কথার কাটাকাটি ও মারামারি, কেবল ছেদ, ভেদ, কেবল বাক্যের লূতা-তন্তু সান্ত্বনা কই মিলে না। যে শোকাগ্নিতে মানুষ পুড়ে খাক্‌ হয়—তার ইন্ধনই যোগায়, কই শান্তি তো মিলে না। দুঃখ ঘোর করে আরও বাড়ে—নিবৃত্তি কোথায় ? যে দুঃখে রাজপুত্র ভিখিরী হয়, মহাপণ্ডিত উন্মাদবৎ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করে ছুটে যায়, মায়া-মরীচিকাময় জগৎ সংসার যে মহাজ্ঞানীর চোখের সামনে জগন্মিথ্যা মনে হয়—সেও ছাগের জন্তে হাড়ি কাটে গলা দেয়। মহাপ্রেমিক ক্ষতদুর্গন্ধ-কৃমীকীট-জড়িত, লোলমাংস পলিত-রোম কুকুরকে কোলে করে তুলে। জগৎ মিথ্যা—মায়া—কোথায় ? আজ থেকে সমস্ত দর্শন শাস্ত্র ত্যাগ কর্‌লাম,—এ সব অন্ধকারকে আরো ঘনিয়ে

তোলা, শোকই আমার ভাল—যে গেছে তার জন্যে কান্নাই আমার মনের একমাত্র শান্তি। হায়! কে আমায় বলে দেবে, এ জগৎ সত্য কি মিথ্যা। এ জগৎ যদি মিথ্যা—তবে সত্য কি? সবই মিথ্যা—কেবল ওই মৃত্যুটা সত্য? তা হয় না, যার জীবন আছে তারি মৃত্যু আছে। না, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মায়ের ফাঁকি নয়—যে বলে সে মূর্খ। আমি সে মূর্খতা আর চাইনে—আমার কান্নাও এ শোকে মিষ্টি—তবু তায় একটু শান্তি আছে। দর্শনশাস্ত্র অতলজলে যাক্,—আমার এ কান্নাই ভাল।

আমি আগে খবর পাই নি। সকাল বেলা ভালই দেখেছি। আজ কাল বরং উঠ্‌ত, সংসারের সকল কাজই নিজে আগেকার মত দেখত। তবে বুঝি নিভবার আগে যেমন প্রদীপ একবার জ্বলে উঠে, দপ্ করে খানিকটা আলো হয়—তাই। আমি যখন গেলাম, তখন সব ফুরিয়ে গেছে। মায়াদিদি জবাকে নিয়ে সুধোর মাকে নিয়ে বাড়ী গেছেন। এ বাড়ী এখন খালি পড়ে আছে, আমি আছি, আর কাঁদ্‌ছি; কি করব, শ্রাদ্ধ ত আমাকেই করতে হবে। সুধীরের ত কোন উদ্দেশ নেই। শ্মশানে যখন সব শেষ হয়ে এসেছে, তখন সেই উন্মত্তের মত, টল্‌তে টল্‌তে একবার এল, এসে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল; যখন অগ্নিতে সব ছাই হয়ে গেল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে। এত জোর নিশ্বাস পড়ল যে, পোড়া ছাই বাতাসে উড়ে গেল। পাগলের মত হেসে উঠল,—চিতা থেকে একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে, গায়ময় ছড়িয়ে দিলে, সেই তপ্ত-ভস্মভার বুকে মাখলে, 'ইন্দিরা' 'ইন্দিরা' বলে দুবার ডাকলে, সে স্বরে যেন ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ হয়ে যায়,—শ্মশান কেঁপে উঠল, গঙ্গাজলে তার প্রতিধ্বনি হল, মাথার উপরে বটগাছের ডাল থেকে একটা কাক ভয়ে ডেকে গেল। চন্দ্র তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে, স্বচ্ছ আকাশে চন্দ্রমার জ্যোৎস্না প্লাবনের মত গঙ্গাজলে পড়েছে, শ্মশানের অধিবাসীরা নিদ্রায় মগন, দু একজন এক কোণে বসে গাঁজা খাচ্চে, আর বিকৃত কফগ্রস্ত ভাঙ্গা স্বরে দু একবার কাশ্‌ছে। তটের উপর গঙ্গার কেবল অবিরাম আঘাতে কলোচ্ছ্বাস ধ্বনিত হচ্ছে। গ্যাসের আলোর ধারে পতঙ্গেরা উড়ছে, একটা টিকটিকী তাই খাবার জন্য স্থিরদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করে রয়েছে, বটগাছে একটা পেঁচা তাই আবার লক্ষ্য করছে। সুধীরের হাত ধরে স্নানের জন্য নিয়ে গেলাম, ঘাটে নামবার আগে একবার আমার মুখের পানে চাইলে—বল্‌লে 'কে অমর!—ভাই!' ব'লেই চোখের জলে নিজের বুক ভাসালে, বুকের ছাইগুলো ধুয়ে যেতে লাগল-হঠাৎ উন্মত্তের মত হাত ছিনিয়ে নিয়ে বল্‌লে—'ভেঙ্গেছে—স্বপ্ন ভেঙ্গেছে।' 'কোথা যাও, কোথা যাও' বলে তার পিছু পিছু ছুটলাম। ফিরে দাঁড়াল, হাস্‌লে—সে কি ভীষণ হাসি! এখনও আমার কাণে সে হাহাকার বাতাসের সঙ্গে গর্জ্জন করছে। বললে—'অমর! এ সব কিছু নয়—সব ছাড়িয়ে আর কিছু পাই কি না—আছে কি না জানি না—বোধ হয় আছে, আমার এইখানেই শেষ,—রইল

সব ছাই আর পাঁশ, যা করবার তুমিই কর !' বলে চলে গেল। তখন গ্যাস নিভিয়েছে—চাঁদের আলোয় দেখতে দেখতে সে কোথায় মিলিয়ে গেল। 'সুধীর,' 'সুধীর' করে বার কয়েক চীৎকার করলাম—জলে প্রতিধ্বনি শুধু জেগে উঠল, 'ধীর' 'ইর,' 'ইর'—তারপর কল কল ছলাৎ শব্দ। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছুট্‌লাম, 'সুধীর', 'সুধীর,' 'সুধীর'—নির্জ্জন নীরব পথে যে দিকে সে গেল, সে দিকে ছুট্‌লাম,—আবার চীৎকার করে কাঁদ্‌তে লাগলাম, কান্নায় গলা চেপে চেপে ধরতে লাগল। মনে.হল, পাশের এই পথে ওই বুঝি সে দ্রুত চলেছে। 'সুধীর' 'সুধীর' বলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ছুট্‌লাম—প্রায় সেই মদনমোহনের বাড়ীর কাছ বরাবর। দু একজন গঙ্গাস্নান যাত্রী চলেছে, আমার অবস্থা দেখে সভয়ে সরে গেল। আমি তখন এক রকম উন্মত্ত, হঠাৎ সামনে বাধা পেলাম। এক জন নেশায় জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল,—'কে বাবা পীর,—দোলের রাতে ধাক্কা মেরে ছুটেছ, কে দেখি—ও সম্বন্ধি ভায়া, আরে বাহা বাহা !' দেখি যে, পাঁচ সাতজন লোক স্ত্রী ও পুরুষ—সব নেশায় চুরচুরে—হোলীর ধুমে রাস্তা কাঁপিয়ে চলেছেন। আর যে আমায় আটকালে সে কে বোধ হয় বুঝতে পার্‌ছ—সে নগেন। সঙ্গে সেই মাষ্টার আর ইয়াররা, আর তিনটে মাগী। সম্বন্ধি নামটা শুনে সবাই খুব হেসে উঠল—আমার তখন মনের ভিতর কি হচ্ছে, তা তুমি অনুভব কর। আমায় জিজ্ঞেস কল্লে 'তুমি এখানে'—তা বল্‌লুম যে, দিদি মারা গেছেন রাত্রি দশটার সময়, তাই শ্মশান থেকে আস্‌ছি। সুধীর এ দিকে কোথায় গেল, তাই—শুনেই বল্‌লে 'আরে ছ্যাঃ, তোমার আর মর্‌বার দিন পেলে না, আরে ছ্যাঃ! এমন দিনে সুধীরচন্দ্র বিধবা হয়ে গেল, আরে ছ্যাঃ! তোমার বরাৎ নইলে তোমায় নিয়ে আজ, কর্‌তুম কত আমোদ হে, কি বল হীরে, এমন দোলের দিন ছা-রা-রা-রা-রা-রা, সম্বন্ধি ভায়া এস একপাত্র, এস, টান। আমি ধাক্কা দিয়ে চলে এলাম, ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে ঠিক্‌রে গেল, বল্‌লে 'যা, শালা, তোর শ্মশান জাগাগে যা, শালা নেহাৎ বেরসিক ; বুঝলে হীরে ! শালা দোলের রাত্রিতে তোর এত গোল কিসের রে ?' হীরে না কে, সে উত্তর কর্‌লে, 'আরে দূর্ দূর্, মরণ আর কি, মরবার দিন পেলে না, ন্যাকা মাগী, মাগী দুটো কুম্‌কুম খেয়ে যা—মাইরি বলছি নগি, মাইরি দুটো কুম্‌কুম খেয়েও গেল না, আরে ছ্যাঃ! আমি একটু দাঁড়িয়ে ভাবলুম, এই জগৎ—এরি সঙ্গে মায়াদিদির বিয়ে হয়েছে। হল্লা কর্‌তে কর্‌তে মাতালের দল চল্‌লে, একজন তাদের মধ্যে থেকে বল্‌ছে 'সম্বন্ধি বাবা' দানা পেওনি—দানা পেওনি ঘর যাও চাঁদ, ঘর:যাও।—সে সেই হারুমাষ্টার। 'প্রাণ পিয়সীর দাঁত কপাটী লাগবে, ঘর যাও বাবা ঘর যাও ; শ্মশান জাগা সম্বন্ধি—বাপ !' কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গঙ্গায় ফিরে এলাম, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী এলাম, এখনো কাঁদছি—কমল দাদা দিদি কেন ফেলে গেল। মায়া দিদির কি হবে ?

কমলদাদা! দুঃখ কাকে বলে এখন আমি জেনেছি। এ দুঃখের কি সত্যই শেষ নেই। তুমি একদিন এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় দেখবে বলেছিলে, তা পেয়েছ কি? বলতে পার, এ দুঃখ কিসে নিবৃত্তি হয়? কেউ কেউ বলেছে, দুঃখই দুঃখের পরিণাম। কারো কারো কাছে হতে পারে, যারা শক্তিহীন, দুঃখের শেষ হতে পারে না, কেননা যার গোড়া ও শেষ এক হয়ে যায়, সে অনন্ত। অনন্ত দুঃখ হয় না, অনন্ত সুখও হয় না। দুটো অনন্ত হয় না, অবশ্য এ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে। দুঃখ আছে বলেই তার নিবৃত্তির উপায় আছে, নইলে থাকত না; কিন্তু সে উপায় কি? দুঃখ ফেলে দিলে হয়, ফেলে দিলেও ত সে যায় না; আমি ত তাকে ছাড়তে চাই, সে ত আমায় কিছুতেই ছাড়ে না। এই দ্বন্দ্বেই কি জীবন, শেষ মৃত্যু তীরে এসে নীরব হয়—হবে! কান্নাই এখন আমার সার। কাঁদি খুব কাঁদি, চোক ঝাপ্সা হয়ে আসে, জানি, বুঝেছি দিদিকে পাব না, তাই দুঃখ। তবু কাঁদি, যদি ঝাপ্সা ঘোর কেটে আলোয় এনে দেয়। যদি সে আলোয় দেখতে পাই—দিদি কোথায়, আর আমরা কোথায়, তবে যদি এই দুঃখের শেষ হয়। মার কোল পাই!

জগতে এক একজন আসে, তাদের সঙ্গে আলো, বর্ণ, মাধুর্য্যে ভরা—চলে যায়, দশ দিক অন্ধকার হয়ে যায়। দুঃখই অন্ধকার।

(নগেন—কমল)

দুর্ণাম! দুর্ণাম! বিষ! বিষের আগ্নেয় হলাহল আকণ্ঠ পান করিয়েছ। মজ্জায় মজ্জায় রক্ত ঢেলে দিয়েছ, শিরায় শিরায় উষ্ণ স্রোত বয়ে চলেছে, তার শুধু তপ্ত বিষের দাহন-যাতনা। আত্মা দপ্ দপ্ করে উঠ্‌ছে। প্রতিরোমে রোমে বিষদিগ্ধ বাণ প্রবেশ করেছে, প্রতি রোমকূপ হ'তে বিস্ফোটক স্বেগে উঠেছে। এতদিন প্রকৃতি যুঝছিল, আজ দেহের বল হারিয়েছে—যে বিষ ঢেলে ছিলে এই শিরায়—আজ তার চরম পরিণতি, ঝঞ্ঝনায় দীর্ণ হয়ে বের হতে চায়। ওহো ওহো! এই সে কারণ। এরি জন্যে—জন্যে—জন্যে—জন্যে,—এরি জন্যে, শাস্তির জন্যে বাঁচিয়ে ছিলে, প্রতিশোধের জন্যে বাঁচিয়েছিলে,—পলে পলে মৃত মৃত, যায় জীবন্মৃত হয়ে থাকি,—তারির জন্যে! তুমি না ভাই,—তুমি না দাদা,—তুমি না শক্তিশেল বুকপেতে নিতে পার, বটে, তাই এমন শক্তিশেলে বাঁচিয়ে রাখলে, তাতে জীবন শুধু অগ্নিময় হোক্! জ্বালায় জ্বলে মরুক্। ওহো, এইত স্নেহ এইত মমতা! বোধ হয়, মার পেটের ভাই হ'লে পারুতে না।

খুব ভাল! কি শুভক্ষণে মায়াকে আমি বিয়ে করেছিলুম, আর কি শুভক্ষণেই তুমি বাঃ—বাঃ—বাঃ যা ভাষায় মানুষে ব্যক্ত করে শেষ করতে পারে না। এ বড়

মনোরম কাহিনী, বড় মিষ্টি, যত দূর যায় জ্বালায়, জ্বল্ জ্বল্ করতে করতে যায়।"—এ আমার সুরার চেয়েও মিঠে; উঃ, ভাই হয়ে কি করে এমন আবরণ শিখেছিলে। ছোরা খেয়েও বুকে করে নিতে পার, কিন্তু বিষ চাই-ই-চাই। উঃ, তুমি যে এতদূর নৃশংস হতে পার, মানুষ যে এতদূর কল্পনা করতে পারে, আমার জ্ঞানে তা আসে না। এই ত প্রতিশোধ, সব দেব, বাঁচিয়ে রাখব, দেখব কেমন জ্বলে মরে! মায়া ত্যাগ করে-ছিলুম, হেনাকে ভেলা মনে করে সর্ব্বস্ব পণে বাণিজ্য করলুম,—তুমি কল্পতরু সর্ব্বস্ব ফিরিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ নিলে, হেনাটাকে কেড়ে নিলে। চমৎকার! এর আর অন্য ভাষা নেই—চমৎকার! অতি মধুর!

শুধু একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে, কোন্ ধর্ম্মমতে কোন্ কর্ম্মমতে কোন্ স্নেহ, কোন্ আকর্ষণে ভ্রাতৃত্ব ভুলতে পেরেছ? শুনেছি দাদা গুরু তুমি, যে বড় সে পিতৃসম, তাই তোমার এই—? এর নিবৃত্তি কোথায় উপদেশ দাও, তোমার মৃত্যু—না আমার?—বল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

কবি গোবিন্দদাসের কবিতা। *

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি যে, "ভারতী"র সম্পাদক অথবা যম, একদা কিছুদিন পূর্ব্বে 'তাতসসৈকতে' পদটি, যে গোবিন্দদাসের স্কন্ধে আরোপ করিয়া, দিবা দ্বিপ্রহরে এক বিষম গোবিন্দ-বিভ্রাট ঘটাইয়াছিলেন,—এ গোবিন্দদাস কিন্তু সে গোবিন্দদাস নয়।

এ সেই গোবিন্দদাস যিনি লিখিয়াছেন,—

"ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান।"

এ সেই গোবিন্দদাস, যিনি পদ্মা-মেখলা এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের এক জঙ্গলে বসিয়া, তাঁহার ভিটামাটীর উদ্দেশে গাহিয়াছেন,—

"শত স্বর্গ শত কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি,
অই যে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হ'তে ভাই, পুণ্যতোয়া ও চিলাই
কত ঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার।"

এ এক শ্রেণীর দেশাত্মবোধ। ব্যাপকতায় হয়ত ইহা সমুদ্রের পরপারে বিশেষ বিশেষ দেশগুলিকে নাগাল পায় না। কিন্তু ইহার গভীরতার মধ্যে ডুবিবার মত ডুবুরীও বোধ হয় এই ফানুসী সাহিত্যের দিনে বেশী মিলিবে না। তুলনায় সমালোচনা হয় হউক। তাহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। কবি গোবিন্দদাসের দেশাত্মবোধ,—এই স্বতন্ত্র, স্বাধীন, পূর্ব্ববঙ্গের একগুঁয়ে ও একনিষ্ঠ দেশাত্মবোধ,—বঙ্গসাহিত্যে তুলনায় সমালোচনারই যোগ্য।

ফুটের ফিতা হাতে করিয়া বিশ্বকে মাপা যায় না। কোন বিশেষ দেশকে,—বিশেষতঃ বিদেশকে,—'বিশ্ব' (?) বলিয়া ধরিয়া লইয়া, দেশাত্মবোধের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার যে অহমিকতা ও স্পর্দ্ধা, তাহাও বোধ হয়,—আজকালের বঙ্গসাহিত্য ভিন্ন অন্য কোথায়ও মিলে না। সুতরাং দেশাত্মবোধের এমন এক ভাব বিপর্য্যয়ের সন্ধিক্ষণে, কবি গোবিন্দদাসের দেশাত্মবোধমূলক কবিতাগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব,

* ১লা বৈশাখ ১৩২৫,—ঢাকায় সাহিত্য-সম্মিলনে লেখককর্ত্তৃক পঠিত।

সাহিত্যের দিক দিয়া ও জাতীয় জীবনের দিক দিয়া,—আলোচনা ও অনুশীলন খুব সময়োপযোগী সন্দেহ নাই।

কিন্তু গত শতাব্দীতে আমাদের বিদেশী ঢংএর রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুকারী ও প্রতিধ্বনিস্বরূপ যে সমস্ত দেশপ্রীতির কবিতা কবি লিখিয়াছেন,—তাহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ নাই,—এমন নহে। তবে কলাকলার দিক দিয়া, বাঙ্গালীর স্বভাব ধর্ম্মের দিক্ দিয়া, বিচার করিলে তাহা কবির কবিতার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে না। অথচ দুঃখের বিষয় অনেকে ঐ সমস্ত কবিতাগুলিকেই দেশপ্রীতির শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া মনে করেন।

কাব্যের বিচার,—সাহিত্য ও কলাকলার দিক দিয়া করাই সমীচীন। কাব্য,—ব্যক্তি বা জাতির জীবনে কোন উদ্দেশ্য সাধন করে না,—ইহা অতি বড় দুঃসাহসের কথা। কিন্তু কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কবিতা, বিশেষতঃ গীতি-কবিতা লিখিতে বসিয়া, কোন কবিই বোধ হয়, কলাকলার রূপান্তরে, তাঁহার কাব্যকে পরিপূর্ণরূপে বিকাশ করিতে পারেন না। সমালোচ্য কবির যে সমস্ত কবিতা এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া সৃষ্টি হইয়াছে,—তাহা দেশপ্রীতিই হউক, আর সমাজ বা ধর্ম্মসংস্কারই হউক, খুব বড় সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু যে যুগে আমরা বাস করিতেছি,—আমি বাঙ্গলাদেশের যুগের কথাই বলিতেছি,—'বিশ্ব' (?) যুগের কথা বলিতেছি না,—এ যুগ একটা সমস্যাপীড়িত যুগ। গত শত বৎসরে বাঙ্গালাদেশে কোন কবিই বোধ হয় এই যুগভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই। কাজেই সমস্যা ও উদ্দেশ্যমূলক কবিতার হস্ত হইতে শুধু গোবিন্দদাস কেন,—এ যুগের বড় ছোট মাঝারী কোন শ্রেণীর কবি-প্রতিভাই মুক্ত নহে। অ-কবিরা ত নহেই।

ইহা ছাড়া কবি গোবিন্দদাসের বিচিত্র জীবনে এমন সব অঘটন ঘটিয়াছে যে, তাঁহার কতকগুলি কবিতা উদ্দেশ্যমূলক না হইয়া যায় নাই। কলাকলার দিক হইতে যেমন ইহার প্রতিকূল সমালোচনা উঠিতে পারে,—তেমনি অন্য পক্ষে কবির জীবনের দিক দিয়া ইহার একটা সার্থকতা আছে। কাব্য, জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। যেখানে জোর করিয়া এ দুইকে বিচ্ছিন্ন করা হয়,—সেখানে জীবন ও কাব্য দুই-ই—সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্য্যাদাহীন হইয়া পড়ে। এই জন্য কবি গোবিন্দদাসের অনেকগুলি উদ্দেশ্যমূলক কবিতা—কলাকলার দিক দিয়া—একটা বড় পরিণতি লাভ করিতে না পারিলেও—তাঁহার নিজের জীবনের দিক হইতে সত্যভ্রষ্ট হইয়া মর্য্যাদাহীন হইয়া পড়ে নাই। একটি কবিতা দেখুন,—

"দরিদ্র ভাওয়ালবাসী, কাতরে কঁদিছে আসি,
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে।

সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান, কে আছ বীরের প্রাণ,
বাড়াও সবলহস্ত পাপের সংহারে।
দুর্ব্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে।"

কে পিশাচ? কে রাক্ষস? কিসের অত্যাচার? কবি অস্পষ্ট নয়?—খুব সহজ এবং স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন,—

"যে জাতি যেখানে থাক, সতীর সতীত্ব রাখ,—
আপনার মা বোনেরে স্মর একবার।"

ভাওয়ালের কবি ভাওয়ালবাসীর এমন একটি মর্ম্মন্তুদ ব্যথার কথা কাব্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, তাহা মোহাচ্ছন্ন বাঙ্গালীকে একদিন নিজ নিজ মা বোনেরে স্মরণ করাইয়া,—তাহার সুপ্ত মনুষ্যত্বকে হয় ত বা জাগাইয়া দিবে। ইহা উদ্দেশ্যমূলক হইলেও—যাকে বলে 'বস্তুতন্ত্রহীন'—তাহা নহে। এই কবিতার সঙ্গে, ভাওয়ালের তৎকালীন ইতিহাসেরও একটা ছাপ রহিয়া গেল কি, না,—কে জানে? সুতরাং ইহা ব্যর্থ নয়। এ শ্রেণীর কবিতারও একটা সার্থকতা আছে।

কবি গোবিন্দদাসের উদ্দেশ্যমূলক কবিতার মধ্যে কলাকলার দিক হইতে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে—তাঁহার অতুলন ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি। উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে বেশী নাই। অথচ ঈশ্বর গুপ্তের পর হইতে এ বিষয়ে যে অল্লাধিক সকল কবিই একবার হাত মক্স না করিয়াছেন,—তাহা নয়। কিন্তু এই সমস্ত প্রচলিত ব্যঙ্গ কবিতা প্রায়ই বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণ দ্বারা অনুপ্রাণিত। কাজেই বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ব্যঙ্গের ভাব ও ঢং হইতে ইহা বহু পরিমাণে স্খলিত হইয়াছে। রুচির দোহাই দিয়া, এমনি করিয়া হয় ত বা সাহিত্যের একটা বড় অঙ্গকে আমরা নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় ও শ্রীহীন করিয়া ফেলিয়াছি। তাহাতে যে সাহিত্য ও জীবন কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কে বলিবে? কিন্তু গোবিন্দদাসের না আছে বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণের বালাই, আর সব চেয়ে না আছে রুচির বালাই।

"কুরুচি ভাসিয়া যেন আসে না পদ্মায়"

মা গঙ্গার তীরে জন্মিয়া, মা গঙ্গার জলেই যেন গত শত বৎসরের খ্রীষ্টানী রুচির কুরুচি ধুইয়া মুছিয়া যায়। সম্ভবতঃ তাই কবি গোবিন্দদাস ব্যঙ্গ কবিতায় এত সহজ সরল ও স্বাভাবিক হইতে পারিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের মাটীর গুণেই হয়ত বা—তাহা এমন নির্ভীক হইয়াছে, এবং সেইজন্যই তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতা কাব্য হিসাবে এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

"কালার কাহিনী রাধা কি শুনিবি আর ?
লম্বা লম্বা কয় কথা, সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা,
একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নিরাকার !
ওলো রাধা আরো শোন্, সবি নাকি ভাই বোন্
সমস্ত মানব নাকি একি পরিবার !"

অর্থাৎ—"বিশ্ব" !!

"সে সাধনা বড় উচ্চ, তার কাছে ব্রজ তুচ্ছ,
অতি তুচ্ছ ভালবাসা ব্রজ অবলার ;
কালার কাহিনী রাধা, কি শুনিবি আর ?"

আর একটা দেখুন,—

"সে জানে না ভ্রাতৃভাব, সে জানে না 'ফিরি-লাভ',
যায় না বাগান পাটি, ভেরী আগ্নি ভেরী ডার্টি,—
ইয়ারের ডিয়ারের চীয়ারে ডরায়।
নিরাকার নাহি বুঝে, ইতর 'ক্ষেতর' পুজে,
একটু মাখম রুটি, চা কি কফি ডিম্ দুটি
অভাগিনী একটু না ব্রেকফাষ্ট খায়।
ধর্ম্মে "এক",—প্রণয়েতে "অনন্ত" যথায়।
গেল না সে হতভাগী 'সমাজে' তথায়॥"

তারপর,—

"সে জানে না ক্লিওপেট্রা, মেরীরাণী এটসেট্রা,
দেয়নি সে কোর্টসিপে, বেছে নিতে টিপে টিপে,—
ফাটন্ত যৌবন, ভরা জ্যাকেটে জামায়।
বডিভরা ভালবাসা লেডী সে না হায়॥"

একটু বাড়াবাড়ি বোধ হইল ? হইবে বা। মিঠেকড়া না হইয়া চাবুক শুধু কড়া হইলে মন্দ কি ? অনেক গর্দ্দভের পৃষ্ঠের চামড়াও ত, কম শক্ত নয়—।

যাহা হউক, ঐ চিত্রেরি আর একটা অংশ,—

"লইয়া সখের প্রাণ, বেড়াইতে নাহি যান,
ইডেন গার্ডেনে একা আর্য্যের ললনা।
গাউনে সাজিয়া মেম, বলিয়া নিগার ডেম্,
দরিদ্র স্বামীরে নাহি করে বিড়ম্বনা।" ইত্যাদি।

ব্যঙ্গের বেয়াকুব চিত্রকরের তুলিকায় যদি—"নির্জলা-একাদশী," "পতি-দেবতা" প্রভৃতি চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে,—তবে গোবিন্দদাসের এই শ্রেণীর ব্যঙ্গ চিত্রগুলি কি যোগ্যতর তুলিকার অপেক্ষা করিতে পারে না?

কবির ভালবাসার কবিতার বিশেষত্বও খুব স্পষ্ট। অস্পষ্ট ভালবাসার ততোধিক অস্পষ্ট কবিতার বহুল প্রচারের দিনে, এ দিকেও দৃষ্টি অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। স্ত্রীপুরুষের ভালবাসায় দেহের সম্পর্কটা বাদ দিতে পারিলে,—অন্ততঃ বাদ দিয়া লিখিতে পারিলে,—এবং কেবল মানসিক ভাব-অনুভাবের বিচিত্র কুচিত্রগুলি, স্বপ্নে কুহকে স্মৃতিতে পদলালিত্যে ও ঝঙ্কারে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই আজকাল প্রথমশ্রেণীর প্রেমের কবিতা হয়। গোবিন্দদাসের প্রেমের কবিতা ইহার ঠিক বিপরীত শ্রেণীরও যদি না হয়,—তবে অন্ততঃ সে শ্রেণীর কোঠা হইতে অনেক দূরে। প্রেমের সম্পর্কে কবি গোবিন্দদাস দেহকে অপবিত্র মনে করিয়া বাদ দেন নাই। তিনি বলেন,—

"আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংস সহ।
আমিও নারীর রূপে,
আমিও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি কালীদহ।
ও কর্দ্দমে ওই পঙ্কে,
অই ক্লেদে ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ।
*　　*　　*
থাক্ তার মহাকুষ্ঠ,
আমি যে তাতেই তুষ্ট,
চন্দন আতর সম,
তাব পূঁজ প্রিয় মম
আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংসসহ।
*　　*　　*
জড় কিসে নীচ তুচ্ছ,
আত্মা কিসে মহা উচ্চ,
আমি ত বুঝি না ভেদ তোমরাই কহ।
প্রকৃতি দেহার্দ্ধ মম
প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মহাকাল দেখে নাই তাহার বিরহ।

সুন্দর কুৎসিত হোক
উলঙ্গ আবৃত রৌক
কুরুচি বলিয়া কর কলঙ্ক নিগ্রহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংসসহ।"

ইহার যেরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা আশঙ্কা করা যায়, তাহার উত্তরও কবি এই কবিতার মধ্যে ব্যঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন।

"চখে চখে চোখ বোজা,
হাতায়ে পীরিত খোঁজা,
তার চেয়ে এ যে সোজা চখে দেখে লহ।"

'আমার ভালবাসা' নামক কবিতায় সম্ভোগের যে একটি চিত্র কবি আঁকিয়াছেন, তাহার তুলনা এ যুগে খুব বেশী মিলিবে না। জীবনের অনুভূতি কি করিয়া বিশ্বব্যাপকতা লাভ করে,—কাব্যে কি করিয়া কল্পকলার রূপান্তর ঘটে, ইহা তাহারি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"আলিঙ্গনে ভাঙ্গে চুরে
শ্বাসে হিমালয় উড়ে,—
চুম্বনে চূর্ণিত হয় গ্রহ-উপগ্রহ।
আমাদেরি কেলি ভরে
পৃথিবী উলটি পড়ে,—
ও নহে সাগরে বান তোমরা যা কহ।
মর্দ্দনে মন্থনে বুকে
অগ্নি উঠে গিরিমুখে,
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ।

সম্ভোগেব এমন চিত্র যে দেশের কবি এই কৃমীকীটসঙ্কুল—কি আর কহিব,—মধ্যে আঁকিতে পারেন, সে দেশের অন্তর্নিহিত তেজবীর্য্যসম্বন্ধে আমরা একেবারে নিরাশ হইতে পারি না।

এই ভালবাসার কবিতা সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন উঠিবে যে, কবি গোবিন্দ দাস বড় অশ্লীল। আজকালের দিনে বঙ্গসাহিত্যে এই অশ্লীলতা এক অতি বড় প্রশ্ন। এক কথায় ইহার উত্তর সম্ভবে না। অশ্লীলতা সাহিত্যের আবর্জ্জনা, সন্দেহ নাই। কিন্তু অশ্লীলতা কাহাকে বলে? কি অশ্লীল? এবং কেন অশ্লীল—? শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের সার্ম্মনের, ও দেখাদেখি দেশীয় পাদ্রীদের বক্তৃতার পরে বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতার একটা ভাল রকমের বিচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অশ্লীলতাসম্বন্ধে আমাদের জাতিরও

একটা সংবিৎ ছিল,—এবং এখনও আছে। সাহিত্যের অতিবড় অবসাদের সময়েও অশ্লীলতাসম্বন্ধে আমাদের সংবিৎ কোন দিন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অশ্লীলতা কেন যে দোষের, সাহিত্যে কেন তাহা বর্জ্জনীয়, তাহার কারণও খুব ব্যাপক। অর্থাৎ সকল দেশের সভ্যতা ও সাহিত্যেই তাহার একটা উত্তর মিলে। অশ্লীলতা যে দোষের, সে বিষয়ে সকলেই একমত। তবে অশ্লীলতা যে কি—সেই সম্বন্ধেই তর্ক। আমি তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইতে পারিতাম যে, কার মতে এবং কেন, কোন্ শ্রেণীর কবিতা অশ্লীল। কিন্তু বর্ত্তমান স্থান ও কাল তাহার উপযোগী নয়। তবু এক গোবিন্দ দাস হইতেই বিভিন্নশ্রেণীর অশ্লীল দার্শনিকদের,—অর্থাৎ অশ্লীলতা-দর্শনে বিভিন্নশ্রেণীর যাহারা, তাঁহাদের মত ও রুচি অতি সংক্ষেপে দেখাইতেছি। "আমি দিব ভালবাসা" এই কবিতায়,—

"তটিনী দেশে দেশে, ফিরে উদাসী বেশে
জনমে আর নাহি ঘরে সে যায়,
কে নিবি ভালবাসা, আয়, আয়।"

ভালবাসার এই ফিরি,—(ইংরেজী 'ফ্রী' নহে।) এবং এই প্রকার উপমা অশ্লীলতার ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। ইহা একশ্রেণীর অশ্লীল দার্শনিক বলিবেন। কিন্তু ইহার স্বাভাবিক সহজ অর্থ দ্বারা দেখা যাইবে যে, ইহাতে কোনই অশ্লীলতা নাই। এবং এমন কি আবার এক শ্রেণীর আধ্যাত্মিক বাতিকগ্রস্ত শ্লীল দার্শনিক এই তিন ছত্রের ত্রিশ ছত্র আধ্যাত্মিক ব্যাখা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিবেন যে, ইহা প্রায় শ্রীমদ্ভাগবতের কাছাকাছি। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লীলতা সম্বন্ধেও আজকাল খুব জোর করিয়া বলা একেবারে নিরাপদ নহে। এমনি অবস্থা—। সুতরাং এমন অবস্থায় উপায় কি? যার মন যেমন। তথাপি অশ্লীলতার একটা সাধারণ লক্ষণ'ত নির্দ্দেশ করিতে হইবে—? কবি গোবিন্দদাস তাঁহার কাব্যে তাই করিয়াছেন। সব চেয়ে যাকে বলে—সেই কবিতাটি দেখুন,—

"আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী।
সে লাবণ্য মুক্ত বক্ষে, কে পারে সহিতে চক্ষে
নগন জঘনে কাম মগন আপনি।"

আর না। এই শব্দ শ্রবণমাত্রেই হয়ত অনেকের ভাব বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। কেন না সাহিত্যিক বাঙ্গালীর স্নায়ুর সুস্থতা সম্বন্ধে আজ কে শপথ করিয়া বলিবে? এখন এক শ্রেণী বলিবেন ইহা অশ্লীল। এ কি চিত্র! উলঙ্গ রমণী! কিন্তু কবির কৈফিয়ৎ এই কবিতাতেই আছে—তিনি বলেন, উলঙ্গ রমণী অশ্লীল নয়। তবে বস্ত্রহরণের গোয়ালিনীরা উলঙ্গ হইয়াও কিঞ্চিৎ অশ্লীল বটে। কেন না,—

"দুদিকে দুহাত দিয়ে, দুকূল রাখিতে গিয়ে
অকূলে ডুবালী বৃথা কাঞ্চন-তরণী।
ঘৃণা লজ্জা মান প্রাণ, প্রেমের দক্ষিণা দান,
কেননা পারিলি দিতে কুণ্ঠিতা এমনি।
হিয়ার ভিতরে তোর, নিয়া যদি মনোচোর—
দেখা'ত উলঙ্গি করি—হৃদয় ধমনী,—

তবে,—

আরো ভাল বাসিতাম তোরে গোয়ালিনী।"

সুতরাং উলঙ্গ হইলেই অশ্লীল হয় না। যাহা মনে হইতেছে অশ্লীল,—অথচ কিসের জন্য জানি না—তাহার খানিকটা খুলিয়া, আবার খানিকটা শ্লীলতার খাতিরে আবৃত করিয়া, প্রকাশের যে চেষ্টা,—কুণ্ঠা লজ্জা মান অপমান এই দুকূল রাখিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে যে নগ্নতা,—ফেরঙ্গ বাঙ্গলা, সাহিত্যে ও 'ঘরে বাইরে' যাহার জন্য হাতমক্স করিতেছেন,—এত মতে,—কবি গোবিন্দদাস বলেন—তাহাই অশ্লীল। এবং আমরাও বলি তাহাই অশ্লীল। বঙ্গসাহিত্যে এই অর্দ্ধেক ঢাকিয়া, অর্দ্ধেক খুলিয়া, এই একূল ওকূল দুকূল রাখিয়া যে গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় অশ্লীলতা শ্লীলতার নামে, মিথ্যা আর্টের আবরণে অবাধে চলিয়া যাইতেছে,—আমরা বলি তাহাই অশ্লীল। তাহাই তিনি সেকাল ও একালের বস্ত্রহরণের গোয়ালিনীদের অপেক্ষা—

"অসুর শোণিতনদে, নাচে শ্যামা রণমদে
গৈরিক প্রবাহে যেন মত্ত মাতঙ্গিনী -"

এই বিবসনা মাতৃমূর্ত্তিকে আরো বেশী ভাল বাসিয়াছেন। তার পর "শ্মশানে রমণী" চিতাচুল্লীতে উলঙ্গিনী হইয়া দগ্ধ হইতেছে,—কবি সবার অধিক তাঁহাকেই ভাল-বাসিতেছেন. ভক্তির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিতেছেন।

নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকার, যৌবনের জ্যোৎস্না তার,
নিত্যবুদ্ধ সত্যশুদ্ধ আনন্দরূপিনী।
সে মুক্ত রূপের কাছে, সৌন্দর্য্য কোথায় আছে,
লাবণ্যে ভাসিয়া গেছে আকাশ-অবনী।"

ইহার সহিত কবির দুঃখবহুল জীবনের এক অতি মর্ম্মবিদারক বাস্তব ঘটনা জড়িত। যাহা হউক, নানাশ্রেণীর—এই উলঙ্গ রমণীর স্তবে নানাশ্রেণীর অশ্লীল দার্শনিক নানারূপ বিভীষিকাময় অশ্লীলতা দেখিবেন। কিন্তু শ্মশানে উলঙ্গ রমণী আর মাতৃমূর্ত্তি শ্যামা উলঙ্গিনীকে দেখিয়াও যাহারা অশ্লীলতা দেখিতেছেন বলিয়া নাসিকা

কুঞ্চিত করিবেন, তাহাদের মত বিষ্ঠার ক্রমীকীটদের সম্বন্ধে—সাহিত্য কোনরূপ আলোচনা করে না, আমিও করিব না।

অশ্লীলতাকে গালি দিতে হয় দাও। সাহিত্যে অশ্লীলতা কেন আসে, তাহা একবার নিজ নিজ জীবনের দিকে তাকাইয়া বুঝ। তাহা না করিয়া ঘরে বাইরে—ধার করা ফেরঙ্গ অশ্লীলতার ধ্বজা উড়াইয়া,—মা কালী উলঙ্গিনী হইয়া যে দেশে পাঁঠা খায়,—আর বাবাজান বুড়োশিব যে দেশে উলঙ্গ হইয়া ডমরু বাজায়,—সেই দেশের বুকের উপর দাঁড়াইয়া অবনতিশীল ইউরোপীয় আর্টের অন্ধ-অনুকরণে, খ্রীষ্টানী মাপকাঠিতে,—শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বিচার করিতে তুমি আস,—স্পর্দ্ধা বটে! গোঁয়ার গোবিন্দদাসের কবিতা ছাড়িয়া দিলাম। বাঙ্গালেরা একটু গোঁয়ারই বটে। কিন্তু যে বৈষ্ণব সাহিত্যে স্বয়ং মহাপ্রভু—শুধু সাহিত্য নয়,—ধর্ম্মগ্রন্থহিসাবে আজীবন নিত্য পাঠ করিয়া গিয়াছেন, আজ দেশের দশকর্ম্ম হইতে বঞ্চিত—বহিষ্কৃত বিতাড়িত,—ফেরঙ্গ-ভাব-দাসত্বের আশ্রয়ে আজন্মপালিত, মূর্খ বলে কি না যে, ইহা পাশব মিথুন-রাগের সাহিত্য। ইহা, কি বলে ঐ "ট্রুবেদার" সাহিত্য! ইহা অশ্লীল! কবি গোবিন্দ-দাসের অশ্লীলতা বিচারের ভার আমরা এইরূপ ফেরঙ্গ-বুদ্ধি-পরিচালিত, দেশের সাধনা-ভ্রষ্ট, 'বালখিল্য' (ত বটেই!) বাচাল বা তোতা সমালোচকের হস্তে তুলিয়া দিতে পারি না। কবি গোবিন্দদাসের অশ্লীলতার বিচার করিতে হয় কর, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাকে বুঝাইয়া দাও যে, বাঙ্গালীর বহুযুগব্যাপী সাধনার সঙ্গে তোমার কিঞ্চিৎ মাত্রও পরিচয় আছে। শ্লীল-অশ্লীলসম্বন্ধে মানবধর্ম্মের সাধারণ ভূমি, আর বাঙ্গালী-ধর্ম্ম ও সাধনার বিশেষ ভূমির উপর দিয়া তিন পুরুষে তুমি অন্ততঃ একবারও পাদচারণ করিয়া আসিয়াছ। বাঙ্গালীর স্বাভাবিক সাহিত্য, তাহার ধর্ম্ম ও সাধনা হইতে কোনদিন বিচ্ছিন্ন ছিল না,—আজও তাহারা বিচ্ছিন্ন হইবে না! তোমরা চেষ্টা করিয়াও পারিবে না। বাঙ্গালী এত যুগ ধরিয়া অশ্লীলতার সাধনা করিয়া আসে নাই। অশ্লীলতায় কোন বড় বাঙ্গালী জন্মে নাই। অশ্লীলতায় কোন মাঝারী, এমন কি ছোট বাঙ্গালীও বাঁচে নাই। তোমরা কে তা জানি না,—জানিতে চাই না। * * *

বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মের এক কণিকা এই পূর্ব্ববঙ্গের কবি গোবিন্দদাসের মধ্যে হয় ত বা আছে। আজও আছে। কিন্তু,—আমরা যে নাই!—চিনিব কি করিয়া?

কবি গোবিন্দ দাসের সাধারণ সুর বিষাদের। তিনি নিজে দুঃখী মানুষ। তাঁহার কবিতাও দুঃখের। শুনিবেন—?

"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে'—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?

আজ যে আমি উপোস্ করি, না খেয়ে শুকিয়ে মরি ;
হাহাকারে দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছটফট্ ;
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে, তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?"

আরো শুনিবেন— ?

"প্রাণের এ হাহাকার, কেহ না শুনিল আর—
আর না শুনাতে চাই,—আর না শুনাতে চাই—
ফিরে যাই, ফিরে যাই।"

বঙ্গ-ভাষা জননীর শ্রীঅঙ্গে এই ব্যথার সঙ্গীত, কত দুঃখেই না কবি জড়াইয়া দিয়াছেন,—তাহা ভাবিবার অবসর আমাদের কোথায় ? দু'দিনের এই সাহিত্য-বাসরে, এই ঢাকা মহানগরীর 'ভদ্র'নামধারী সাহিত্যিকদের ব্যবহার, তাঁহাদের এই একমাত্র কবির উপর কতদূর 'অভদ্র' তাহাও চক্ষে দেখিয়া গেলাম।

কবি গোবিন্দদাসের জীবনে বৈচিত্র্য নাই, ইহাও যেমন ভুল, তাঁহার কাব্যে বৈচিত্র্য নাই, ইহা ততোধিক ভুল। কবির সুর সাধারণতঃ বিষাদের হইলেও আগ্নেয়-গিরির গৈরিক স্রাব এই কবির কণ্ঠে যেমন হইয়াছে, তেমন বুঝি এ যুগের কোন কবির কণ্ঠেই হয় নাই। ইহা বাঙ্গাল দেশের এই কাঙ্গাল কবির নিজস্ব ও এক অতিবড় গৌরব, যাহার ছটায় পূর্ব্ববঙ্গবাসী আমরাও গৌরবান্বিত।

"আমারি আমারি দেশে, আমারে খেদায় এসে—
আমারি মায়ের কোলে, নাহি মোর ঠাঁই!"

এই দুটি ছত্রেই— কি জ্বালা, কি আক্ষেপ, কি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া আসিতেছে। ইহারি নাম প্যাঁচ দিয়া কবিতা না-লেখা ; ইহারি নাম স্বাভাবিক হওয়া।

"ছিন্ন জিহ্বা সিংহ সম, জীমূত গর্জ্জন মম,
হৃদয়-কন্দরে নিত্য নীরবে লুকাই।"

শুনিলেন ?

যে কবি লিখিয়াছেন—

"আয় বালিকা খেল্‌বি যদি এই এক নূতন খেলা—"

তাঁহার পরশুরামের তর্পণ শুনুন,—

"প্রচণ্ড জ্বলন্ত দ্বাদশমিহির, মহা জ্যোতির্ম্ময় বিরাট শরীর,
অঞ্জলি পূরিয়া লইয়া রুধির;—দাঁড়ায়ে হ্রদের তীরে।
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে ধৃত উপবীত, ডাকিছে গম্ভীরে পৃথিবী স্তম্ভিত,
শত মেঘ-মন্দ্রে নভ বিকম্পিত, সমীর বহিছে ধীরে।

হে ঋচিক আদি পিতৃ-দেবগণ,
নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশবার, সমস্ত ভারত সমস্ত সংসার,
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার লয়েছি অঞ্জলি ভরি।
আমি জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয় অন্তক, সৃজিয়াছি এই সমস্ত পঞ্চক,
ক্ষত্রিয়-শোণিতে রক্ত গঙ্গোদক, এস হে তর্পণ করি।"

তার পরে যখন তর্পণ শেষ হইয়া গেল, তখন—

"ভ্রমিতে লাগিল স্তব্ধ ভূমণ্ডল, গতিরুদ্ধ সৌর নক্ষত্রমণ্ডল,
মহাজ্যোতির্ম্ময় নব গ্রহদল, গেল সে প্রলয় ধুম।"

"গুরুগোবিন্দ সিংহের প্রতিজ্ঞা—" আপনাদিগকে শুনাইবার সময় আমার এ যাত্রা হইল না,—সেই

"দিব তবে টান সুমেরু ধরিয়া, উপাড়িব ক্ষিতি বক্ষ বিদারিয়া—"

আপানারা পড়িলেই বুঝিতে পাবিবেন। ইহাই যদি ছিন্ন জিহ্বা সিংহেব গর্জ্জন, তবে জিহ্বা থাকিলে ভাবিতে পারি না, সে গর্জ্জন কিরূপ শুনাইত।

আর কি লজ্জা! এই কবির জিহ্বা ক্ষুৎপিপাসায় শুষ্ক। বৈচিত্র্য নাই? "শ্মশানে নিশান" কবিতাটির জুড়ি কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে আমায় কেহ খুঁজিয়া দিতে পারেন কি?

"শ্রাবণের শেষ দিন মেঘে অন্ধকার,
দিনমান প্রায় শেষ, ব্যাপিয়া আকাশ দেশ,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিছে আবার,
উলঙ্গ এলায়ে চুল, হাতে নিয়ে মহাশূল,
বিকট ভৈরব-নাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার।
নয়নে কালাগ্নি ঢালি, উন্মত্তা শ্মশানকালী
ধাইছে রাক্ষসী সন্ধ্যামূর্ত্তি তারকার।
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজালা
ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খ মালা।

* * *

হেন ঘোর অন্ধকার এ হেন সময়
উড়িছে শ্মশানে এক ধবল নিশান।

ঘোর স্তব্ধতার শিরে, সে নিস্তব্ধ নদীতীরে—
স্তিমিত স্তম্ভিত ঘোর গম্ভীর সে স্থান।
উড়িতেছে শত শত শ্মশানে নিশান।"

সাহিত্য-রথিগণ,—ইহাই আজ পূর্ব্ববঙ্গ। পূর্ব্ববঙ্গ আজ শ্মশান। কবি তাই আপনাদিগকে শ্মশানে আহ্বান করিতেছেন। এই শ্মশানের অন্ধকারে দরিদ্র কবি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা শুনুন,—

"—অকস্মাৎ রজত জ্যোৎস্নায়,—
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়।
রজত ধুতুরা কর্ণে বিমল রজত বর্ণে,
রজত বিভূতি মাখা তুষারের প্রায়।
আহা, কিবা সেই সৌম্যমূর্ত্তি অমল-ধবল,
ধবল-বৃষভপর বিরাজিত বিশ্বম্ভর,
ধবল অস্থির মালা গলে দলমল
ধ্যানগত আত্মা তাঁর নাহি দেখে ত্রিসংসার,
জ্ঞানময় মহামূর্ত্তি স্থির অবিচল।"

হে সমস্ত বাঙ্গলার সকল সাহিত্যিকবৃন্দ! আপনারা আমার এই প্রিয় কবির শ্মশান স্বপ্ন সফল করুন্ সাহিত্যের সৃষ্টিতে আপনাদের আত্মা ধ্যানস্থ হউক,—জ্ঞানময় স্থির অবিচল মহামূর্ত্তিতে আপনারা পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-শ্মশান রজত জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যান।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

পরাণে ক্ষ্যাপা

(কথা চিত্র)

১

জহি মন পবন ন সঞ্চরই
রবি শশী নাহ পবেশ।

আঁধারের উপর শুধু আঁধার জমাইয়া আকাশ স্তব্ধ হইয়াছিল। গভীর রাত্রি, ক্ষ্যাপা নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে বসিয়া গানের এক কলি গাইয়া উঠিল।

জহি মন পবন ন সঞ্চরই
রবি শশী নাহ পবেশ।

ক্ষ্যাপা চেঁচাইয়া উঠিল, "দুব্ শালা, বলে কি না, চন্দর সুয্যি যায়-না সেথানে, আঃ তোর ভালা হোক—গঙ্গায় ডুব দিয়ে বাঁচি।" "মা-মা" করিয়া পরাণে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জলের মধ্যে ওলট্‌পালট্ খাইযা জল তোলপাড় করিয়া তুলিল। আবার তান তুলিল,

জহি মন মরই পবন হো কৃথঅ জাই

আবার চেঁচাইয়া উঠিল, "মন মরে যায়- মন মরে যায়,—পবন হয় লো ক্ষয়—দুর্ শালা জলের ঢেউই চলেছে, জলের ঢেউই চলেছে।"

২

জল হইতে উঠিয়া ক্ষ্যাপা নদীর তীরে তীরে চলিয়া আসিতেছিল। পথের ধারে কয়েকটা চাঁপা ফুলের গাছ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া চাঁপা ফুল তাহার মাথায় গায়ে পায়ে ঝরিয়া পড়িল, ক্ষ্যাপা গাইয়া উঠিল—

"ফুলের উপরে ফলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ,
ঢেউয়ের উপরে ঢেউয়ের বসতি
এ কথা জানয়ে কেউ।

দূর্ শালা, এ রসের কথা বোঝেই বা কে ? এ যে—

ভাবের অন্তরে ভাবের উদয়
তাহার উপরে ভাব।
ফুলের মধু চাঁপার পাখড়ি
গন্ধেতে দিল লাভ।"

পরাণে গান গাইতে গাইতে ঘরের দিকে ফিরিল।

৩

পরাণে ঘরে ফিরিল। নবদ্বীপের একপ্রান্তে গঙ্গার তীরের অতি নিকটেই তার ঘর। ভিজা কাপড়েই পরাণ ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল—

"জামে কাম না কামে জাম।

কাম থেকেই জন্ম, কি জন্ম থেকেই কাম! দূর শালা, এই কামেব কথা ভেবে ভেবেই মানুষগুলো ফতুব হয়ে গেল।"

৪

পরাণের বউ বড স্নন্দবী। ভোমবার মত কাল চুল, পদ্ম-পাপড়ির মত পায়ের পাতার বঙ, চোখ দুটী যেন বনের হরিণ সদাই চমকিয়া উঠিতেছে। পরাণ ঘরে আসিয়া দেখিল, শুনিল, গুরু তাহার বউকে বলিতেছেন,—"আমি চণ্ডিদাস তুমি রজকিনী, তুমি রাধা, আমি শ্যাম।" পরাণে শিহরিয়া উঠিল,—একবার একটু হাসিয়া আপন-মনে কহিল,—"রস রসানের কথা, কইলেই হোল—তার আর কি।"

৫

পরাণ সারা রাত হাসিয়াই খুন। আপন মনে হাসে আর গায়। উহুঁ—

শ্বশুব শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ —
ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ

ক্ষ্যাপা তোর ঘর কোন্ দেশে ?—এ দেশে না বিদেশে ?
এ দেশে তো, কপাট দিলে, সে দেশ তো পাই,
বাহির গাঁয়ে কাম নাই, চলো ভিতর গাঁয়ে যাই॥

রাত্রি যখন ভোর হইয়া আসিল, পাখীর ডাকের সঙ্গে সূর্য্যের আলোর রাঙা আভা আকাশকে রঙিন করিয়া দিল, তখন পরাণে পূর্ব্বমুখে তাকাইয়া কি ভাবিল। আবার গান ধরিল,—

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পোবিলে আলা।

তাহাব পর, গুরুর সম্মুখে গিয়া বলিল, "গুরুদেব—

মাটীর জনম, না ছিল যখন,
তখন করেছি চাষ।

এখন এই ক বিঘে ভুঁই, এই বউ, আব এই পয়সাটা দক্ষিণে বইল, আমি তবে চললুম।

পবাণেব বউ চক্ষু নত কবিয়া পায়ের বুড আঙ্গুলের নখ দিয়া মাটী খুঁটিতে লাগিল। আব গুরুদেব বিস্ময়ে চোখের তারা দুটো একটু বেশী বড কবিয়া তাকাইয়া বহিলেন। পবাণ গুরুকে প্রণাম কবিয়া চলিয়া গেল।

৬

পরাণে অনেক ঘুরিল। তীর্থে তীর্থে, পথে পথে কেবল ঘুবিল। কেহ দয়া করিত, কেহ পাগল বলিত, কেহ দু মুঠা খাইতে দিত। আবার কেহবা দুর দূর করিত।

চৈত্রমাস রৌদ্রে কাঠ ফাটিতেছে। গঙ্গাব তীরে ঘাটের ধারে ক্ষ্যাপা বসিয়া ছিল। একটী বালক পরাণকে বলিল, "পাগলা চল, আমাদের বাড়ী আজ খাবি।"

পরাণে বলিল, "না, পরশু তোদের বাড়ী খেয়েছি, রোজ রোজ কেন খাব বে! এই এখানে রইলুম বসে, একদিন খাব না, দুদিন খাব না, তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন,—যদি না খাই তার পব?—তার পরে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যাবে। না—যাব না যাঃ!" বালক চোখের জলের সঙ্গে ভয়বিহ্বল চাহনিতে একবাব তাকাইয়া চলিয়া গেল। পরাণে আর একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

৭

বারো বছর পরে প্রয়াগে কুম্ভের মেলায়—পরাণে, ছেঁড়া কাপড়, মলিন দেহ, রুক্ষ চুল টলিতে টলিতে চলিয়াছে। এক সন্ন্যাসী তাহাকে ডাকিয়া সুধালেন—"কি চাও?"

"কোন্ বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে মিলিত হইয়া রয়"

সন্ন্যাসীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল, কহিলেন,—

"গোপতের পথ না হয় বেকত রসিক জনার সনে,

তবে—

এ দেহে সে দেহে একই রূপ
তবে সে জানিবে রসেরই কূপ

পরাণে হো হো করিয়া হাসিল।

৮

ঢেউ চলিয়া গেল। ভাসিতে ভাসিতে আর এক ঢেউয়ের মাথায় দেখা গেল পরাণে ক্ষ্যাপা। ঢেউয়ের মাথায় নাচিতেছে। সাগর তীর্থে বহুলোক আসিয়াছে। লোকে পরাণেকে সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করিল। কত কাপালিক সাধনের আধার খুঁজিতে লাগিল। বড় বড় সন্ন্যাসী পরাণেকে চেলা করিবার জন্য ভারি ব্যস্ত। পরাণ কেবল হো হো করিয়া হাসে আর গায়—

মানুষ যারা জীয়ন্তে মরা
সেইত মানুষ সার।
ওরে মানুষ সবার পার।

পরাণে ধেই ধেই করিয়া নাচে আর গায়—"ওরে মানুষ সবার পার। ওরে মানুষ সবার পার।"

এক মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিল, "দাঁড়াও শালা!" সে পরাণের হাত পা বাঁধিয়া গলায় পাথর বাঁধিয়া সাগরে ফেলিয়া দিল। পরাণ ডুবিল।

জলের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় তলাইয়া গেল।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে? কতদিন পরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্বর্গদ্বারে পরাণ সমুদ্রতীরে বালির চড়ায় পড়িয়া রহিয়াছে। নীল উজ্জ্বল বারিরাশি তাহার সর্ব্বাঙ্গ একবার করিয়া ধুইয়া

দিতেছে। লোক সমাগম হইল, সমুদ্রে কে ডুবিয়াছিল ভাসিয়া আসিয়াছে। যখন রোদের তাপ হইল, পরাণের সংজ্ঞা হইল, লোকে দুগ্ধ পান করাইল, পরাণেকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল,—সে হো হো করিয়া হাসিয়া গান ধরিল।

সমুদ্রে পশিব নীরে না তিতিব
নাহি সুখ দুখ ক্লেশ।

ভিড়ের ভিতর এক উৎকট তামার মত রঙ এক সন্ন্যাসী হাসিল, কহিল,—

কোটীকে গুটিক কোন একখানে
রসিক পাইয়া থাকে।

৯

বহুকাল পরে নবদ্বীপের ধুলায় ধুসরিত দেহ, উন্মত্ত পরাণে পথের ধারের আঁস্তাকুড়ের ভাত কুড়াইয়া খাইতেছিল, একখানা ছেঁড়া পাতার উপর উচ্ছিষ্ট কিছু পড়িয়াছিল, একটা কুকুরের গলা জড়াইয়া তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া পরাণে সেই এঁটোকাঁটা কুড়াইয়া খাইতেছিল। বালকেরা ঢিল মারিল, চীৎকার করিয়া তাহাকে খেপাইতে লাগিল—

পরাণে পরাণে গন্ধ কয়
দেখলে পরাণে সন্দ হয়।

ওরে ওই ক্ষেপা
তোর ভুঁই দিলে চষে আর তুই রইলি বসে।

পরাণে উঠিয়া চলিতে চলিতে গাইল,—

মাটীর জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

গান

তাই তোমার ও কাল রূপে,
ডুব দিয়েছি আলোর আশায়।
প্রাণের পিদীম্ জ্বেলে নিয়ে,
জ্বলে মরি প্রাণের নেশায় ॥

ওই অঙ্গ কাল তোমার
মোর অঙ্গ ধলা—
এই কাল-ধলায় মেলা-মেশায়,
ঘুচ্‌বে মনের মলা গো
ঘুচ্‌বে মনের মলা—

এই মলা মাটির মন নিয়ে গো,
মেলা-মেশা তোমায় আমায়।
তাই কাল জলে ডুব দিয়েছি,
তোমার প্রাণের আলোর নেশায় ॥

শ্রীঃ—